# মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপন (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
শিল্পা মণ্ডল
এনরোলমেন্ট ডেটঃ ১৪/০৭/২০১৪
রেজিস্ট্রেশন নং- **A00HI1200614**
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মেরুনা মুর্মু
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

**Certified that the Thesis entitled**

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপন (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) (*Manasamangal and Candimangal Kavya: An Economic, Social and Gender based Representation of the Medieval Era (Fifteenth - Eighteenth Century)*) submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Maroona Murmu, Professor, Department of History, Jadavpur University: And that either this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree/diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Maroona Murmu

Dr. Maroona Murmu,
Professor.
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032
Dated: 08.10.2021

Candidate

Shilpa Mondal

(Shilpa Mondal)
Dated: 08.10.2021

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণার সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হল। আমার এই গবেষনাপত্রটির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহায়তাদানের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তাঁর সুনিশ্চিত মতামত ব্যতীত গবেষণা পত্রটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল-কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা লেখ্যাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্বভারতীর লিপিকা ভবন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠের জন্য ‘ রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ের’ ভূমিকা আমার জীবনে অপরিসীম। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এম.ফিল পাঠের জন্য ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের’ ইতিহাস ও মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রের ভূমিকা আমার জীবনে অপরিসীম। এই দুই বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও কর্মীদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. মহুয়া সরকার, ড. নুপুর দাশগুপ্ত, ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. অনুরাধা রায়, ড. শুভাশিষ বিশ্বাস, ড. কৌশিক রায়, ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, ড. তিলোত্তমা মুখোপাধ্যায়, ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী ও ড. রূপ কুমার বর্মন সর্বদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাই শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়’কে, যিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

গবেষণাকার্য চলাকালীন যারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তারা হলেন রুদ্রদীপ দাস, শৃন্বন্তী মুখোপাধ্যায়, ঋতুশ্রী বসু, কথিকা রায়, সামিমা নাসরিন, অংকন রায়, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস,

কৃষ্ণ কুমার সরকার, প্রসেনজিৎ নস্কর, সোমা নস্কর, পূজা ব্যানার্জী, তুহিন হক, শুভঙ্কর দে, তন্ময় রায়, শুভদীপ দাস, সঙ্ঘমিত্রা দাস, মালিনী ঘোষ, সুমন সরকার, প্রজ্ঞা পারমিতা পোদ্দার। এদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়া আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধু-বান্ধবদের আমার ধন্যবাদ জানাই। এই প্রকল্প নির্মাণে ইউ.জি.সি (ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশন) এর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

সবিশেষ প্রণাম জানাই আমার পিতা বাচ্চু মণ্ডল ও মাতা বেবী মণ্ডলকে, যাঁরা আমার সকল কাজে অনুপ্রেরণার উৎস, যাঁদের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ। আন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই আমার ভাই শুভঙ্কর মণ্ডলকে, যে নানাভাবে আমার পাশে থেকেছে।

শিল্পা মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২।

# p¦Q f œ


**বিষয়** **পৃষ্ঠা**

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার**

**ভূমিকা** **১-৪৭**

**প্রথম অধ্যায়- মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র আঞ্চলিক অবস্থান** **৪৮-৭৯**

১.১ ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৪৯-৬৩

১.২ ‘মনসামঙ্গল’ এবং ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র অবস্থান ৬৩-৬৯

১.৩ দেবীমাহাত্ম্যঃ লৌকিক ও আঞ্চলিক রূপ ৭০-৭৯

**দ্বিতীয় অধ্যায়- মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের অবস্থান** **৮০-১২৭**

২.১ শিবের রূপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৮১-৮৮

২.২ বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থে শিবের অবস্থান ৮৮-৯৫

২.৩ মঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান ৯৫-১১৪

২.৪ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের নামের প্রকারভেদ ১১৪-১২৭

**তৃতীয় অধ্যায়- মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাংলার বাণিজ্যপথে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা** **১২৮-১৬৪**

৩.১ সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১২৯-১৩৭

৩.২ অঞ্চল ও কালভেদে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাণিজ্যপথের বিবরণ ১৩৭-১৬৪

**চতুর্থ অধ্যায়- মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের বিবরণ** **১৬৫-২০৯**

৪.১ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের বিবরণ ১৬৭-১৯৫

৪.২ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির বাস্তবায়ণ ১৯৫-২০৯

**পঞ্চম অধ্যায়- মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান** **২১০-২৪৮**

৫.১ সন্তান প্রজননে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান ২১১-২১৭

৫.২ বিবাহের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি ২১৭-২২৪

৫.৩ সৌন্দর্যের নিরিখে নারীর ‘পয়মন্তের’ বিবেচনা ২২৪-২৩১

৫.৪ বহুবিবাহ ও পিতৃতন্ত্র ২৩১-২৩৫

৫.৫ সতীনের অনিষ্টের ষড়যন্ত্র ২৩৫-২৩৮

৫.৬ পুরুষের যৌনস্পৃহা বনাম নারীর যৌনস্পৃহা এবং লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি ২৩৮-২৪৬

৫.৭ বৈধব্য ও পিতৃতন্ত্র ২৪৬-২৪৮

**অন্ত-মন্তব্য** **২৪৯-২৬৯**

**পরিশিষ্ট-** পরিশিষ্ট ১ ২৭০

পরিশিষ্ট ২ ২৭১

পরিশিষ্ট ৩ ২৭২

**গ্রন্থপঞ্জি** **২৭৩-২৯৬**

# ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী অভূতপূর্ব্ব সংঘর্ষ বা বিক্ষোভের সময়কাল হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রধানত মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পালবংশের রাজত্বকালের শেষ থেকেই বাঙালি ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যপন্থী হয়ে ওঠে।[1] সেন রাজাদের সময়কালে সমাজের একাংশ শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী হলেও, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা ধর্মবিশ্বাসে ছিল অনার্য।[2] এরপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। তুর্কি আক্রমণের তাণ্ডবলীলা প্রতিহত করার কোন সুদৃঢ় রাজশক্তি তখন বাংলাদেশে ছিলনা। এরফলে বিদেশী শক্তি হিসেবে তুর্কিরা খুব সহজেই বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। সুকুমার সেনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসলাম আক্রমণের পূর্ব্বে বাংলার অধিবাসীগণ দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল, যথা- "আর্য" ও "অনার্য"।[3] বাংলায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পর সংখ্যালঘু "আর্য"রা ক্রমশ "অনার্য"র সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংখ্যাবহুল হয়ে ওঠে।[4] এরফলে "অনার্যে"র "আর্য"ভাবালম্বনের উপর ভিত্তি করে সমাজে নতুন

---

[1] সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালী সমাজের বিবর্তন ও আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব', *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৫২। সাম্প্রতিক সময়ে "আর্য" ও "অনার্য" ধারণার উপর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। রোমিলা থাপার "আর্য"দের জাতি হিসেবে উল্লেখ না করে, ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধীয় পরিবারগুলি "আর্য" ধারণার অন্তর্গত। অর্থাৎ "আর্য" ভাষাভাষী মানুষেরা বৈদিক ও গ্রীক-রোমান উভয় সভ্যতার পরিচিতি বহন করে। Michael Witzel আবার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের ইন্দো-ইউরোপীয়দের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে "আর্য" হিসেবে পরিচিত 'ইন্দো-ইউরোপীয়'দের সাথে বৈদিক যোগসূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী সময়কালের অধিবাসীদের ইন্দো-ইউরোপীয় পরিচিতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজীব খানের ধারণা অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীরা উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত পশুপালক শ্রেণী উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, শ্রেণীভিত্তিক বিভাজনের সৃষ্টি করে। Romila Thapar, Michael Witzel, Jaya Menon, Kai Friese and Razib Khan, *Which Of Us are Aryans? Rethinking the concept of Our Origin*, (Aleph, 2019).

[2] *তদেব*।

[3] *তদেব*, ৫৩।

[4] *তদেব*, ৫৪।

স্তরভেদ দেখা যায়।[5] এর একদিকে ছিল সংস্কৃতিবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রবণ "আর্য"রা, এবং অন্যদিকে ছিল বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মপরায়ণ সংস্কৃতিবিহীন "আর্য"রা।[6] "অনার্য"রা ছিল প্রধানত লৌকিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। সুকুমার সেনের মতে, ইসলাম আক্রমণের ফলাফল হিসেবে "আর্য" ও "অনার্য" দেবতার সংমিশ্রণ ঘটে বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসগত স্তরভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।[7] আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, পাল ও সেন রাজাদের সময়কালে বাংলায় হিন্দুত্বকরণ, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যকরণ প্রক্রিয়ার যে সূত্রপাত হয়েছিল, তুর্কি আক্রমণের ফলে তা অস্তমিত হয়ে পড়ে।[8] সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বাংলার লৌকিক স্তর থেকে এইসময় বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।[9] সংহতির আদর্শে প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যও নতুনভাবে বিকাশলাভ করে। এর ফলশ্রুতি হিসেবেই পদাবলী, জীবনী, অনুবাদ সাহিত্যের মতো, 'মঙ্গলকাব্যের'ও উৎপত্তি ঘটে।

## মঙ্গলকাব্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বর্তমান আলোচনায় বখতিয়ার খলজীর আমল থেকে শুরু করে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান পর্যন্ত সময়কালকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গবেষণার সুবাদে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে সংস্করণগুলি নেওয়া হয়েছে, তার বেশিরভাগ এই সময়কালের অন্তর্গত। তুর্কি আক্রমণ ও তার পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং তার প্রভাব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে পড়েছে, এবং তার প্রতিফলন কাব্যের মাধ্যমে কি করে বিশ্লেষণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সময়কাল গ্রহণ করা হয়েছে।

---

5 *তদেব্।*

6 *তদেব্।*

7 *তদেব্।*

8 আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৫।

9 *তদেব্।*

বাংলায় ১২০১ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সুদীর্ঘ সময়কাল বাংলার ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' নামে পরিচিত। মুহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী যখন বাংলাদেশ অধিকার করে, তখন বাংলার শাসনভার ছিল সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের হাতে। বখতিয়ারের 'বঙ্গবিজয়' সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য বক্তব্য প্রদান করেছেন। তার মতামত অনুযায়ী, বখতিয়ার খলজীর বাংলায় আক্রমণকালে নদীয়ার নগরবাসীরা তাকে অশ্ববিক্রেতা হিসেবে অনুমান করেছিলেন।[10] একইরকম বক্তব্য যদুনাথ সরকারও তার গ্রন্থে প্রদান করেছেন। ইসামী রচিত 'ফুতুহা-উস্-সালাতিন' এবং 'তাবকৎ-ই-নাসিরি' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তিনি তার বক্তব্য প্রদান করেছেন।[11] তবে, বখতিয়ার খলজী নদীয়া'য় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেননি। যদুনাথ সরকারের মতে, নদীয়া বিজয়ের বখতিয়ার খলজী তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় বিজয়ের প্রতি উৎসাহী হয়ে পড়েন। বখতিয়ার খলজীর দ্বারা উত্তরবঙ্গ বিজয়ের পর ১২০৪ থেকে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিহার, লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম এবং বঙ্গ দখল করেন।[12] এরফলে বাংলা ও বিহারে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় তুর্কি শাসনের মধ্য দিয়ে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্কের রদবদল ঘটে।

এরপর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে স্বাধীন নবাব হিসেবে ঘোষণা করলে, বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের সূত্রপাত ঘটে। অতঃপর ইলিয়াস শাহী বংশ, হাবসী বংশ ও হুসেনশাহী বংশের শাসকগণ বাংলায় স্বাধীন শাসক হিসেবে পরিচিত হয়। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ গৌড়ের

---

[10] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুসলমান বিজয়ের বিস্তৃতি ও কালনির্ণয়', *বাঙ্গলার ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭), ১৭।

[11] Jadunath Sarkar (ed.), 'The Muslim Conquest of Bengal', *The History of Bengal: Muslim Period 1200-1757*, Vol. 2 (Dacca: The University of Dacca, 1948), 4.

[12] সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়', *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল,* (কলকাতাঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২), ৫৫।

সিংহাসন দখল করেন।[13] তার সময়কালে বাংলার ইতিহাসে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সূত্রপাত ঘটে। তৎকালীন পাশ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি তিরহুত আক্রমণ করেন। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তার রাজত্বের সময়সীমা নেপাল থেকে শুরু করে পশ্চিম বেনারস অবধি সম্প্রসারণ করেন। ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সোনার গাঁ আক্রমণ করে সমগ্র বাংলাকে এক শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।[14] এরপর তিনি উত্তর-পূর্বে কামরূপ অভিযান করে, তা দখল করেন। ইলিয়াস শাহ বাংলায় ১৩৩৮-১৩৫২ সাল অবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সময়কালে বাংলায় মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়।[15] মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলনের পর বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এন. কে. ভট্টাশালীর মতে, ইলিয়াস শাহের সময়কালীন প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তবে, ইলিয়াস শাহের সময়কালে দিল্লীর সুলতান কর্তৃক একাধিকবার বাংলায় আক্রমণ বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এরপর সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সিংহাসনে আসেন।

গিয়াসউদ্দিন শাহের পর পুনরায় গণেশের দ্বারা হিন্দু রাজবংশের সূত্রপাত ঘটে। ইলিয়াস শাহের পর সিকান্দর শাহ ১৩৫৮-১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে বসেন। তৎকালীন সময়ে বাংলার মসনদকে নিয়ে রাজনৈতিক টানাপড়েন মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকার উপজীব্য। মঙ্গলকাব্যের কবিদের সংস্করণে এর প্রতিফলন ঘটে হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্ব হিসেবে। গণেশের পর নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন য়ূসুফ সাহ, জালালুদ্দীন ফতে শাহ এবং হাবসী রাজবংশের

[13] Jadunath Sarkar (ed.), 'Rise of the Ilyas Shahi Dynasty', *The History of Bengal: Muslim Period 1200-1757*, Vol. 2 (Dacca: The University of Dacca, 1948), 95.

[14] *তদেব্।*

[15] *তদেব্, ১১৬।*

পর হুসেন শাহীর শাসনব্যবস্থা শুরু হয়।[16] হুসেন শাহীর শাসনকালকেই মূলত মঙ্গলকাব্যের সময়কালের হিসেবে অনুমান করা হয়। কারণ বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস এই সময়েই তাদের কাব্য রচনা করেন। হুসেন শাহের সময়কালে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটে। এর প্রতিচ্ছবি মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলার সাথে সমুদ্রপথে মায়ানমার, ইন্দোচীন, শ্রীলঙ্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য ত্বরান্বিত হয়েছিল।[17] পর্তুগিজ পর্যটক Durate Barbosa এইসময় বাংলার সমুদ্র উপকূল ধরে কারিগরি পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শোধিত চিনি, সুতিবস্ত্র এবং মসলিন।[18] হুসেন শাহের সময় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য নগরী হিসেবে সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম, সাতগাঁ ও হুগলী ছিল বিখ্যাত। বাণিজ্যের সাথে কৃষিক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়।[19]

বাংলায় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবর্তন দেখা যায়। প্রথমেই বলা যায়, দিল্লীর সুলতানি শাসনের প্রারম্ভেই দিল্লীর পাশাপাশি লক্ষণাবতীর টাঁকশাল থেকে নিয়মিত রূপার মুদ্রা চালু করা হয় বাণিজ্যিক স্বার্থে।[20] তবে, বাংলায় রূপার টঙ্কার পাশাপাশি কড়িরও প্রচলন ছিল।[21] মঙ্গলকাব্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কড়ির বিনিময়ে বাণিজ্যের আদানপ্রদানের বিবরণ পাওয়া যায়। যদুনাথ সরকারের মতে, বাংলার বাণিজ্যের কারণে চীন থেকে সোনার ও রূপা আমদানি করা হত।[22] অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, বাংলার বাণিজ্য ছিল স্ফীতকায়। তবে, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পিছনে কৃষির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ইবন বতুতার বিবরণীতে বাংলার পূর্বাভিমুখী কৃষিব্যবস্থার

---

[16] সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ’, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ),* (কলকাতাঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২),৭৬।

[17] *তদেব, ১৪২।*

[18] *তদেব, ১৪৫।*

[19] *তদেব, ১৪৭।*

[20] *তদেব, ১৫২।*

[21] *তদেব, ২৯৯।*

[22] Jadunath Sarkar (ed.), ‘The Husain Shahi Dynasty’, *The History of Bengal: Muslim Period 1200-1757*, Vol. 2 (Dacca: The University of Dacca, 1948), 143.

উল্লেখ পাওয়া যায়।[23] বাংলার ধানের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। যদুনাথ সরকারের মতে, ধানের প্রাচুর্যতার কারণে তা বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়।[24] তৎকালীন সময়ে বাংলা থেকে চাল করমণ্ডল বা ক্যাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে, এবং সেখান থেকে সুদূর মালদ্বীপেও রপ্তানি হত।[25] সুলতানদের আমলে বাংলায় সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রচলন হলেও, বিনিময় বাণিজ্য এবং কড়ির আদান প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[26] David Curley একাধিকবার বাংলার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কড়ি প্রধানত বাংলার সাধারণ মানুষের অন্যতম বিনিময় মুদ্রা ছিল।

তৎকালীন বাংলা থেকে ইক্ষুজাত দ্রব্যও বর্হিভারতে রপ্তানি করা হত।[27] যদুনাথ সরকারের মতে, কৃষিজ উৎপাদনের পাশাপাশি কারিগরি শিল্পেও এই সময় বাংলার উত্থান ঘটে। বিশেষতঃ, মধ্যযুগে বস্ত্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তার প্রতিচ্ছবি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের চন্দ্রধর বণিক ও ধনপতি বণিকের শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ইবনবতুতার বিবরণীতে মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক চীনা সম্রাটের উপঢৌকন প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলায় উৎপাদিত মসলিনের একাধিক প্রকরণ পাওয়া যায়।[28] এছাড়া ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সুতি ও রেশম বস্ত্র তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরবে নিয়মিত রপ্তানি করা হত।[29] বাংলায় বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর।

---

[23] *তদেব, ১৪৫।*

[24] *তদেব, ১৫০।*

[25] *তদেব,*

[26] *তদেব,*

[27] *তদেব,*

[28] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭)।

[29] *তদেব।*

সুলতানি শাসনের পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুঘলদের আমলে বাংলায় পুনরায় রাজনৈতিক, এবং তার সূত্র ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনও সাধিত হয়। হুমায়ুনের রাজত্বকালেই মুঘলদের কর্তৃক বাংলা পুনরায় বিজিত হয়। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন আহরণ করে হুমায়ুন বাংলায় মুঘল শাসনের সূচনা করেন।[30] তবে, হুমায়ুনের রাজত্বকাল বেশীদিন স্থায়ী ছিলনা। আফগান নেতা শের খান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর কুলিকে পরাজিত করে আফগান শাসনের গোড়াপত্তন করেন। এরপর থেকেই করনারী আফগান বংশের রাজত্বকালের সূচনা ঘটে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল ও আফগানদের মধ্যে রাজমহলের যুদ্ধে আকবরের হাত ধরে বাংলায় মুঘল শাসন সূচিত হয়।[31] এইসময় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত একটি সুবা অর্থাৎ প্রশাসনিক শাসনকর্তা হিসেবে আকবরের সময়কাল থেকেই বাংলায় সুবাদার নিয়োগ শুরু হয়। আকবরের বাংলা আক্রমণের পিছনে একাধিক কারণ নিহিত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। তিনি বাংলা বিজয় করে সমগ্র ভারতবর্ষে নিজের অধিকার কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শক্তিশালী আফগান শাসনে তিনি ভীত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দাউদ কররানীর সময়কালে তিনি সর্বপ্রথম ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন।[32] দাউদ কররানী উজির লোদী খানের দ্বারা উপঢৌকন পাঠিয়ে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু আকবর এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট না থাকায় তার নির্দেশে মুনিম খান পুনরায় ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন।[33] দীর্ঘ নয় মাস দুর্গ অধিকারের পর দাউদ খানের সেনারা পাটনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর সুযোগে আকবরের নির্দেশে মুনিম খান সুরথগড়, মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করে। আকবরের

---

[30] Jadunath Sarkar (ed.), ‘First Mughal Conquest of Bengal’, *The History of Bengal: Muslim Period 1200-1757*, Vol. 2 (Dacca: The University of Dacca, 1948), 176.

[31] *তদেব, ১৭৮।*

[32] *তদেব, ১৮০।*

[33] *তদেব, ১৮১।*

সেনাবাহিনীর ভয়ে দাউদ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কটকের সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন।[34] এই সন্ধি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ বাংলা ও বিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আর দাউদ আকবরের সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসন করবে, এই বিষয়টিও নির্ধারিত হয়।[35] তবে, মুনিম খানের অসুস্থতার সুযোগে দাউদ কররানী পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলে আকবর রাজমহলের যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। এরফলে বাংলায় আফগানি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আকবরের সময়কালে বাংলার তৎকালীন স্বাধীন শাসকদের দমন করার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খান, উজির খান এবং রাজা মানসিংহের মতো সেনাপতিদের বাংলার সুবাদার করে পাঠান। তবে, জাহাঙ্গীরের সময়কালেই প্রধানত সুবাদারদের দ্বারা বাংলার সামন্ত ভূস্বামীদের স্থায়ীভাবে পদানত করা সম্ভব হয়। আকবরের সময়কালে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের সুবাতে পরিণত হলেও, মুঘল কর্তৃত্ব সেই পর্যায়ে কায়েম হতে পারেনি। কেবলমাত্র বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এর ফলপ্রসূ, বাংলার বিখ্যাত জমিদাররা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে একাধিকবার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। অনিরুদ্ধ রায় এই প্রসঙ্গে মুঘলদের বিরুদ্ধে বার ভূঁইয়াদের উত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন।[36] বার ভূঁইয়া বা জমিদাররা মুঘল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। আবদুল করিমের মতে, আফগান শাসনকাল থেকেই এই বার ভূঁইয়াদের উৎপত্তি হয়। প্রধানত শেরশাহ পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরবর্তীকালে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বার ভূঁইয়াদের উত্থান ঘটে। মুঘলদের বিরুদ্ধে বার ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন সোনারগাঁও এর জমিদার ঈশা খান ও তার পুত্র মুসা খান।[37] এছাড়াও ভাওয়ালের মজলিস পরতাব ও মজলিস কুতুব, দক্ষিণ

---

[34] অনিরুদ্ধ রায়, 'মুঘল আমলে বাংলা বিজয়', *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, (কলকাতাঃ প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৫), ৬৫৪।

[35] *তদেব, ৬৫৫।*

[36] *তদেব, ৬৫৬।*

[37] Jadunath Sarkar (ed.), 'Conquests of Islam Khan', *The History of Bengal: Muslim Period 1200-1757,* Vol. 2 (Dacca: The University of Dacca, 1948), 247-270.

সিলেটে ফিতেহ খান, করিমদাদ মুসাজাই ও ইব্রাহিম মোড়ল, বানিয়াচঙ্গে আনোয়ার খান, তাজ খান, সলিম খান, বীরভূমের শামস খান, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, প্রমুখরা মুঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।[38] এদের সম্মিলিত প্রয়াসে আকবরের শাসনকালে মুঘলদের বাংলায় সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এদের দমন এবং পারস্পরিক ঐক্যকে বিনষ্ট করার দায়িত্ব জাহাঙ্গীর বাংলায় সুবাদারের হাতে অর্পন করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিস্তিকে সুবাদার নিয়োগ করে বাংলায় পাঠান।[39]

ইসলাম খান চিস্তি খুব সহজেই অনুধাবন করেন যে, বার ভূঁইয়াদের অন্যতম মুসা খানকে পরাজিত করলেই বাকিদের পরাভূত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ভৌগলিক কারণে ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এইসময় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের বিদ্রোহ দমন করে বিনা বাধায় ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন।[40] এরপর মুঘল আক্রমণে ভীত হয়ে ক্রমে বীর হামির, বীরভূমের শামস খান, হিজলীর সলিম খান ও ফরিদপুরের সত্রজিৎ জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।[41] ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খান সোনার গাঁ আক্রমণ করলে মুঘলদের সাথে মুসা খান ও অবশিষ্ট জমিদারদের নৌযুদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুসা খান ও অন্যান্য ভূঁইয়ারা জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এরফলে ধীরে ধীরে বারো ভূঁইয়াদের অঞ্চলগুলি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইসলাম খানের রাজত্বকালে সুবা হিসেবে সম্পূর্ণ বাংলায় মুঘল রাজত্বের সীমানা নির্ধারিত হয়। এইসময় উত্তর ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে রাজমহল থেকে পূর্বদিকে সিলেট ও

---

[38] *তদেব,*

[39] *তদেব,*

[40] *তদেব,*

[41] *তদেব,*

দক্ষিণ পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত সীমানা মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।[42] ইসলাম খান এরপর ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্বে কোচবিহার, কামরূপ ও ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় দখল করেন।[43] ইসলাম খানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তার সুবাদারী শাসনকাল দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ অবধি তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন।[44] শায়েস্তা খানের সুবাদারীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল চট্টগ্রাম বিজয়। চট্টগ্রাম বিজয় ছাড়াও কোচবিহার এবং আসাম দখল মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান নির্ধারন করেন।

## মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্মকীর্তনমূলক এবং বাস্তবসমাজচিত্রভিত্তিক কাহিনীকাব্যের যুগে ‘মঙ্গলকাব্য’ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আক্ষরিক অর্থে “মঙ্গলকাব্য” মূলত “মঙ্গল-সূচক” বা “কল্যাণ-সূচক” কাব্য হিসাবে উল্লেখিত। অর্থাৎ যে কাব্য পাঠে সর্ব অমঙ্গলের দূরীকরণ সম্ভব তাই “মঙ্গলকাব্য”। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গলকাব্য প্রধানত বাংলা সাহিত্যের “প্রথম ও নিজস্ব পাঁচালী-কাব্য”।[45] ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের আদর্শে অনুপ্রাণিত ‘মঙ্গলকাব্য’কে অনেকক্ষেত্রে ‘ধর্মভিত্তিক’ এবং ‘সাম্প্রদায়িক’ কাব্য হিসেবেও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্নিত করেন। আভিধানিক অর্থে “মঙ্গল” কথাটি “কল্যাণ” সূচকে বিবেচিত হলেও, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই শব্দটিকে “বিজয়” অর্থেও উল্লেখ করেছেন।[46] সেই সূত্রে, তুর্কি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে অবশ্যই চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে

---

[42] *তদেব,*

[43] *তদেব,*

[44] *তদেব, ৩৩৯।*

[45] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মঙ্গলকাব্য’, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা,* (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫০।

[46] *তদেব।*

বাংলায় ইসলাম শাসককূলের আক্রমণ ও ইসলামের ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়া নির্ভর অগ্রসরী হওয়ার প্রবনতা, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্ধী করে তোলে। এর ফলপ্রসূ আক্ষরিক অর্থে 'কল্যাণসূচক' কাব্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও, 'সাম্প্রদায়িক' অর্থেও মঙ্গলকাব্যকে বর্ণনা করা যায়।[47]

"মঙ্গলকাব্যের" উত্থানের পিছনে তুর্কি আক্রমণ ও ইসলাম ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব সর্বত্রস্থিত। অর্থাৎ, কাব্যের উত্থানের পিছনে "ধর্মভিত্তিক" ধারণার উৎসকে অস্বীকার করা যায়না। মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে "ধর্মভিত্তিক" বা "সাম্প্রদায়িক" ধারণাপ্রসূত কিনা, বিদ্বৎকুলের কাছে তা সর্বদাই বিতর্কের বিষয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য কাব্যের নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দেননি।[48] তার মন্তব্য অনুযায়ী, "মঙ্গলকাব্য" মূলতঃ বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ে সংগঠিত ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য।[49] পালরাজাদের সময়কাল থেকে বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাথে স্থানীয় লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ শুরু হয়। এরফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে।[50] সেনরাজাদের সময়কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করলে, বাংলায় দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটে।[51] মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ এর পরিচয় বহন করে। পরবর্তীকালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মঙ্গলকাব্যকে "অসাম্প্রদায়িক" হিসাবে বিবেচনা করেন।[52] সুকুমার সেনও "মঙ্গলকাব্য"কে ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কার বর্হিভূত "Secular"[53] কাব্য বলে মনে করেন। দেবতার "মাহাত্ম্যকীর্তন" কাব্যের মূল বিষয়

---

[47] *তদেব্।*

[48] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'পল্লীসমাজ ও পল্লীর সাহিত্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৯।

[49] *তদেব্,* ১০।

[50] *তদেব্।*

[51] *তদেব্।*

[52] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা,* (কলিকাতাঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫১।

[53] সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৬০।

হওয়ায়, ‘ অহিন্দু’ ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণই যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, একথা বলা বাহুল্য। তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় “মঙ্গলকাব্য”কে প্রতিযোগিতাপূর্ণ “সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক”[54] সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করেন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য নয়, তিনি এই কাব্যকে বর্ণবৈষম্যমূলক কাব্য হিসাবেও উল্লেখ করেছেন।[55] অনুরূপভাবে, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্যও “মঙ্গলকাব্য”কে “হিন্দু ধর্মাশ্রিত” কাব্য হিসাবে মন্তব্য করেন।[56]

মঙ্গলকাব্যের গঠনশৈলী প্রধানত চারটি অংশে বিভক্ত।[57] প্রথম অংশে, দেবদেবীর বন্দনার প্রভাব লক্ষ্যনীয়। কাব্যের এই অংশে পৌরাণিক এবং লৌকিক হিন্দু দেবদেবীর সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের দেবদেবীদের সহাবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই “বন্দনা”কে “অসাম্প্রদায়িক”[58] বলে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থ রচনার ‘পটভূমিকা’ বা কোন প্রেক্ষাপটে কবি কাব্য রচনায় ব্রতী হন, তা উল্লেখিত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কবিরা বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্য দৈবনির্দেশে রচনা করেছেন। অর্থাৎ সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কবিদের “ স্বপ্নাদেশ” যে কতোটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় নির্ভর, কাব্য রচনার শৈলীতেই তা প্রতিফলিত। বিশেষত, বিজয়গুপ্তের “ পদ্মপুরাণ” বা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গলকাব্য”কে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়গুপ্তের “পদ্মপুরাণ” রচনার সময়কালে হুসেন শাহ্ ছিলেন গৌড়ের সুলতান।[59] অর্থাৎ, কবির কাব্যে ইসলাম

---

[54] তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মঙ্গলকাব্য’, *মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য,* (কলিকাতাঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৫৮), ৪৯।

[55] *তদেব।*

[56] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ‘মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি’, *বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা,* (কলিকাতাঃ হাউস অব বুকস্, জানুয়ারী ১৯৫৭), ১।

[57] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মঙ্গলকাব্য’, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা,* (কলিকাতাঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫১।

[58] *তদেব।*

[59] আশুতোষ ভট্টাচার্য ( সম্পা. ও সং), ‘ ভূমিকা’, *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,* ( কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪), ১-১০।

অধ্যুষিত সমাজের প্রতিফলন থাকা স্বাভাবিক। কবি সরাসরি নৃপতি হুসেন শাহ্ এর উল্লেখ না করলেও, কাব্যে "হাসান ও হোসেন"[60] নামক দুই ইসলাম ধর্মপ্রচারকের উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, কবি হিন্দু সমাজে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল।

পরবর্তীতে তার কাব্যের বিভিন্ন অংশেও তা সুবিস্তৃত। বিজয়গুপ্ত ব্যতীত মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি, যেমনঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, বিষ্ণুপাল প্রমুখেরা তাদের সংস্করণে 'হাসান-হোসেনের' সাথে 'মনসা'র ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষকে উল্লেখ করেছেন। কবিদের কাব্যে 'মনসা' প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণের দেবী। ইসলাম আক্রমণকে প্রতিহত করার পর তিনি ক্রমে সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। 'হাসান-হোসেন' পর্বে তারা দুই ভাই ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাদের আদেশ অনুযায়ী ধর্মপ্রচারকরা সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের সময়কালে অপরিচিত মনসার সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে দেবীরূপে উত্থান তাদেরকে বিব্রত করে।

কবিরা তাদের কাব্যে 'মনসা'কে হিন্দু দেবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাব্যে 'হাসান-হোসেনে'র বক্তব্যের মাধ্যমে মনসাকে 'হিন্দুর ভূত'[61], 'হিন্দুয়ানী ডাইনি'[62] বলে উল্লেখ করেছেন। 'মনসা' হাসান ও হোসেনের কাছে একজন অজ্ঞাত দেবী। পূর্বপরিচিত যেসব দেবদেবীদের মন্দির তারা বিনাশ করেছে, 'মনসা'র দৈবীসত্তা তাদের থেকে আলাদা। এমনকি হাসান ও হোসেন যুদ্ধে

---

[60] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৫৫।

[61] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ,*মনসামঙ্গল*, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া,১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১০৭।

[62] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং),(কলিকাতাঃ শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৫৫।

পরাজয়ের পর ব্রাহ্মণ সহযোগে মনসার পূজাও করেন।[63] অর্থাৎ ‘মনসা’ ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা প্রেরিত এমন একজন দেবী, যিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের উপর বিজয়লাভ করে। এক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঙ্গলকাব্যকে ‘সাম্প্রদায়িক’ হিসেবে উল্লেখ করার ধারণাটি প্রমাণিত। আদিত্যকুমার লালা আবার মন্তব্য করেন যে, বাংলায় ইলিয়াসশাহী শাসন ব্যবস্থায় সাহিত্য রচনার যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, হুসেনশাহী শাসনকালে তার পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।[64] অনেকক্ষেত্রে মুকুন্দরাম, মাণিকদত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যেও তাই তৎকালীন শাসকের পৃষ্ঠপষোকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম নিজেও গৌড়ের সুলতান মামুদশাহের রাজ্যের অন্তর্গত তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর সেলিমাবাদ তালুকের অধিবাসী ছিলেন।[65] এইসময় তিনি তালুকদারের প্রদত্ত ভূমিবৃত্তিও ভোগ করতেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে মামুদশাহ পরাজিত হলে, দিল্লীর শাসক হিসেবে শেরশাহ তক্তে বসেন।[66] শাসক পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সাথে যে সামাজিক ঐতিহ্যও বিনষ্ট হয়, তার উল্লেখ মুকুন্দরামের কাব্যে বর্তমান। তার কাব্যের বিবরণ অনুযায়ী,

“শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল জেমতে
উরিয়া মায়ের বেশ আসিয়া শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয় সাত।

63 বংশীদাস রায়, *পদ্মাপুরাণ,* রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮ সন), ১৮৮।

64 আদিত্যকুমার লালা, ‘কথামুখ’, *মনসামঙ্গল কাব্যঃ জীবনদৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে,* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৯), ১০।

65 কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, ‘ভূমিকা’, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ২৭।

66 *তদেব।*

দন্য রাজা মানসিংহ    বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
রাজা মানসিংহ গেলে    প্রজার পাপের ফলে
বিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
উজির হইল রামজাদা    বেপারি বৈশ্যের খোদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
***************************
প্রভু গোপীনাথ নন্দী    বিপাকে হইলা বন্দি
সেই হেতু নাঞি পরিত্রাণে।
***************************
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ    চণ্ডিবাটি জার গাঁ
যুক্তি কইল গভির খাঁঞের সনে
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই    সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।"[67]

উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দেবী চণ্ডীর আদেশে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য লিখতে শুরু করেন। কবি কাব্যে যে দেবী চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যের বর্ণনা করবেন, তা সন্দেহাতীত। তবে, দেবীর মাহাত্ম্যকথা রচনার পূর্ব্বে তিনি যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদান করেন, তার একটি ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে। উল্লেখিত উক্তিতে দামিন্যার সেলিমাবাদ তালুকের সাত পুরুষের নিবাসী ছিলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। তৎকালীন সময়ে মানসিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করে মামুদ শাহ্ সিংহাসন লাভ করেন। মানসিংহের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মামুদ শাহের প্রভাবে যে বাংলায় ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়েছিল, কাব্যাংশে তা স্পষ্ট। কবির বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের প্রভাবে 'রামে' বা 'হিন্দু' ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি উজিরে পরিণত হয়। আবার বৈশ্য বা বণিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা 'খোদা' বা 'আল্লাহ্' অনুগামী হয়ে ওঠে। এই বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

---

[67] *তদেব্*, "প্রথম দিবসঃ দিবা", ৩।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য রচনার অনেক আগেই চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা প্রচলিত হয়েছিল। একদিকে মুসলিম ধর্মপ্রচারক এবং অন্যদিকে চৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তায়, ক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপরিউক্ত কাব্যাংশে ‘ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বিবাদে’র মাধ্যমে বিষয়টিকে অনুমান করা যায়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে তালুকদার গোপীনাথ যুদ্ধবন্দী হলে ‘মুকুন্দরামের’ বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর চণ্ডীবাটি গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ’র তত্ত্বাবধানে তিনি দামিন্যা ত্যাগ করে চণ্ডীবাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীমন্ত খাঁ’র পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন। মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য রচনার অনেক আগেই বাংলায় ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ শুরু হয়। এরফলে কাব্যে মুসলমান ও হিন্দুর সহাবস্থানের চিত্র পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে কবিদের ব্যাখ্যায় ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকট হলেও, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে তা মাত্রা অতিরিক্ত নয়।

‘মনসামঙ্গল’ এবং ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করলে ‘সাম্প্রদায়িক’ তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হল যে, মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘ধর্মভিত্তিক’ এবং ‘ সাম্প্রদায়িক’ এই দুই শব্দের পার্থক্য কিরকম? দেবদেবীর দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য অবশ্যই ‘ধর্মভিত্তিক’ কাব্য। তবে, এই ‘ধর্মভিত্তিক’ কাব্যের মধ্যে যখন অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তখন সেই কাব্য অবশ্যই ‘ সাম্প্রদায়িক’। সেইসূত্রে ‘মঙ্গলকাব্যে’ সামাজ জীবনের প্রতিফলন থাকায় তা কেবলমাত্র ধর্মীয় বার্তা প্রচার করেনা, অন্য ধর্ম থেকে নিজ ধর্মকে সুরক্ষিত করারও প্রচেষ্টা করে। এখানেই প্রধানত ‘মনসামঙ্গল’, ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এবং ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের মধ্যে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, ইসলাম ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য আবার ‘ মঙ্গলকাব্য’কে ‘ ধর্মবিষয়ক’ কাব্য হিসেবে বর্ণনা

করলেও, ‘ সাম্প্রদায়িক’ কাব্য হিসেবে উল্লেখ করেননি।[68] তার বক্তব্য অনুযায়ী, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত যে ধর্মভিত্তিক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘মঙ্গলকাব্য’ নামে পরিচিত।[69] এই আখ্যানকাব্যের মধ্যে লৌকিক, বৌদ্ধ ও বৈদিক ভাবধারার সংমিশ্রণ থাকায়[70], আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ‘ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক’ সত্তাকে বাতিল করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, সাধারণ অর্থে মঙ্গলকাব্য বলতে কি বোঝায়? Edward C. Dimock, Jr. মঙ্গলকাব্যকে “eulogistic poetry”[71] বা ‘গুণকীর্তনসূচক বা প্রশংসাসূচক কাব্য হিসাবে মন্তব্য করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনে করেন, “ মঙ্গলকাব্য” প্রকৃতপক্ষে লৌকিক শাক্ত ধর্মের অন্তর্গত এক ধরনের “ মঙ্গলসূচক” গান।[72] সুকুমার সেনও মঙ্গলকাব্যের কবিতার অংশগুলিকে “ ব্রতগীতি” বা “ritual song”[73] হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের সরল ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে “আখ্যায়িকা” কাব্য।[74] মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের একটি অন্যতম অংশ। লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণায় পরিপুষ্ট এটি এমন একটি “ ধর্মভিত্তিক আবরণ”, যার অন্তর্গত হতে পারে মূলতঃ সকল ধর্মের মানুষেরাই। উদাহরণ হিসাবে, মনসামঙ্গল “রাখাল” ও “ধীবর” সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারি।

---

[68] আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘ উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য’, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* ( কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪), ৯।

[69] *তদেব*।

[70] *তদেব,* ১০।

[71] Edward C. Dimock, Jr., “The Goddess of Snake in Medieval Bengali Literature”, *History of Religions,* Vol. 1, No. 2 (Winter, 1962): 307-321.

[72] আশুতোষ ভট্টাচার্য ( সম্পা. ও সং.), ‘ ভূমিকা’, *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,* ( কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), ১১।

[73] সুকুমার সেন, ‘বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ’, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৬১।

[74] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ‘মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি’, *বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা,* (কলিকাতাঃ হাউস অব বুকস্, জানুয়ারী ১৯৫৭), ১।

মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চাঁদ বণিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও, দেবী কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে সর্বপ্রথম তার কৃপাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে, ব্যাধ কালকেতুও দেবী চণ্ডীর মহিমায় রাজা হয়ে বসেন। এরপর ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তর পূজার্চনার দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনসামঙ্গলের "রাখাল" ও "ধীবর" সম্প্রদায় ছাড়াও ইসলাম ধর্মপ্রচারক "হাসান" ও "হোসেন"ও মনসা পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[75] এর মাধ্যমে অনুমান করা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য সকল ধর্মের মানুষের আরাধনাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অহিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা চণ্ডীপূজার দৃষ্টান্ত না থাকলেও, তিনি হিন্দু ধর্মের উভয় বর্ণের দ্বারা উপাসিতা তা প্রজ্বলিত।

## 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র পৌরাণিক অস্তিত্বের অনুসন্ধান

মঙ্গলকাব্যের গঠনকে অন্বেষণ করলে এর মধ্যে পুরাণের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খৃষ্ট পরবর্তী পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি সংস্কৃতি সাহিত্যে বিবিধ পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি যে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়, মঙ্গলকাব্যও সেই একই উদ্দেশ্যে রচিত হয়।[76] অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, 'মঙ্গলকাব্য' যেসব দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে রচিত তাদের একটি পৌরাণিক যোগসূত্র কবিরা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান গবেষণার বিষয় অনুসারে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই দেবী 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র পৌরাণিক সত্তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে,

"উক্তং দ্বয়োরুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমম্।
শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ।।

[75] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, '*মনসামঙ্গল*', অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১০।

[76] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৯।

কন্যা সা চ ভববতী কশপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।।
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি।।
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী।”[77]

উপরিউক্ত উক্তিতে সিদ্ধযোগিনী মনসা ত্রিনয়নী। তিনি ভগবতীর মানস কন্যা। তার উপাসনায় অন্তরের বিশুদ্ধিকরণ ঘটে। উক্তির প্রথমাংশে তার যোগিনীসত্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। তবে, তিনি ত্রিভুবনের দেবী কিনা সেই প্রসঙ্গটি স্পষ্ট নয়। এর পরবর্তী অংশে মনসার পিতা, পতি ও পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উক্তিটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়,

“ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।।
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষীণমীশ্বরং।
গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ।।
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তৈস্য কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃস্বইয়ম্।
স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ।।
ভৃশং জপৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহর।।
জগদেগৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।।
শিবশিষ্যা চও সা দেবী তেন শৈবীতি কীত্তিতা।
বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ।।
নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য।।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনী তথা।
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।।
সিদ্ধিং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী।
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাম্।
মহাজ্ঞানযুতাৎ তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।
আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনঃ।
আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা।।
প্রিয়া মুর্নেজবৎকারোর্মূনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।

[77] মহর্ষি বেদব্যাস, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্*, পঞ্চানন-তর্করত্নেন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতারাজাধান্যাম্, ১৮২৭ শকাব্দ), ১৬০।

যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারুপ্রিয়া ততঃ।।
জরৎকারুর্জগদেগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা।।
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরীতি চ।
মহাজ্ঞানাতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা।।”[78]

উল্লেখিত উক্তি অনুযায়ী, তিন যুগ তপস্যা করে মনসা স্বর্গলোক, নাগলোক ও ব্রহ্মলোকের (পৃথিবীলোক) অধিষ্ঠাত্রীতে পরিণত হন। তিনি শিবের ‘মানসকন্যা’, জরুৎকারু পত্নী এবং আস্তিক মাতা। মহাভারতে পরিক্ষিৎ পুত্র জন্মজেয়র যজ্ঞ থেকে তিনি সর্প কূলকে রক্ষা করেন। তিনি তাই ‘নাগলোকে’র জননী বা ‘নাগেশ্বরী’। এছাড়া নাগরাজ বাসুকির সাথে যোগসূত্র থাকায় তিনি ‘নাগভগিনী’ হিসেবে পরিচিত। তপস্যালব্ধ মহাজ্ঞান দ্বারা বিশ্বপূজিতা হওয়ায়, এই গৌরবর্ণা দেবী ‘জগৎগৌরী’ নামেও উল্লেখিত। অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে, যোগিনীশ্রেষ্ঠ মনসা কেবলমাত্র সাধনার দ্বারাই দেবীতে পরিণত হন। মনসামঙ্গল কাব্যের সংস্করণগুলিতে তিনি ‘শিবকন্যা’ হিসেবে পরিচিত হলেও, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তিনি শিবের ‘মানসকন্যা’। শিবের ‘মনের কামনা’ বা ‘যোগবলে’ তার কন্যাপ্রাপ্তি ঘটে। Tracy Pintchman তার গ্রন্থে ‘মানস সন্তান’ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য প্রদান করেছেন। তার মতামত অনুসারে, ‘মানস সন্তান’ দেবদেবীর মস্তিষ্কপ্রসূত এমন এক ধরনের ‘কামনা’, যার মধ্যে নির্দিষ্ট দেবতার গুণ বর্তমান থাকবে।[79] সেক্ষেত্রে ‘মনসা’র ‘যোগিনী’ বা ‘তপস্বী’ হওয়ায় প্রবণতা শিবের গুণ প্রসূত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মনসার পূজাপদ্ধতিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

“সুস্নাতঃ শুচিরাচান্তো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
রত্নসিংহাসনে দেবীং বাসয়ামাস ভক্তিতঃ।।
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব বহুকুম্ভস্থিতেন চ।
স্নাপয়ামস মনসাং মহেন্দ্রো দেবমন্ত্রতঃ।।
বাসসী বাসয়ামাস বহ্নিশুদ্ধে মনোরমে।
সর্ব্বাঙ্গ চন্দনং দত্ত্বা পাদ্যার্ঘ্যং ভক্তিসংযুতঃ।।

[78] *তদেব্।*

[79] Tracy Pintchman, “Gender Complementarity and Gender Hierarchy in Purāṇic Accounts of Creation”, *Journal of the American Academy of Religion* , Vol. 66, No. 2 (Summer, 1998): 272.

গনেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ পূজয়ামাস তাং সতীম্।।
ওঁ হ্রীং শ্রীং মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ দদৌ সর্ব্বং যথোচিতম্।।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং ভক্তিতো দুর্লতং হরিঃ।
পূজয়ামাস ভক্ত্যা চ ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুদা।।
বাদ্যং নানা প্রকারঞ্চ বাদয়ামাস তত্র বৈ।
বভুব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নভসোউউঅ মনসোপরি।।
দেববিপ্রাজ্ঞয়া তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাজ্ঞয়া।
তুষ্টাব সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ।।"[80]

উক্তিটির শেষ বাক্যে দেবী মনসার বিগ্রহ পূজার উল্লেখ রয়েছ। বিগ্রহরূপী মনসা দেবীর উপাসনা করা প্রয়োজন শুদ্ধ বস্ত্রে। রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, গঙ্গাজল ও চন্দন সহযোগে দেবীমন্ত্র উচ্চারণ করে তার পূজার শুভারম্ভের উল্লেখ উক্ত পুরাণে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্মে অন্যান্য দেবদেবীর মতো মনসা পূজার প্রারম্ভেও গনেশ ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আরাধনার করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তথা হিন্দু ধর্মের অন্যান্য গ্রন্থগুলি পুরুষ কর্তৃক রচিত হওয়ায়, তার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক। এইক্ষেত্রে ‘ মনসা’কে দৈবীসত্তা প্রদান করা হলেও পুরাণ রচয়িতারা প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে অনুসরণ করেছেন। মনসা পূজার ক্ষেত্রে উল্লেখিত উক্তিতে ষোড়শপচারের নির্দেশ রয়েছে। এমনকি পুষ্প ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তার আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসার ‘পৌরাণিক সত্তা’র মতো চণ্ডীর দৈবীসত্তার প্রকাশ কি পুরাণে পাওয়া যায়? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ‘ চণ্ডী’ উল্লেখিত ‘ মঙ্গলচণ্ডী’ রূপে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ষষ্ঠ উপাখ্যানে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ‘ তামসিক’[81] রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

[80] মহর্ষি বেদব্যাস, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্*, পঞ্চানন-তর্করত্নেন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতারাজাধান্যাম্, ১৮২৭ শকাব্দ), ১৬৪।

[81] *তদেব*, ১৫৯।

‘মঙ্গলচণ্ডী’র উত্থানের পিছনে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বর্তমান। অসুর ত্রিপুরাস্য প্রতিহত করতে বিষ্ণু ব্যর্থ হলে দুর্গতি নাশের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ‘মঙ্গলচণ্ডী’র দ্বারস্থ হন।[82] দেবী ত্রিপুরাস্য এর হাত থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন। অর্থাৎ দেবী এখানে ‘মঙ্গলদায়িনী’ এবং ‘দুর্গতিনাশিনী’। দেবী মঙ্গলচণ্ডীরও পূজাপদ্ধতির উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায়। উক্তি অনুসারে,

“পুজয়ামাস তাং শক্তিং দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ বলিভিবিবিধৈরপি।
পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর্ভক্ত্যা নানাবিধধৈর্ম্মুনে।।
ছাগৈর্ম্মেষৈশ্চ মহিষৈর্গণ্ডৈর্মায়াতিভিস্তথা।
বস্ত্রালঙ্কারমালৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈরপি।।
মধুভিশ্চ সুধাভিশ্চ পক্কৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
সঙ্গীতৈর্নর্ত্তনৈর্বাদ্যৈরুৎসবৈঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনৈঃ।।
ধ্যাত্বা মধ্যন্দিনোক্তেন ধ্যানেন ভক্তিপূর্ব্বকম্।
দদৌ দ্রব্যাণি মূলেন মন্ত্রেণৈব চ নারদ।।
ও হ্রীং শ্রীং ক্লীং সর্ব্বপুজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে
ঐং ক্রং ফট্ স্বাহেভ্যেবং চাপ্যেকবিংশাক্ষরে।”[83]

শক্তি দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজাকল্পে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যের আয়োজন অপরিহার্য। এর সাথে পশুবলিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ‘মঙ্গলচণ্ডী’র পূজার উপাচারের সাথে অনার্য দেবী ‘চণ্ডী’র পূজা সামগ্রীর সামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়। এছাড়া মধু, সুধা (মদ), বিভিন্ন ফলের সহযোগে তার নিবেদন সামগ্রীর আয়োজন করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কোন কোন ক্ষেত্রে মঙ্গলচণ্ডীকে ‘জগৎদ্ধাত্রী’ রূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে চণ্ডী ‘কৃষ্ণবর্ণ’ পরিত্যাগ করে ‘শ্বেতবর্ণ’এ বিরাজমান। এই রূপে দেবীর আরাধনা হয় বৈদিক পদ্ধতিতে। এই প্রসঙ্গে উক্তিটির উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়।

“মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ষস্য স বিষ্ণুঃ সর্ব্বকামদঃ।
ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মণ্ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মত।।
দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্।।

---

[82] *তদেব্।*

[83] *তদেব্।*

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্।।
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতম্।
*************************
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্।।"[84]

জগদ্ধাত্রী রূপী 'মঙ্গলচণ্ডী' শ্বেতবর্ণা বৈশিষ্ট্যের বিবরণ উপরিউক্ত উক্তি থেকে অনুমান করা যায়। উক্তিটির দ্বিতীয় বাক্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের উল্লেখিত দেবীর উপাসনার কথা বলা হয়েছে। তবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের যে স্তোত্রে 'মঙ্গলচণ্ডী'কে অসুরনাশিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই একই স্তোত্রে দেবীর মনোরম শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্তি অনুসারে, ষোড়শ বর্ষীয়া দেবী কোমল অঙ্গের অধিকারিণী। তার শ্বেত চম্পার মতো বর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল। তার সর্বাঙ্গ রত্নে ভূষিত। জগতের রক্ষাকর্তী এই দেবী সম্পদ প্রদানকারী। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচয়িতা অসুর নাশিনী শক্তিশালী দেবীকে কেন কোমল অঙ্গের অধিকারিণী করেছেন? এক্ষেত্রে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর শারীরিক গঠনকেই তার সৌন্দর্য ও গুণের মাপকাটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেবী হিসেবেও কোন নারী যদি পুরুষের সমতুল্য বলবান হয়, তাহলেও তার মধ্যে নারীসত্তার প্রকাশ থাকা অবশ্যম্ভাবী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'চণ্ডী'র মহামায়া রূপের অবতারণা ঘটে। চণ্ডীর একাধিক রূপের প্রতিফলন ঘটে 'মহামায়া' রূপের মাধ্যমেই।[85] তিনি একদিকে যেমন ভগবতী, অন্যদিকে নিত্যস্বরূপা রূপে নিত্যা এবং ঈশ্বরী।[86] বিশ্বজগৎ তারই সৃষ্টি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'মহামায়া' রূপকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারিণী করা হয়েছে। অর্থাৎ 'মহামায়া' এমন এক ধরণের 'মোহ' বা 'মায়া', যার মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্ব নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে চণ্ডী 'মহামায়া' প্রতীক হওয়ায় তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসেরও অধিকারিণী। এর

---

[84] *তদেব্।*

[85] সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, *মার্কণ্ডেয় পুরাণ,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ ১৩৬৭), ১৩৮।

[86] *তদেব্।*

ফলপ্রসূ বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত দুই অসুর মধু ও কৈটবকে তিনি বধ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয়। শক্তিরূপীনি 'মহামায়া' যখন 'মঙ্গলদায়ী' তখন তার প্রকাশ ঘটে দেবীর 'শ্বেতা' অংশে।[87] আবার দেবী যখন সংহারকারিণী, তখন তার 'তামসিক' রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।[88] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে 'চণ্ডী' কখনো শিবপত্নী 'সতী', আবার কখনো 'গৌরী'।[89] এক্ষেত্রে চণ্ডীর তামসিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়না। দক্ষকন্যা সতীর সাথে শিবের বিবাহ থেকে শুরু করে, সতীর দেহত্যাগ, গৌরীর জন্ম এবং পুনরায় শিবের সাথে বিবাহের ব্যাখ্যা এই পুরাণের মূল উপজীব্য।

## মঙ্গলকাব্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র অবস্থান

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'মনসা' ও 'চণ্ডীর' পৌরাণিক সত্তার আভাস কি 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে উভয় দেবীর 'দৈহিক' ও 'চারিত্রিক' বৈশিষ্ট্যকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা কিভাবে বর্ণনা করেছেন তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও উভয় দেবীর পূজাপদ্ধতি ব্রহ্মবৈবর্ত বা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনার সমতুল্য কিনা, তারও ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য।

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, পুরাণের দেবী 'মনসা' ও 'চণ্ডী', মঙ্গলকাব্যে লৌকিক সত্তায় বিরাজমান।[90] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সমাজ জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায়

---

[87] June McDaniel, *Offering Flowers, Feeding Skulls: Popular Goddess Worship in West Bengal*, (New York: Oxford University Press, 2004), 4-10.

[88] সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ ১৩৬৭), ১৪১।

[89] মন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেশিন প্রেস, ১৩১৪), ১২১-২৪৮।

[90] তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য*, (কলিকাতাঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৫৮), ৪৯।

মঙ্গলকাব্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র পৌরাণিক সত্তার বিলোপসাধন ঘটে।[91] তিনি আরও বলেন যে, সমগ্র মঙ্গলকাব্য জুড়ে এই দুই অনার্যের দেবী হিসেবেই পরিচিত।[92] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের 'মনসা' এবং মঙ্গলকাব্যের 'মনসার' বংশপরিচয় এক হলেও এদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।[93] তিনি চণ্ডীর উদ্ভব রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে জটিল তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী, পুরাণের দেবী 'চণ্ডী'র যখন মঙ্গলকাব্যে উত্থান ঘটে, তখন তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য এবং লৌকিক উভয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।[94] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কালকেতু ও ফুল্লরা' পর্বে চণ্ডী পূজার ক্ষেত্রে পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির অনুসরণ করা হয়নি। কালকেতু সরল বিধি মেনেই চণ্ডীর উপাসনা করেন। মনসামঙ্গলেও ধীবর ও রাখাল সম্প্রদায় সামান্য উপঢৌকন দিয়েই মনসার আরাধনা করে। এর মাধ্যমেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

সুকুমার সেনের মতে, 'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয় পৌরাণিক দেবীর মঙ্গলকাব্যে নিষ্ঠুর চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়ে, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা তাদের আর্যেতর সংস্কৃতির অন্তর্গত করেছেন।[95] আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'মঙ্গলকাব্য'গুলি পূর্ববর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির গতানুগতিক রচনা পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে।[96] তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন ছিল পৌরাণিক দেবীদের লৌকিক সত্তার বিকাশ সাধন করা।[97] এর ফলপ্রসূ 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র উত্থান ঘটে

---

[91] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা,* (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫৪।

[92] *তদেব্।*

[93] *তদেব্।*

[94] *তদেব্।*

[95] সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালী সমাজের বিবর্তন ও আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব', *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৬৩।

[96] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ২১।

[97] *তদেব্।*

'মঙ্গলকাব্যে'। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, 'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয় দেবীর পুরাণ ও পুরাণ বর্হিভূত স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কবিরা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবদেবীদের পৌরাণিক সত্তাকে অন্তর্গত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন। পুরাণের রীতি অনুসরণ করে গণেশ বন্দনা থেকে শুরু করে সমস্ত বৈদিক দেবদেবীদের বন্দনা করা হয়। এরপর মূল খণ্ডে লৌকিক ধারায় স্বতন্ত্র দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের ক্ষেত্রেও পৌরাণিক এবং লৌকিক ধারার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণার প্রয়োজনে সর্বপ্রথম 'মনসামঙ্গল' কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সত্তার সহাবস্থানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সামবেদে বৈদিক রীতি অনুসরণ করে বিগ্রহে 'মনসা' পূজার পূজাপদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[98] এখন প্রশ্ন হল, 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও কি একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে? নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ'এ বাছাই নামক এক শঠ কৃষককে শাস্তিদানের পর তার স্ত্রী 'মালতি'র পূজার্চ্চনায় তারা মুক্তি লাভ করে। এই আরাধনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তার বিবরণ এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়,

"হরসিতে বোলে পদ্মাবতি।
জক্ষ্মু মোর সংসারে    যাগে পূজা তোর ঘরে
সাবধানে সুনে মালতি।।
নবনাগে নটিঘট    জেন ধরি থাকে পট
যাব লাগে সেত য়াসন।
লাগাই আগুনের বাতি    পুষ্পধূপ সংহতি
বিস্তর লাগে অগর চন্দর।।
হংস ছাগল বেড়া    পূজা দিয় মইস গেজা
নির্তগিত মঙ্গল জয়কার।
চাঁপা কলা পঞ্চপাতে    তিল চাউল দুগ্ধসাঁতে
কৈল তোরে পূজার বিস্তার।।"[99]

---

[98] মহর্ষি বেদব্যাস, *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্*, পঞ্চানন-তর্করত্নেন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতারাজাধান্যাম্, ১৮২৭ শকাব্দ), ১৬১।
[99] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ২৫।

উক্ত কাব্যাংশে 'মালতি' মনসার আরাধনা করেন 'ভয়' থেকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে 'মনসা' 'যোগিনী' হওয়ায়, ভয়কে কেন্দ্র করে তার উপাসনা পুরাণ বর্হিভূত ধারণা। এছাড়া পুরাণে দেবী নাগেশ্বরী হলেও 'নাগ' পূজার উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়না। উল্লেখিত উক্তিতে 'মনসা' স্বয়ং নব ঘটে নয়টি নাগের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করতে বলেন। অর্থাৎ মনসা এখানে 'সর্পকাল্ট'। এছাড়াও হাঁস এবং ছাগল বলি দেওয়ার ধারণা এই উক্তিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণে এর ব্যাখ্যা নেই। এছাড়াও চাঁপা কলা, তিল, চাল এবং দুগ্ধের বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায়না। নারায়ণ দেবের কাব্যে চন্দ্র বণিক আবার পদ্মাপূজার যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তার মাধ্যমে শ্রেণীভিত্তিক ব্যবধানকে অনুমান করা যায়। প্রথমত, চন্দ্রধর বণিক ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈদিক উপায়ে মনসার পূজা করেছিলেন।[100] এর মাধ্যমেই মনসা পূজার দুই পৃথক পদ্ধতির ব্যাখ্যা কাব্য থেকে অনুসরণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, বণিক স্বর্ণ ও রৌপ্য সহযোগে মনসার পূজা করেন।[101] রত্ন সহযোগে 'মনসা' পূজার উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায়। তবে, মনসার আরাধনায় পশুবলি তাকে পৌরাণিক সত্তা থেকে বিচ্যুত করে। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে'ও উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের পূজাপদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। উভয় বর্ণই 'মনসা'র আরাধনা করে 'ঘটে'।[102] পৌরাণিক সত্তা অনুসারে মনসার যেখানে বিগ্রহে আরাধনার কথা বলা হয়েছে। পশুবলি ছাড়া বাকী পূজাপদ্ধতি পুরাণাশ্রিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসার ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজার আয়োজন কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিম্নবর্ণের মধ্যে দেবীর আর্য্যেতর সত্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলিতেও 'মনসা'র একই বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়।

[100] *তদেব*, ২৮২।

[101] *তদেব*।

[102] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কেলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৫২-৫৩।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘চণ্ডী’র পূজাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের ব্যবধানকে অনুধাবন করা যায়। তবে, এই উপাসনা বিধি পুরাণাশ্রিত কিনা তা বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু। মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয় ও বৃহৎদ্ধর্ম্ম পুরাণকে আশ্রয় করে ‘চণ্ডী’র রূপের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কাব্যে পুরাণের মতোই মধুকৈটব বধের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডী পুরাণাশ্রিত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নারীদের মধ্যে দেবী ‘ব্রতকথায়’[103] বিরাজমান। কাব্য অনুযায়ী ‘ব্রত’ ফলে নারী পুত্রসন্তান লাভ করে। ব্রতকথার সামগ্রী অনুসারে,

“গোমঞে লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম
লিখিল সুগন্ধি চন্দনে
উপরে ফুল-ঝারা মাঝেতে হেম-বারা
করিল নানা আয়োজনে।।
খুল্লনা পুজে চণ্ডী শোক-দুঃখখণ্ডি
মেলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী
কুমারীগণ মেলি দেই হুলাহুলি
সঘনে দেই শঙ্খধ্বনি।
**********************
বিচারি নানা তন্ত্র দিলেন সিদ্ধমন্ত্র
কানে কহে পুরোহিত।
অক্ষত মালা দীপ চন্দন দিল ধুপ
নৈবিদ্য রম্ভা নারিকল
মোদক রসাল আমান্নে পুরি থালা
আনিল নানা বনফল।
************************
ষোড়শ উপচারে বিবিধ উপহারে
করিল পূজার বিধান।
***********************
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা জাহ্নবীজল-গর্ভা
কাঞ্চন বিরচিত বারি
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পুজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পূজার অবসানে ছাগল মেষ আনে
শতেক দিল বলিদান।।”[104]

---

[103] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১৪২।

[104] *তদেব,* ১৪৪।

পৌরাণিক চণ্ডীর পূজাপদ্ধতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীদের ব্রতকথায় অনুসৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ সহযোগে ষোড়শ উপাচারে দেবীর আরাধনার কথা মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি 'পশুবলি'র বিষয়টিও পুরাণ আশ্রিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী 'চণ্ডী'র রূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের। কালকেতু পর্বে তিনি গোধিকা রূপ ধারণ করেন। দেবীর সরীসৃপের আকার ধারণ অবশ্যই তার পৌরাণিক রূপের বিপরীত। আবার ধনপতি ও শ্রীমন্তের কাছে তিনি 'কমলেকামিনী' রূপে আবির্ভূত হন। চণ্ডীর এই রূপের ব্যাখ্যাও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়না। মাণিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেবীর দেবীমাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'মহামায়া' প্রতীককে নির্ভর করে চণ্ডীর একাধিক নামের পরিচয় 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে' পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন চণ্ডীকা, চামুণ্ডা, কালিকা, অন্যদিকে তেমনি মহামায়া, শুভঙ্করী, ইন্দ্রানী, ব্রহ্মাণী, নারসিংহী, শঙ্করী, অভয়া, বেদবতী, কৌশিকী, বৈষ্ণবী, গৌরী প্রভৃতি।[105] অর্থাৎ 'মহামায়া' রূপের মধ্যে চণ্ডীর 'সত্য', 'তম' ও 'রজ' গুণ বিদ্যমান। পরিস্থিতি অনুসারে চণ্ডীর বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে এর আভাস পাওয়া যায়। মাণিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'চণ্ডী' ব্রতকথার দেবী। মুকুন্দরাম যেরকম ষোড়শ উপাচারে 'চণ্ডী' পূজার উল্লেখ করেছেন। মাণিকদত্তের কাব্যে সেই আড়ম্বরের পরিচয় পাওয়া যায়না। এক্ষেত্রে পুরাণে চণ্ডীর পূজাপদ্ধতি থেকে মাণিকদত্তের কাব্যে চণ্ডী ব্রতকথার আয়োজনে লৌকিক ধারা বর্তমান।

উপরিউক্ত আলোচনায় মঙ্গলকাব্যের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয় এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে উভয় দেবীর পৌরাণিক সত্তাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া পৌরাণিক সত্তা সমন্বিত উভয় দেবীর মঙ্গলকাব্যে অবস্থান পুরাণ নির্ভর কিনা সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। 'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয়ের পৌরাণিক সত্তা 'মঙ্গলকাব্যে'র দেবীসত্তা থেকে

[105] মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুনীল কুমার ওঝা (সম্পা.), (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৯৫-৯৬।

পৃথক। মঙ্গলকাব্য সমাজ জীবনের উপর নির্ভর হওয়ায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দুই দেবীর মধ্যে লৌকিক সত্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পুরাণে মনসা যেখানে যোগিনী, মঙ্গলকাব্যে তার মধ্যেই ক্রুরতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আবার পুরাণে মনসা পূজায় পশুবলির উল্লেখ না থাকলেও মঙ্গলকাব্যে বর্তমান। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আবার অনেকাংশে পুরাণ আশ্রিত। এখানে চণ্ডীর রূপের পৌরাণিক রূপের সমতুল্য। এমনকি মঙ্গলকাব্যে চণ্ডী ব্রতকথার দেবী হলেও, তার পূজাপদ্ধতি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অনুরূপ।

## <u>গবেষণার পদ্ধতি ও প্রশ্ন</u>

গবেষণার মূল প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে কি উপস্থাপন করা সম্ভব? বর্তমান গবেষণায় দেখানো হয়েছে কিভাবে প্রাচীন পুঁথিগুলির সাহায্য অবলম্বন করে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিসংখ্যান তত্ত্বের ভিত্তিতে লৌকিক দেবী ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডীর’ আঞ্চলিক অবস্থানকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভৌগলিক বিবরণগুলির লৌকিক ব্যাখ্যা মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন পুঁথি ও সংকলিত কাব্যের মাধ্যমেই আলোচনা করা হয়েছে।

‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ যহেতু আলোচনার প্রধান বিষয়, তাই উভয় দেবীর উত্থানের পিছনেও বিভিন্ন প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয়ের নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বের কি কোন বিশ্বব্যাপী ধারণা রয়েছে? এর উত্তরে বলা যায়, সমগ্র বিশ্বে ‘সর্পকাল্ট’ ও ‘মাতৃকাল্টে’র ব্যাপক অস্তিত্ব রয়েছে। তবে, ‘কাল্ট’ ও ‘সেক্টে’র মধ্যে তারতম্য কি, সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকরা পর্যালোচনা করেছেন। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘সেক্ট’ এক ধরণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় রীতিনীতি। অপরদিকে ‘কাল্ট’ বলতে ঐতিহাসিকরা এমনও এক ধরণের

ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন, যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক দেবী হিসাবে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে কি ‘সেক্ট’ ও ‘কাল্ট’ এর ধারণার অন্তর্গত করা যায়? উভয় দেবী সমাজে পূজিতা ‘ভয়’ ও ‘ভক্তি’র কারণে। সেইসূত্রে তাদের একাধিক আঞ্চলিক রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আঞ্চলিক রূপের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে ‘সর্পকাল্ট’ থেকেই ‘মনসা’ ক্রমে দেবীতে রূপান্তরিত হন। অর্থাৎ বলা যায়, ‘সর্পকাল্টে’র পর্যালোচনা এখানে বিশ্বব্যাপী ধারণা প্রসূত হয়ে জাতীয় এবং জাতীয় ধারণা থেকে ক্রমে স্থানীয় ধারণায় পরিবর্তিত হয়েছে। ‘চণ্ডী’র ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেখানেও ‘মাতৃকাল্টে’র বিশ্বব্যাপী ধারণা ক্রমে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে রূপান্তরিত হয়ে ‘চণ্ডী’র, ‘মহামায়া’ রূপের সাথে মিলিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, ‘সর্পকাল্ট’ ও ‘মাতৃকাল্টে’র অন্তর্গত এই উভয় দেবীর কি কোন প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব রয়েছে? এই বিষয়ে বলা প্রয়োজন যে, গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উভয় দেবী উপাসিত হন ‘কাল্ট’ হিসেবে। সেইক্ষেত্রে এই দুই দেবীর স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি বর্তমান। তবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র বর্ণনা থাকায় উভয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায়না। উভয় দেবীর উপাসনা যেহেতু ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত, তাই ‘কাল্ট’ হিসেবে পূজিতা ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে ‘সেক্টে’র ধারণার অন্তর্গত করা যায়। অপর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঙ্গলকাব্যের সাথে যেহেতু উভয় দেবী সংযুক্ত, তাই মঙ্গলকাব্যে এদের অবস্থান কিরকম? এছাড়াও ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয়েই শিবের সাথে সম্পৃক্ত ‘স্ত্রী’ ও ‘কন্যা’ হিসেবে। সেইক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যে কেন এই দুই দেবীর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিবরণ রয়েছে? উত্তরে বলা যায়, পুরাণে অস্তিত্ব থাকলেও মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ লৌকিক দেবী। মঙ্গলকাব্যে দুই দেবীর সমাজের মূলস্রোতে আসার প্রচেষ্টা, এবং সেইসূত্রে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূত্রপাতকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা ব্যাখ্যা করেছেন। তারা শিবকে কেন্দ্র করে উভয় দেবীর যোগসূত্র নির্মাণ করেছেন। এর একদিকে রয়েছে সর্প কাল্ট ‘মনসা’ এবং অন্যদিকে রয়েছে শক্তিরূপী ‘চণ্ডী’। ‘চণ্ডী’র

উত্থানের পিছনে আবার ‘শৈবধর্মে’র অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র ‘সৎ মা’ ও ‘সৎ কন্যা’র দ্বন্দ্ব নয়। ‘শৈবধর্ম’ ও ‘লৌকিক’ দেবীর দ্বন্দ্বকেও চিহ্নিত করে।

শিব যেহেতু উভয় দেবীর কেন্দ্রবিন্দু, ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শিবের অবস্থান কিরকম? এই ক্ষেত্রে অবশ্যই শিবের বিভিন্ন রূপকে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে শিবপুরাণ পর্যন্ত শিবের মধ্যে ‘তপস্বী’ রূপের প্রকাশ পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন অপরিহার্য যে, ‘তপস্বী’ শিবের বিবাহ কিভাবে সম্ভব? শিবপুরাণ অনুযায়ী, বিবাহ কখনোই শিবের তপস্বী বৈশিষ্ট্যের বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি। তাই বিবাহ হলেও তার আত্মা কলুষিত না হওয়ায়, তিনি যোগী রূপেই বিদ্যমান। তবে, মঙ্গলকাব্যে শিব কেন মানব রূপী? এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, মঙ্গলকাব্য যেহেতু সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তাই সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভ্যাস শিবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সেইসূত্রে ‘তপস্বী’ শিবের বহুবিবাহ, তার ধূমপান, প্রভৃতি মানবিক বিষয়গুলি শিবের দৈবীসত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গবেষণার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, মধ্যযুগের অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কিভাবে উভয় কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। অর্থাৎ এই উল্লেখিত সময়ের অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু অবশ্যই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়াও এই সময়ে বনাঞ্চল থেকে ‘নগর’ নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া। এর ব্যাখ্যা মঙ্গলকাব্যের কবিরাও তাদের কাব্যে বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগে বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বৈদিশিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হল, মঙ্গলকাব্যের কবিরা আভ্যন্তরীণ ও বৈদিশিক বাণিজ্যকে তাদের কাব্যে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত প্রদানের সময় কবিরা যে যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন, তা কি যুক্তিসম্মত? প্রকৃতপক্ষে কবিরা মঙ্গলকাব্যের বণিকদের বাণিজ্যপথকে বর্ণনার সময়ে

অনেকক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরফলে বিভিন্ন ‘দহে’র উল্লেখ পাওয়া যায়, যার কোন বাস্তবিক ভিত্তি নেই।

মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য কীর্তন মূলক কাব্য কি ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত? মঙ্গলকাব্যের কবিরা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলিকে তাদের কাব্যের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে ইসলাম আক্রমণের ফলে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। কবিরাও ধর্মীয় আঙ্গিকে বিষয়টিকে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের দ্বন্দ্বকে উল্লেখ করেছেন। কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দীতার উল্লেখ নয়, সহাবস্থানের চিত্রও পাওয়া যায় কবিদের বর্ণনায়। এছাড়াও হিন্দুধর্মের মধ্যে শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বকে কবিরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে?, তাও আলোচ্য বিষয়। উভয় দেবীই নিম্নবর্ণের। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উভয় দেবীর উত্থান ঘটলেও, কাব্যে বিভিন্ন ঘটনার নিরিখে তাদের রূপের তারতম্য নিম্নবর্ণের সত্তাকে বজায় রেখেছিল। এর মাধ্যমেই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতিকে অনুসরণ করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সর্বাধিক অপরিহার্য প্রশ্ন হল, বহুবিবাহভিত্তিক সমাজে নারীদের অবস্থান কি? মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেক সময় ‘সতীন কাঁটা’র প্রসঙ্গকে তাদের কাব্যে উল্লেখ করেছেন। কবিরা কি সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে, না স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যকে ‘সতীন কাঁটা’র আঙ্গিকে বহুবিবাহকে আলোচনা করেছেন? অপর একটি প্রশ্ন হল, নারীদের সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কবিরা কিভাবে প্রদান করেছেন? কবিরা নারীদের ‘পয়মন্তে’র বিচার করেছেন তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের নিরিখে। এই শারীরিক সৌন্দর্যের পরিকাঠামোয় যেসব নারীদের অবস্থান তারাই কবিদের ভাষায় ‘পয়া’। এছাড়া ‘সতী’ ও ‘অসতী’র বিচারও কবিরা করেছেন সৌন্দর্যের নিরিখে। সেক্ষেত্রে বিধবা রমণীদের সামাজিক অবস্থান কিরকম?, সেই বিষয়েও কবিরা দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন।

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়। মঙ্গলকাব্যের উভয় দেবীর বাণিজ্যিকীকরণ কিভাবে সম্ভব? এইক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি ও লোকচিত্রকলায় 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র অবস্থান কিরকম তা জানা প্রয়োজন। দুই দেবীর আঞ্চলিক রূপের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়? এছাড়াও লোকগানের মাধ্যমে উভয় দেবী কিভাবে বাণিজ্যিক উপাদানে পরিণত হচ্ছে? বর্তমানে টেলিভিশনের বিভিন্ন ধারাবাহিক, চলচ্চিত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন চ্যানেলে মঙ্গলকাব্যের দুই দেবীর উপস্থাপনা করা হয়। সেখানে কি বাণিজ্যিকীকরণের নামে দেবীদের সত্তাকে বিকৃত করা হচ্ছে? বর্তমান গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলি কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

## অধ্যায়গত পর্যালোচনা

### মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিত মনসা ও চণ্ডীর আঞ্চলিক অবস্থান

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে 'মঙ্গলকাব্যের নিরিখে চণ্ডী ও মনসার আঞ্চলিক অবস্থান' নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মনসা' ও 'চণ্ডীর' নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনাকে বিশ্বব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মনসা'র বিশ্বব্যাপী রূপ অনুযায়ী তাকে সর্পকাল্টের অন্তর্গত করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, সর্পপূজার অস্তিত্ব কিভাবে সর্বব্যাপী ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভারতের জাতীয়, এবং জাতীয় ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তন লাভ করে আঞ্চলিক দেবী মনসায় রূপায়িত হয়েছে? বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সর্পের সহিত 'অমঙ্গলের' প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রলোভন, আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয়গুলি।[106] প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সর্প প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে উপাসিত। Fergusson ধারণা অনুযায়ী সর্পের উত্থানের পিছনে

[106] W. G. Moorehead, "Universiy of Serpent-Worship", *The Old Testament Student*, Vol. 4, No. 5 (Jan., 1885): 206.

‘সেমিটিক’ বা ‘ আর্য’ অস্তিত্ব অনুপস্থিত।[107] তার বক্তব্য থেকে অ্যাসিরীয়, মিশর ও ল্যাটিন কল্পকাহিনীতেও সর্প ঐতিহ্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ কেল্ট উপজাতি এবং গথিক স্ক্যাণ্ডিনাভিয়দের মধ্যে সর্পকাল্টের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[108] প্রাচীন পারসিক পুরাণ, এমনকি অফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যেও সর্প ঈশ্বর রূপে বিরাজমান।[109] অতএব বলা যায়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সর্প পূজিত হয় কখনো মঙ্গল, আবার কখনো অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে।

অনুরূপভাবে, ভারতেও সর্পকাল্ট তার বৈশিষ্ট্যের পরিসর অতিক্রম করে আঞ্চলিক দেবী কাল্ট ‘মনসা’ এ রূপায়িত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ‘রাজমার্তণ্ড’ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত দেবী ভাগবত ও নাগদেবীও, পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে দেবী ‘ মনসা’ বা ‘ পদ্মা’ রূপে পূজিত হতে থাকে। এর ফলপ্রসূ, বঙ্গীয় পুরাণে সর্পকাল্টের অন্তর্গত মনসা, ক্রমে শিবের ঔরসজাত হয়ে ঈশ্বরিক ক্ষমতা যুক্ত ‘ মানবী’তে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংমিশ্রণে দেবী ‘ মনসা’ ক্রমে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম নায়িকা চরিত্রে পরিণত হয়। আর সর্পের সাথে বেষ্টিত বিভিন্ন ‘অমঙ্গলদায়ী’ বিষয়গুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে ‘মঙ্গলময়’ ধারণার সাথে যুক্ত হয়।

চণ্ডী কাল্টও ব্যাবিলন, মিশর, সুমের, এশিয়ামাইনর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ‘ফার্টিলিটি কাল্ট’ বা ‘উৎপাদনশীল’ প্রতীকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, ভারতীয় ‘ মাতৃমূর্তি’তে রূপায়িত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং পুরাণ গ্রন্থগুলিতে ‘ শক্তি’ কাল্টের সাথে ‘ মাতৃমূর্তি’ বা ‘ মাতৃ’ কাল্টের ধারণা সংযুক্ত হয়। সেখানে শক্তি মূলতঃ সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। শক্তি কাল্ট আবার ‘অশ্বেতা’ (কালী, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা) এবং ‘শ্বেতা’ (উমা, সতী, গৌরী, পার্বতী, অন্নপূর্ণা’), এই দুটি অংশে বিভক্ত। চণ্ডীর স্থান প্রধানত শক্তি কাল্টের অশ্বেতা অংশে। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এই

---

107 *তদেব,* ২০৬।

108 C. Staniland Wake, “The Origin of Serpent-Worship”, *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,* Vol. 2, (1873): 373.

109 *তদেব,* ৩৭৩।

‘শক্তিস্বরূপা’ দেবী ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির প্রভাবে ‘ দেবীমাহাত্ম্যের’ অন্তর্গত হয়ে ক্রমে ‘ মঙ্গলময়ী’ দেবীতে পরিণত হয়।

‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয় দেবী যেহেতু আমার গবেষণার প্রধান দুই চরিত্র, তাই ‘মঙ্গলকাব্যের’ কবিরা কাব্যের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে কিভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন? মঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি একাধারে মনসার পিতা ও চণ্ডীর স্বামী। অতএব, মঙ্গলকাব্যের কবিরা সামাজিক উপাদান সংযুক্ত করে, উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে, মনসামঙ্গলের কবিদের মতো, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র দ্বন্দ্ব অপেক্ষা একে অপরের প্রতি সহায়তামূলক ভাব সুস্পষ্ট। রামানন্দ যতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে সিংহলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে, ‘পদ্মা’ (মনসার অপর নাম) ‘কমলে কামিনী’ রূপে তাকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো মনসামঙ্গল কাব্যে এই দুই দেবীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ পাওয়া যায়না। এর পিছনে অবশ্যই মনসার শিবের জারজ সন্তান হওয়ার কারণ বর্তমান। তবে, আঞ্চলিকতার নিরিখে দুই দেবীর পরিচিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় দেবীর লৌকিক সত্তা দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত হয়ে কখনো ‘ বিমলা’, ‘ জগাতী’, ‘ বড়মা’, ‘ ব্রাহ্মনী’, ‘পদ্মা’ ও ‘ মনসা’ রূপে, আবার কখনো ‘ ঢেলাই চণ্ডী’, ‘ দেবীচণ্ডী’, ‘ জয়চণ্ডী’, ‘ বুলবুলচণ্ডী’, ‘আটবাইচণ্ডী’ প্রভৃতি চণ্ডীর বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

<u>**মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান**</u>

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান’ নির্ণয় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডীর’ আভ্যন্তরীণ সূত্রধর প্রধাণত শিব, সেহেতু তাকে এবং তার উপাসকদের কেন্দ্র করে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন বিবাদের সূচনা। এমনকি মনসা ও চণ্ডীর বিবাদের প্রধান কারণও তিনি। অতএব, তাকে বাদ দিয়ে ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের’ ব্যাখ্যা

সম্ভব নয়। তার পূর্বে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্কৃত ও পৌরাণিক সাহিত্যগুলিতে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। শিব মূলতঃ আপাতবিরোধী একটি চরিত্র। হিন্দু ধর্মে শিবের চরিত্রের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। শিব কখনো ‘ যোগী, আবার কখনো সে ‘ কামরূপী’। অন্যদিকে সে ‘পিতা’ আবার ‘পুত্র’ও। ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিবের রূপের ভিন্নতাও বর্তমান। শিবপুরাণ অনুযায়ী ‘শিবের’ ধারণার ব্যাপকতাকে অনুভব করা যায়। শিবপুরাণে শিব একাধারে যেমন ‘শক্তি’, তেমনি ‘মায়া’, আবার ‘জ্ঞানের’ প্রতীক।[110] তিনি সত্য, রজ, তম এর উর্দ্ধে।[111] শিব প্রধানত এমন এক ধরনের ‘ ডিসকোর্স’ বা ‘ ব্যাপ্তি’, যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি সম্পৃক্ত। Wendy Doniger O’Flaherty তার ‘Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva’ নামক প্রবন্ধের প্রথম ভাগে ‘শিবের’ স্ববিরোধী রূপের বর্ণনা করেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী, শিবের চরিত্রের সাথে দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে শিবের ‘ সন্ন্যাস’ রূপ, অন্যদিকে শিবের ‘কামরূপ’।[112] তার মতে, শিবের রূপ এই দুই বিষয়ের সমন্বয়েই সংগঠিত। অর্থাৎ শিব একাধারে যেমন তপস্বী, তেমনি সে আবার সৃষ্টির বা প্রজননের প্রতীক।[113]

কিন্তু মঙ্গলকাব্যে তার অবস্থান কিরূপ? মধ্যযুগে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায়, হিন্দু ধর্মেও শিবকে ভিত্তি করে সমাজ অনুযায়ী ‘শিবকেন্দ্রিক’ ধর্মীয় ধারণার বিবর্তন ঘটে। বিশেষত, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবকে কেন্দ্র করে ‘ত্রিকোণ’ সম্পর্কের ধারণা উৎপত্তি ঘটে। এই সম্পর্কের একদিকে যেমন শিবের পিতা রূপে অবস্থান, অন্যদিকে আবার পতি রূপে। আবার ‘শিবের’ ধারণার মধ্যে মধ্যযুগের সমাজজীবনের প্রতিফলনও পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে ‘ শিবের’

---

[110] ARNOLD KUNST & J.L. SHASTRI (ed.), *ANCIENT INDIAN TRADITION AND MYTHOLOGY: THE SIVA-PURAN*, VOL-I, (DELHI: SUNDARLAL JAIN & MOTILAL BANARSIDAS, 1969), 173.

[111] *তদেব*, ১৭৪।

[112] Wendy Doniger O’Flaherty, Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva (Part. I), *History of Religions*, Vol. 8, No. 4 (May. 1969): 300.

[113] *তদেব*, ৩০১।

পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে লৌকিক আধার সংযুক্ত হওয়ার, তার দৈবীসত্তার সাথে মানবিক ধারণাও সংযুক্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবের মধ্যে লৌকিক সত্তার সমন্বয় সাধনের জন্য তাকে 'প্রতীক' বা 'মডেল' রূপে ব্যবহার করেছেন। আর এই প্রতীকের সাথে মানবিক সত্তার সংযুক্তি ঘটিয়ে 'শিবকে' পিতৃতান্ত্রিক 'পুরুষের' কাঠামোয় আবৃত করতে উদ্যত হয়েছে। এমনকি মঙ্গলকাব্যের যুগে শিবের লোকায়িত রূপ, তার পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণকে খণ্ডন করে তাকে সাধারণ মানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ' মনসামঙ্গল' ও ' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শিবের অবস্থান সুস্পষ্ট। শিব এখানে কখনো পিতা, কখনো স্বামী, আবার আরাধ্য দেবতা। আবার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তিনি দারিদ্রতা আভরণে আবৃত। দারিদ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার জন্য শিবের রূপ ' দরিদ্র কৃষক'। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, উত্তরবঙ্গের সাধারণ কৃষক সমাজ শিবের ধারণার মাধ্যমেই পরিকল্পিত হয়েছিল।[114] কিন্তু কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তার কৃষিকার্যে অনিহা, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করায় তার সংসারের দারিদ্রতা মূলতঃ তৎকালীন সমাজে 'দরিদ্র কৃষকের' সাংসারিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটায়।

অর্থনৈতিক, ধর্ম, শ্রেণী ও লিঙ্গভিত্তিক ধারণার নিরিখে পৌরাণিক শিব কিভাবে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নের বর্ণিত হন? দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য অনুযায়ী শিব প্রধানত সকল বর্ণের আরাধ্য দেবতা।[115] পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের ' পদ্মাপুরাণ' থেকে শিবের চরিত্রকে শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা সম্ভব। কাব্য অনুযায়ী শিব ভিখারী। ভিক্ষা করে তিনি পরিবার পালন করেন। শিবের ' ভিক্ষুক' রূপ পৌরাণিক ' তপস্বী' বা ' যোগী' রূপের সমতুল্য।

---

[114] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪৩।

[115] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮)।

ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে ভিক্ষা করা কোনোরূপ হীন কাজ নয়। আর পুরাণে শিবের এই রূপ মানবিক সত্তার উর্দ্ধে। শিবের গৃহে দারিদ্রতা সর্বক্ষণ। দরিদ্রতার কারণে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা উপবাসী। প্রধানতঃ তৎকালীন সমাজে দরিদ্র পরিবারের দুঃখকে উপস্থাপিত করার জন্য, শিবের ভিক্ষুক রূপের উপস্থাপন। এখানে কবি বংশীদাস শিবের ভিক্ষুক রূপকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবদ্ধ করে। তবে, এখানে শিবের ‘ধূমপান’ এর বিষয়টি উল্লেখিত। কবি ‘ধূমপানের’ বিষয়টি এমনভাবে ‘শিবের’ সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যার মাধ্যমে শিবকে নেশাগ্রস্থ পুরুষের সাথে তুলনা করা যায়।

মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের ভিক্ষুক রূপ ঈশ্বর তুল্য হলেও, শিব স্বয়ং গিরিসুতাকে দরিদ্রের জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রায় সবগুলি সংস্করণে ‘ শিবের’ দারিদ্রতার বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও শিবের ‘বহুবিবাহ’। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মূলতঃ তৎকালীন সময়ের কুলীনপ্রথার সমর্থন জ্ঞাপনে শিবকে একাধিক বিবাহ দেন। ‘ শিব’ এখানে প্রতীক স্বরূপ। তিনি প্রধানতঃ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির শিকার। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাকে ব্যবহার করেন। শিবপুরাণে শিব পত্নীব্রতা, কারণ সতীর মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মচর্য পালন করে। এমনকি কেবলমাত্র জাগতিক প্রয়োজনেই তার পুনরায় বিবাহ করা। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে শিবের মানবিক সত্তার সাথে তৎকালীন পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ সাধন, প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। এর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ের সাথে শিবকে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে শিবের সোজাসাপ্টা তপস্বী রূপ বর্তমান। শিবের গৃহী জীবন কখনো তার তপস্বী রূপের খণ্ডণ করতে পারেননি। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা ‘ শিব’কে তৎকালীন সমাজের পুরুষের সমতুল্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই শিবের প্রতিচ্ছবির মধ্যেও শ্রেণীভিত্তিক ও

লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'শিব' এখানে নিজেই সামাজিক রাজনীতির শিকার। শিবকে ' দরিদ্র', তার ' বহুবিবাহে' অবস্থান, তাকে ' ব্যাভিচারী' এবং ' দায়িত্বহীন পিতা' এর প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করার পিছনে, সমাজের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত। প্রধানত শিবকে বৃহৎ প্রেক্ষিতে বিচার করে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলিকে তার অন্তর্গত করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ সেই সব বিষয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া।

**মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাংলার বাণিজ্যপথের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**

বাংলায় বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হল মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাথমিকভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলে, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে, মাহাত্ম্য প্রচার ব্যতিরেকে এর অন্যান্য বিষয়গুলিকে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য একদিকে যেমন 'মনসা' ও ' চণ্ডী'র বিভিন্ন রূপের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সহযোগিতা করে, অপরদিকে তেমনি শ্রেণীভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে। অনুরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে মধ্যযুগে নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাব্যের মুখ্য চরিত্র যেমন, চন্দ্রধর, ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সওদাগররা সুদূর সিংহলে সপ্তডিঙা ও মধুকর ভাসিয়ে কিভাবে বাণিজ্য করতেন, কাব্যগুলির মাধ্যমে তার কল্পনাশ্রিত চিত্রকে অনুধাবন করা যায়। এছাড়া তাদের বাণিজ্যিক কৌশল এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তাও কাব্যে বর্ণিত। বাংলার তথা বাঙালির বাণিজ্যের প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বাংলার বাণিজ্য আদৌ বাঙালির বাণিজ্য কিনা তাও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে উল্লেখিত। অনিরুদ্ধ রায় এই প্রসঙ্গে মনে করেন যে, ' বাংলার

সওদাগর’ এবং ‘ বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি’ সমুদ্রবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, বাংলার বণিকরা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বণিক কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।[116]

বারবোসার বৃত্তান্ত অনুযায়ী বাংলার বণিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান।[117] এরা ছিলেন মূলতঃ আরব, পারস্য এবং আবিসিনিয়া অঞ্চলের লোক।[118] অতএব, বাংলার বণিকের বাস্তবতা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ছাড়াও, স্থান ও সময়ের ভিত্তিতে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে নদী বাণিজ্যপথগুলিকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলির মধ্যে বিভিন্ন ‘দহ’ বা ‘ হ্রদের’ প্রকৃত অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘ দহ’গুলির অবস্থান আবার বাণিজ্যপথের ক্ষেত্রে লাভজনক না অলাভজনক তাও উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত। উদাহরণ হিসাবে ‘ কড়িদহ’, ‘শঙ্খদহের’ উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাণিজ্যপথের বিবরণের ক্ষেত্রে কবিরা অনেক সময় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরফলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে লেখা কাব্যের ভৌগলিক বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। জহর সরকার তার গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলার একটি ভৌগলিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বাংলার পশ্চিমদিক রাঢ়বঙ্গ, উত্তরদিক বরেন্দ্রভূমি, এবং পূর্বদিকে বঙ্গের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন।[119] ব্রিটিশ আমলে বংলার আবার পাঁচটি ভাগের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন, যেমনঃ পশিমে রাঢ়বঙ্গ, উত্তরে বরেন্দ্র, পূর্ব এবং মধ্যাংশে বঙ্গ, পূর্বে হরিকেলা এবং দক্ষিণ ও উপদ্বীপিয় অঞ্চল

---

116 সুশীল চৌধুরী, ‘মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,’ *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০*, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২২।

117 Duarte Barbosa, *The book of Durate Barbosa*, Mansel Longworth Dames (trs.), Vol. 2, (London : The Hakluyt Society, 1921), 135-141.

118 *তদেব।*

119 Jawhar Sircar, ‘Introduction’, *The construction of the hindu identity in medieval western Bengal: the role of popular cults*, (Kolkata: Institute of Development Studies, Calcutta University, July 2005), 10.

সমাতা নামে পরিচিত।[120] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কবিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীপথের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে রাঢ় বঙ্গ থেকে আগত কবি নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় বসে যে নদীপথের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রাঢ়বঙ্গের বৈদিশিক বাণিজ্যপথের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে বিজয়গুপ্ত যে নদীপথের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা নারায়ণ দেবের বর্ণনার সমতুল্য। উভয় কবির যোগসূত্র রাঢ় বঙ্গের সাথে থাকায় তাদের কাব্যে সেই যাত্রাপথের প্রকাশ পাওয়া যায়। বিপ্রদাস পিপিলাই আবার বারাসাত অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তার কাব্যে আবার আদিগঙ্গার নদীপথের বিবরণ রয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বর্ণিত নদীপথও আদিগঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আবার আভ্যন্তরীণ ও বৈদিশিক বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে মুকুন্দরাম, মাণিকদত্ত, দ্বিজ মাধব, রামানন্দ যতি প্রত্যেকেই গৌড়ের সাথে স্থলপথে, এবং সিংহলের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদিগঙ্গার পথ অনুসরণ করেছেন।

## মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের বিবরণ

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করা আমার গবেষণার অপর একটি উদ্দেশ্য। Richard Eaton এর বক্তব্য অনুযায়ী, তুর্কি আক্রমণের সময়কালে 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে, সমাজে ধর্মান্তকরণ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এই 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে তিনি চারটি তত্ত্বে বিভক্ত করেছিলেন, যথাঃ ইমিগ্রেশন থিওরি বা অভিপ্রয়ান তত্ত্ব, সোর্ড থিসিস বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব, রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ থিওরি বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব এবং রিলিজিয়ান অব্ সোশ্যাল লিবারেশন থিসিস বা সামাজিক ও ধর্মীয় উদারীকরণ তত্ত্ব।[121] এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও

[120] *তদেব*, ১৬।

[121] Richard M. Eaton, 'Mass Conversion to Islam: Theories and Protagonists', *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, 1204-1760, (New Delhi: Oxford University Press, 1994), 112-118.

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে তাদের কাব্যে কিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন? পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের প্রায় প্রতিটি সংস্করণে ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তবে, Richard Eaton যেভাবে ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন, মনসামঙ্গলের কবিরা কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে সেরূপে ব্যাখ্যা করেননি। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামীয়করণ প্রক্রিয়াকে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসা-মঙ্গল’ এ ‘হাসন হুসেনের’ সাথে মনসার যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা থেকে হিন্দু ও মুসলিমের দ্বন্দ্বের বিবরণ। তাদের কথোপকথনের কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ‘হাসনের’ মনসাকে ‘হিন্দুর ভূত’ হিসেবে বর্ণনা করে। আবার মনসাও হাসনকে মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মানের কথা বলেন।[122] অর্থাৎ সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এছাড়াও মনসা ও হাসনের একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বকেই ব্যাখ্যা করে। মনসা কর্তৃক হাসনের সম্পূর্ণ গ্রাম উজার করে দেওয়া, বিশেষত হাসনের ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের প্রাণে মেরে ফেলা, প্রধানত ইসলাম ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর ক্ষোভকে প্রতিফলিত করে। এর ফলপ্রসূ, তাদের ভয় ও ক্ষোভের প্রতিফলন হিসেবে বিভিন্ন মনসামঙ্গলের সংস্করণে ‘হাসন-হুসেন’ পর্বের উত্থান ঘটে। এখন প্রশ্ন হল, ‘হাসন-হুসেন’ নামের তাৎপর্যতা কি? ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে হুসেন শাহ্ এর কথা জানা যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা মনসা কর্তৃক হাসন-হুসেনকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কাহিনীর উত্থাপন ঘটায়, তা কারবালায় আল্লার দুই নবী ‘হাসন-হুসেনের’ ঘটনার সমতুল্য। অর্থাৎ তৎকালীন কবিরা ‘হাসন-হুসেনের’ হাত থেকে মনসার পূজা পাওয়াকে, মূলতঃ অহিন্দু ধর্মকে হিন্দু ধর্মের পদানত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলে যদিও ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। কিন্তু রামানন্দ যতি ও মুকুন্দরামের রচনায়, কালকেতু গুজরাট নগর স্থাপন করলে সেখানে অন্যান্য সকল শ্রেণীর সঙ্গে, ‘যবন’ বা ইসলাম ধর্মের

---

[122] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.),(কলিকাতা, লেখাপড়া, নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)।

সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি ইসলামীয় আক্রমণের কিছুকাল পরে রচিত হওয়ায় সেখানে সহাবস্থানের ভাব সুস্পষ্ট।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। এরপর বর্ণভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে শ্রেণীভিত্তিক, এবং শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে জাতিভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি করে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মন্দ দিকের বিবেচনা করেছেন। বিশেষত, নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাহিনীর প্রকাশ ঘটিয়ে, তাদেরকে ‘ অপরাধী’ বা ‘ দুর্জন’ হিসেবে বর্ণনা করতে উদ্যত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, ধীবরজাতির জালু-মালু কর্তৃক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীরূপী মনসাকে মাঝ নদীতে ফেলে দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত। চণ্ডীমঙ্গলে আবার কালকেতুর গুজরাট নগরীতে বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের মানুষদের ক্রমান্বয়ক্রমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এমনকি ধনপতির গৃহে দুর্বলা দাসীর শঠতাকে ব্যাখ্যা করে নিম্নবিত্ত অবলম্বনকারীদের ‘শঠ’ বা ‘দুর্জন’ হিসেবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, কাব্যে নিম্নবিত্ত অবলম্বনকারী নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করার প্রবণতা প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

## <u>মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান</u>

এই অধ্যায়ে ‘ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান’কে আলোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা তথা যেকোন সময়কালীন সমাজে, ‘লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান’কে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা ‘ নারীর সামাজিক অবদমন’ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হয়ে পড়ি। মঙ্গলকাব্যের নারীদের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা পূর্বের ও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত গবেষণাগুলিতেও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। জয়া সেনগুপ্তের রচনাতে যেমন বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে

নারীর দুরাবস্থার এবং স্বল্প ক্ষেত্রে নারীর সচেতনতার চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি মনসামঙ্গলের নিরিখে বিশ্লেষিত গবেষণাগুলিতেও নারীর সামাজিক অবহেলার রূপ পর্যালোচিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী সামাজিকভাবে অবদমিত, তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমনকি বর্তমান সমাজেও নারীর সামান্য ক্ষমতায়ণ সম্ভব হলেও, তারা কিন্তু সামাজিকভাবে অবহেলিত। তবে, বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ‘নারীর অবস্থান’ নির্ণয়ের সাথে ‘লিঙ্গভিত্তিক’ বিভিন্ন বিষয়গুলিও আলোচনা করা হবে। কারণ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনাকে ‘নারীভিত্তিক’ বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ‘নারী-পুরুষ’ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ‘যৌনতাকে’ আলোচনার মূল অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে তার অন্তর্জালের আবরণে ‘নারী’ ও ‘পুরুষ’ উভয়কে বেষ্ঠন করে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে’ কায়েম করেছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। প্রথমেই বলা যাক, সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান কিভাবে কায়েম হয়েছে? সমাজে পুত্রসন্তান একান্তভাবে কাম্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের নিরিখে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের’ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুত্রসন্তান কূল বা বংশ রক্ষা করে। আবার পরিবারকে বিভিন্ন সামাজিক বিপদ থেকেও রক্ষা করে। জরৎকারু মুনি বিবাহের পর মনসাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, মনসা তার কাছ থেকে ‘পুত্রসন্তানের’ কামনা করে। আবার শিবের ঔরসে চণ্ডীর পুত্রসন্তান পাওয়ায় ইচ্ছা মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে চিহ্নিত করে। এহেন সমাজে নারীর একান্ত ভরসা তার স্বামী ও পুত্র। আর কন্যাসন্তানের জন্ম হলে তাকে রক্ষা করবে কে? বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসা-বিজয়’ এ জরৎকারু মনসাকে অষ্ট পুত্রের বরপ্রদান করে। কন্যাসন্তানের জন্য কোনরকম কামনা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংস্করণগুলোতে পাওয়া যায়না। অর্থাৎ সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষপাত, উল্লেখিত উদাহরণের মাধ্যমে অনুমান করা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পাওয়া যায়।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর বয়স সীমা সাত থেকে এগারো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[123] কিন্তু পাত্রের কোন বয়স সীমার উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়না। রজঃস্বলার পর রমণীর শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এর সাথে তার বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়। সে তার শরীর সম্বন্ধে অবগত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর শরীর সম্বন্ধীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই তাকে বৈবাহিক কাঠামোয় বন্দী করতে আগ্রহী। বিবাহের ক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণপ্রথা। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যাকে সুখী করার জন্য পাত্রপক্ষকে যৌতুক প্রদান করে। যৌতুকের পরিমাণ ঠিক কতোটা হতে পারে, তার ব্যাখ্যা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। পাত্রপক্ষের যৌতুক পাওয়ার আকাঙ্খাও মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহ তার পুরুষত্বকে প্রমাণ করে। একাধিক বিবাহের পর ‘সতীনদের’ নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার আভাষও মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। ‘সতীন কাঁটা’ এর বিষয়টি নারীদের ক্ষোভ ও ঈর্ষার প্রতিফলন ঘটায়। ঈর্ষা ও ক্ষোভের কারণে সে নানারকম ষড়যন্ত্র করে। এমনকি, সতীনকে কলঙ্কিত করার জন্য নানারকম পরিকল্পনা করে। উদাহরণ হিসেবে, খুল্লনাকে কলঙ্কিত করার জন্য লহনার ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করা যায়। সতীনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্রত পালনের কথাও মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত। তবে, ‘সতীন বিদ্বেষী’ ধারণা পুরুষের বহু বিবাহের প্রতিফলন এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ‘ সতী’ নারীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ‘ সতী’ নারী, পতি ও পরিবারের অনুগত। পতির অনুমতি ছাড়া সে তার যৌনতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। পুরুষ যৌন আকাঙ্খা নিবৃত্তিকরণের জন্য একাধিক বিবাহ করে। প্রয়োজনে গণিকালয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু নারীর কামনাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রশয় দেয়না। বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনার মতো চরিত্রগুলো পিতৃতন্ত্রের

---

[123] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ- বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১১৩।

সৃষ্টি। এরা স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে পারে। কিন্তু স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা ভাবতেও পারেনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বেহুলা, ফুল্লরা ও খুল্লনার মতো চরিত্র সৃষ্টি করে 'সতী' নারীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। সমস্ত নারীদের অবশ্যই বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্তর্গত হতে হবে। তারা নাহলে ' সতী' তক্‌মা থেকে বিচ্যুত হবে।

এছাড়াও বর্তমান অধ্যায়ে নারীর ' সৌন্দর্য'কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনকি কবিদের কল্পনা বা উভয় দেবী কর্তৃক প্রদত্ত ' স্বপ্নাদেশে'ও নারীর দৈহিক বিবরণেও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি সুস্পষ্ট। কাব্যগুলিতে বিভিন্ন সময়ে নারীর ' সৌন্দর্য'কে বস্তুতান্ত্রিক ধারণার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর একমাত্র লক্ষ্য পুরুষের চাহিদাকে সন্তুষ্ট করা।

গবেষণার অন্তিম মন্তব্যে উপরিউক্ত অধ্যায়গুলির পুনরাবৃত্তি ব্যতিরেকে, লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ' মনসা' ও ' চণ্ডী' উভয় দেবী এবং ' মঙ্গলকাব্যের' বাণিজ্যিকীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মনসা ও চণ্ডীর লৌকিক রূপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ধমানের বেহুলা মেলা, পুরুলিয়ার মনসামেলা, মেদিনীপুরের ওলাইচণ্ডীর মেলা, নদীয়ার খেলাইচণ্ডীর মেলা গুরুত্বপূর্ণ। মেলায় বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান এবং পালাগানের আয়োজন একদিকে যেমন জনসাধারণের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করে, অন্যদিকে তেমনি মেলা ঘিরে থাকা মানুষদের অর্থনৈতিক চাহিদাও পূরণ করে। এরপর বিভিন্ন লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলার মাধ্যমে উভয় দেবীর কিভাবে বাণিজ্যিক মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের উপর অঙ্কিত পটচিত্রগুলি লোকগান সহযোগে রচিত হওয়ায় তা দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। এইসব পট মণ্ডপসজ্জায়ও ব্যবহার করা হয়। সর্বোপরি 'মনসা' ও ' চণ্ডী'কে ঘিরে বিভিন্ন ধারাবাহিক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ বর্তমানে এই দুই কাল্টের বাণিজ্যিকীকরণের পর্যায়ে উন্নীত করছে।

# প্রথম অধ্যায়

## মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিত মনসা ও চণ্ডীর আঞ্চলিক অবস্থান

গ্রামবাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে "মনসা" ও "চণ্ডী" বৃহত্তর জনমানসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। অসামান্যা জনপ্রিয় এই দুই লোকদেবী পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ও রাঢ় অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কোথাও গ্রামদেবী, কোথাও আঞ্চলিক দেবতা, আবার কোথাও কুলদেবী হিসাবে উপাসিতা। মঙ্গলকাব্যে অবশ্য উভয় দেবীর অবস্থান পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেবী চরিত্র রূপে। লৌকিক "দেবী" হওয়ার কারণে উভয়ের উপাসনার পদ্ধতিও হিন্দু ধর্মের তথাকথিত পূজাপদ্ধতি থেকে পৃথক। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণে কবিরা উভয় দেবী চরিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ককে উল্লেখ করায়, এদের দেবীসত্তার মধ্যেও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, মঙ্গলকাব্যের দেবী "মনসা" ও "চণ্ডী" কি আঞ্চলিক দেবী "মনসা" ও "চণ্ডী"র ধারণার সমতুল্য? কারণ ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত "মনসামঙ্গল" ও "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে এই দেবীদ্বয় পূজিত কেবলমাত্র ভয় ও ভক্তির সম্মিলিত কারণে। লৌকিক দেবী "মনসা" ও "চণ্ডী" বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "দেবীমাহাত্ম্যের" ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উপাসিতা। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকাকে পুনরায় বিশ্লেষণ করলে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই নিম্নবর্ণের দেবীর হিন্দুধর্মের মূলস্রোতে আগমন ঘটেছে তাও অনুমান করা যায়। অতএব, "মনসা" ও "চণ্ডীর" আঞ্চলিক দেবী হিসাবে অবস্থান নির্ণয়ের পূর্ব্বে প্রয়োজন "মঙ্গলকাব্যে" তাদের অবস্থানকে চিহ্নিত করা। এর পূর্বে মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করাও প্রয়োজনীয়।

## ১.১ মনসা ও চণ্ডীর নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই বিপরীতমুখী দেবীর আঞ্চলিক অবস্থানকে উল্লেখ করার পূর্বে প্রয়োজন উভয় দেবীর বিশ্বব্যাপী ধারণাকে অন্বেষণ করা। এই উদ্দেশ্যে 'মনসা ও চণ্ডী' কাল্টকে ক্রমে বিশ্বব্যাপী ধারণা থেকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ মঙ্গলকাব্য তথা গ্রামবাংলার লোকদেবী "মনসা" ও "চণ্ডী" "মানবী" রূপে পূজালাভ করলেও, তার বিশ্বরূপ কিন্তু পৃথক। এখন প্রশ্ন হল, শৈব কাল্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই দুই দেবীর উপাসনাকে কি কাল্টের অন্তর্গত করা যায়? তবে, সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন "কাল্ট" বলতে কি বোঝায়? প্রত্যক্ষভাবে কাল্ট বলতে কোন দেবী বা দেবতা এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতিকে বোঝায়। তাহলে 'সেক্ট' কি?

Max Weber আবার খ্রিস্টীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে 'সেক্টের' ধারণাকে বিবেচনা করেন। তিনি 'সেক্টকে' এমন এক ধরণের প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার অন্তর্গত হয়ে খ্রিস্টীয় ধর্ম পাশ্চাত্য জগতে জনপ্রিয়তা লাভ করে।[1] তিনি মূলতঃ খ্রিষ্টীয় চার্চ এবং চার্চ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় রীতিনীতিকে 'সেক্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেন।[2] তার এই মতবাদ যদি ভারতীয় ধারণাভুক্ত করা হয়, তাহলে এখানে 'সেক্ট' বলতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কথা মনে পড়ে। তাহলে 'কাল্ট' এবং 'সেক্ট' কি পৃথক ধারণাভুক্ত?, নাকি উভয় একই ধারণার অন্তর্ভুক্ত? James T. Richardson কাল্টের ধারণার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলিকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেন। তার মতানুযায়ী, 'কাল্ট' এমন একটি বিষয় যার মধ্যে 'শুভ-অশুভ', 'ভয়-ভক্তি', 'রহস্য' এবং কোন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রবর্তিত রীতিনীতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।[3] এই জাতীয় রীতিনীতির হয়তো

---

[1] William H. Swatos, Jr., "Weber or Troeltsch? Methodology, Syndrome, and the Development of Church-Sect Theory", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 15, No. 2 (Jun., 1976): 129- 144.

[2] *তদেব, ১৩২।*

[3] James T. Richardson, "Definitions of Cult: From Sociological-Technical to Popular-Negative", *Review of Religious Research,* Vol. 34, No. 4 (Jun., 1993): 348-349.

সামাজিক স্বীকৃতি নেই, কারণ মূলস্রোতের ধর্মীয় ধারণা থেকে তা পৃথক।[4] তিনি মূলত খ্রিষ্টীয় বা খ্রিষ্টিয়ানিটির ধারণার প্রেক্ষিতে ‘কাল্ট’কে ‘সেক্ট’ এর ধারণার থেকে আলাদা করেছেন। ‘সেক্ট’ বলতে তিনি চার্চ কর্তৃক প্রদর্শিত ধর্মীয় রীতিনীতিকে বোঝান।[5] আবার ‘কাল্ট’ হল এমন এক ধরণের ধর্মীয় রীতিনীতি যার কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই।[6] তার প্রবন্ধ অনুযায়ী ‘কাল্ট’ মূলত প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী রূপ। আর ‘সেক্ট’ হল প্রধানত প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি।

Chris Bader এবং Alfred Demaris আবার ‘সেক্ট’ এর ধারণা থেকে ‘কাল্টের’ ধারণাকে পৃথক করেছেন। তার মতানুযায়ী, ‘কাল্ট’ প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত ধারণার থেকে ব্যতিক্রমী একটি বিষয়। আর ‘কাল্ট’ এর বিষয়গুলিকে ‘সেক্টের’ ধারণায় অবতারণা করার পিছনে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে ‘কাল্ট’ হল ধর্মের অপ্রাতিষ্ঠানিক রূপ, যা ‘সেক্ট’ বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে নবরূপে রূপায়িত হয়।[7] সেক্ষেত্রে কাল্টের অন্তর্গত স্বতন্ত্র বিষয়গুলিও বিলুপ্ত হয়। James T. Richardson ‘ কাল্ট’ থেকে ‘ সেক্টে’ উত্তরণের চারটি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, ধর্মীয় বিষয়সমূহ, দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় বিষয় সমূহের স্বতন্ত্রকরণ, তৃতীয়ত, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা কোন পৃথক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, চতুর্থত, ধর্মীয় ধারণার মূলস্রোতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বাহ্যিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক ধারণার সমন্বয় সাধন।[8] এইভাবেই কাল্টের ধারণা ক্রমে সেক্টের ধারণায় রূপান্তরিত হয়। William Sims Bainbridge এবং Rodney Stark আবার কাল্টের ধারণার রূপান্তরের পিছনে একধরণের সামাজিক ও ধর্মীয় আদানপ্রদানকে দায়ী করেছেন। একে কেন্দ্র করে ‘প্রাকৃতিক’

---

[4] *তদেব, ৩৫০।*

[5] *তদেব, ৩৫১।*

[6] *তদেব।*

[7] Chris Bader and Alfred Demaris, “A Test of the Stark-Bainbridge Theory of Affiliation with Religious Cults and Sects”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 35, No. 3 (Sep., 1996): 287-289.

[8] James T. Richardson, “ From Cult to Sect: Creative Eclecticism in New Religious Movements”, *The Pacific Sociological Review*, Vol. 22, No. 2 (Apr., 1979): 143-145.

বিষয়ের সাথে সংযুক্ত কাল্টের বিভিন্ন রহস্যদায়ক বা লৌকিক ধারণা, ঈশ্বরের ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে ঈশ্বরাধীন হয়ে পড়ে।[9]

এখন প্রশ্ন হল, ভারতের প্রেক্ষিতে কাল্টের কিরকম ধারণা পাওয়া যায়? আর এই ধারণা সেক্টের বিষয়সমূহের থেকে কতোটা পৃথক? Max Weber এর তত্ত্বকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা হয়, তাহলে হিন্দু ধর্মে 'সেক্ট' বলতে 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'কে বোঝায়। অর্থাৎ ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মই এক্ষেত্রে 'সেক্ট'। ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি বহুদিন ধরে জনমানসে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে সেই রীতিনীতি অবশ্যই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে, যখন বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম দুই প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে হিন্দু ধর্মের নিম্নশ্রেণীর উদ্দেশ্যে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এই প্রক্রিয়া এক ধরণের 'ধর্মবিপ্লবের' সমতুল্য। J. Gordon Melton এর বক্তব্যেও 'নিউ রিলিজিয়াস মুভমেন্ট' বা 'নব ধর্মবিপ্লবের' ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি এই নতুন ধর্মকে 'কাল্ট' হিসাবে বর্ণনা করেন।[10] কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সময়কালও সীমিত। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন লৌকিক নিম্নবর্ণের দেবদেবীর সামাজিক উত্থান শুরু হয়। এদের কোনোরকম বৈদিক ও পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য না থাকায় এরা লৌকিক বা আঞ্চলিক "কাল্ট" হিসাবে চিহ্নিত। অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলায় বৈদিক ও পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য বর্হির্ভূত বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবদেবীরা নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নতুন ধর্মীয় কাল্ট হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তর্গত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে 'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয়ই স্বতন্ত্র কাল্টের অন্তর্গত। কারণ মনসা যেমন সর্প কাল্টের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি চণ্ডী 'মাতৃ বা সৃষ্টি'র ধারণার সাথে যুক্ত। আক্ষরিক অর্থে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধী বৈশিষ্ট্যের উপাদান থাকলেও, উভয়ই 'দেবীমাহাত্ম্যের' অন্তর্গত হয়ে 'সেক্ট' বা 'প্রাতিষ্ঠানিক' ধর্মীয় ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে দেবীত্ব লাভ করেছে। মনসা ও চণ্ডী

---

[9] William Sims Bainbridge and Rodney Stark, "Cult Formation: Three Compatible Models", *Sociological Analysis,* Vol. 40, No. 4 (Winter, 1979): 283-295.

[10] J. Gordon Melton, " Perspective: Toward a Definition of "New Religion", Nova Religion: *The Journal of Alternative and Emergent Religions,* Vol. 8, No. 1 (July 2004): 73.

কিভাবে ‘ কাল্ট’ থেকে ‘ সেক্টে’ রূপায়িত হয়, তা জানার জন্যে আমাদের দুই দেবীর নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

মনসা সর্পদেবী। আর সর্প কাল্টের নিজস্ব একটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি রয়েছে। বর্তমানের আলোচনা মূলতঃ সর্পপূজার অস্তিত্ব কিভাবে সর্বব্যাপী ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভারতের জাতীয়, এবং জাতীয় ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তন লাভ করে আঞ্চলিক দেবী মনসায় পরিবর্তিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে আগ্রহী। বিশ্বব্যাপী ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গেলে সর্বপ্রথম বাইবেলের সর্প সম্পর্কিত বিবরণকে আশ্রয় করা প্রয়োজনীয়। বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সর্পের সহিত অমঙ্গলের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আর এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে প্রলোভন, আকাঙ্খা, প্রভৃতি বিষয়গুলি।[11] সর্পপূজার আদিম রূপকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এর প্রতীকী চিহ্নের বর্ণনা করা।

Fergusson এর ধারণা অনুযায়ী সর্পের অস্তিত্ব সরাসরি প্রকৃতি তথা বৃষ্টি ও বায়ুর সঙ্গে যুক্ত।[12] Fergusson যদিও সর্পের উত্থানের পিছনে ‘Semitic’ অথবা ‘আর্য’ অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ভারত ও গ্রীসে সর্পপূজার উদ্যোগ সম্ভবত সেই জায়গার আদিবাসী মানুষদের কর্তৃক গৃহীত।[13] এছাড়াও তার বক্তব্য থেকে অ্যাসিরীয়, মিশর ও ল্যাটিন কল্পকাহিনীতেও সর্প ঐতিহ্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। C. S. Wake আবার ব্রিটিশ কেল্ট উপজাতি এবং গথিক স্ক্যাণ্ডিনাভিয়দের মধ্যে সর্পকাল্টের অস্তিতের কথা স্বীকার করেছেন।[14] প্রাচীন পারসিক পুরাণেও সর্প উপাসনার

[11] W. G. Moorehead, “Universality of Serpent-Worship”, *The Old Testament Student*, Vol. 4, No. 5 (Jan., 1885): 206.

[12] *তদেব*, ২০৬।

[13] C. Staniland Wake, “The Origin of Serpent-Worship”, *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,* Vol. 2, (1873): 375.

[14] *তদেব*, ৩৭৩।

অস্তিত্ব আছে।[15] শুধুমাত্র তা নয়, পশ্চিম আফ্রিকায়ও সর্পের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব বর্তমান।[16] অর্থাৎ আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যেও সর্প ঈশ্বর রূপে বিরাজমান।

সর্প আরাধনার ব্যাপক প্রসারকে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, সর্প সমগ্র পৃথিবীতে কি রূপে উপাসিত? বিশ্বে তার অবস্থান কতোটা মঙ্গল এবং কতোটা অশুভ বা অমঙ্গলসূচক? এই প্রসঙ্গে সর্পের প্রাচীন উল্লেখগুলির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রাচীন উল্লেখ অনুযায়ী কল্পকাহিনীতে সর্প 'ড্রাগন'[17] রূপী। আবার পশ্চিম আফ্রিকায় সর্পকে পবিত্র রূপে চিহ্নিত করা না হলেও, তার উপাসনা কিন্তু হয় দৈবিক উপায়ে।[18] এর পিছনে হয়তো দৈবিক উপায়ে আরাধনা করে এই প্রাণীকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমেরিকায় সর্পকাল্টের আরাধনা সেই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব অনুমান করা যায়, এখানে সর্প একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চীনে সর্প আবার ড্রাগন প্রতীকে বিরাজমান, এবং এই কাল্ট বৃষ্টি প্রদায়ী রূপে পরিচিত।[19] অর্থাৎ চীনে ড্রাগন অথবা ড্রাগনরূপী সর্পমূর্তি প্রত্যক্ষভাবে মঙ্গলদায়ক। C.S.Wake আবার চৈনিক সর্প সম্পর্কিত ধারণাকে ভারতীয় আর্য কল্পকাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছে।[20] সেখানে তিনি বলেছেন যে, আর্য পৌরাণিক কাহিনীতে যেভাবে ইন্দ্র, অহিকূলকে পরাস্ত করে অবশেষে জীবজগৎকে বৃষ্টি প্রদান করেন, চৈনিক কল্পকাহিনীতেও এর সমরূপ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে Cox ও এই ধারণাকে স্বীকার করেন।[21] ল্যাটিন মিথলজিতেও এই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য

---

[15] *তদেব্।*

[16] *তদেব্,* ৩৭৪।

[17] *তদেব্।*

[18] *তদেব্।*

[19] *তদেব্।*

[20] *তদেব্।*

[21] *তদেব্,* ৩৭৫।

করা যায়, যেখানে ইন্দ্রের মতো হারকিউলিসও অহিকূলের Cacus কে বিনষ্ট করে পৃথিবীতে বৃষ্টি আনতে সমর্থ হয়।[22]

সর্প কাল্টের তিনটি প্রধান বিষয়কে উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, তিনটি কল্পকাহিনীতেই সমধারণা বর্তমান। দ্বিতীয়ত, তিনটি কাহিনীতেই সর্প ও প্রকৃতি সম্পর্কযুক্ত এবং অবশেষে, তিন ধারণাতেই অহিকূল বিনষ্ট হয়ে বৃষ্টির প্রার্দুভাব ঘটে। অর্থাৎ সর্প সরাসরি শুভ লক্ষণের সাথে সংযুক্ত নয়। সর্প বরাবরই আদিম 'প্রাণী' বা 'কাল্ট' হিসেবে পরিচিত, তাই হতে পারে ইন্দ্রের মতো 'আর্য' দেবতা বা হারকিউলিসের মতো 'বীরের' অস্ত্রের আঘাতে সর্পের বিনাশ, কোন সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে।

এবার আসা যাক মিশরীয়দের কথায়। মিশরীয়দের মধ্যে Set অথবা Typhon সর্পের প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত।[23] মিশরীয়দের ধারণায় প্রাথমিকভাবে Seth সর্পে দংশিত মানুষের আরোগ্য সাধনের উদ্দেশ্যে পূজিত হলেও, পরবর্তী মিশরীয় ধারণায় Seth এর সঙ্গে Typhon যুক্ত হলে সেই আর্য ধারণারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এই প্রসঙ্গে সর্পকাল্টের দুই ক্ষমতার কথা অনুধাবন করা। এক, আরোগ্য প্রদানের ক্ষমতা এবং দুই, বৃষ্টি দখলের ক্ষমতা। অর্থাৎ সর্পকাল্টের অস্তিত্ব একাধারে ভয় ও ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। Fergusson বক্তব্যনুযায়ী, সর্প সর্বদাই সৌভাগ্যের প্রতীক।[24] Fergusson এর বক্তব্যের উদাহরণ হিসেবে উত্তর আমেরিকার মোচিক্যান সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এই সম্প্রদায়ের কাছে র্যাটেল  স্নেক সৌভাগ্যের প্রতীকচিহ্ন।[25] আবার ব্যাবিলনীয় ও হিব্রুদের কাছে সর্প হল দুর্ভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ।[26]  জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে আবার Uga-jin নামক এক

---

[22] *তদেব্।*

[23] *তদেব্।*

[24] *তদেব্,* ৩৭৬।

[25] V. Gulyaev, S. Ya. Serov and Balaji Mundkar, "On the Cult of the Serpent",*Current Anthropology,* Vol. 17, No. 4 (Dec., 1976): 742-744.

[26] C. Staniland Wake, "The Origin of Serpent-Worship", *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,* Vol. 2, (1873): 376.

ধরনের মানব মস্তক সংযুক্ত সর্পদেবতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যিনি জাপানের ‘secret god’ রূপে পরিচিত।[27] এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে যে, দেবতার প্রতীক যদি প্রত্যক্ষভাবে মঙ্গলদায়ক হোতো, তাহলে তার গোপন অধিষ্ঠানের প্রয়োজন পরত না। ইজরায়েলের ব্রোঞ্জের সর্পমূর্তি আবার যৌনতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।[28]

সর্পকাল্ট বা সর্প উপাসনার সার্বজনীন রূপকে আমরা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করতে পারি। সর্পকাল্টের অবস্থান সেখানে কখনো শুভ রূপে, আবার কখনো এর মধ্যে অশুভ চরিত্রের অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হল যে, সর্পমূর্তিকে ভারতীয় কল্পকাহিনীর মাধ্যমে কিভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে? এর সাথে অপর একটি প্রশ্নও উল্লেখযোগ্য যে, সর্পকাল্ট কিভাবে তার বৈশিষ্ট্যের পরিসর অতিক্রম করে আঞ্চলিক দেবী কাল্ট ‘মনসা’ রূপে বর্তমানে পূজিত হচ্ছেন? অর্থাৎ সর্পকাল্টের পরিসর কিভাবে নাগমূর্তি বা অহিমূর্তি থেকে মানবরূপী দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ‘নাগমূর্তি’ ও ‘নাগ পূজা’র আদিম ভারতীয় রূপকে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ভারতে নাগপূজার বিষয়টি বিতর্কিত। এর পিছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও বর্তমান। ভারতে নাগ আরাধনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নূপুর দাশগুপ্ত তার প্রবন্ধে সর্পের উৎপত্তির প্রাথমিক তত্ত্বকে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায়, প্রাক-মধ্যযুগের বৌদ্ধ তন্ত্রবাদের মধ্যেও সর্পদেবীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[29] পৌরাণিক দেবী মনসার সাথে বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলীর এক অভূতপূর্ব মিল রয়েছে।[30] আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন যে, বৌদ্ধধর্মের

---

[27] V. Gulyaev, S. Ya. Serov and Balaji Mundkar, “On the Cult of the Serpent”,*Current Anthropology,* Vol. 17, No. 4 (Dec., 1976): 742-744.

[28] W. G. Moorehead, “Universality of Serpent-Worship”, *The Old Testament Student*, Vol. 4, No. 5 (Jan., 1885): .208.

[29] Nupur Dasgupta, “Environs and Cults: Tracing the Roots of the Social-Psychological Paradigm of Folk Existence in Deltaic Lower Bengal”, *Journal of Anthropology and Archaeology*, Vol. 2, No. 1, (June, 2014): 147-167.

[30] Alice Getty, “Uga-jin: The Coiled-Serpent God with a Human Head”, *Artibus Asiae,* Vol. 8, No. 1 (1940): 36-48.

মধ্যেই সর্পদেবী জাঙ্গুলীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। Karen Randolp Joines এর মতে এই কাল্ট তান্ত্রিক 'Pancaraksa Cult' [31] এর অংশবিশেষ। প্রধানত সর্পদংশনের হাত থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দেবীর উত্থান ঘটে। সুকুমার সেন আবার মনে করেন, সর্পদেবীর উত্থান হয় প্রাচীন বৌদ্ধ কাল্ট 'মহা ময়ূরী'[32] থেকে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই নতুন দেবতার উত্থান হয়, এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ জাতকের[33] মধ্যে উল্লেখিত দেবতার তিব্বতীয় সংস্করণের সূত্র পাওয়া যায়। এরপর এই তিব্বতীয় কাল্টের ক্রমে বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে পদার্পণ ঘটে দেবী মনসার সাথে সংযুক্ত হয়ে। সেইসূত্রে  প্রাক-মধ্যযুগের পুরাণেও তাঁর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[34] মহাভারতে আবার তক্ষক নাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের উল্লেখ অনুযায়ী, রাজা জন্মজেয় তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কল্পে 'সর্প নিধন' যজ্ঞ করেন। ঋগবেদে সর্পপূজার উল্লেখ না থাকলেও সর্পঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়।[35] অর্থববেদ এবং মহাভারতের বিরাট পর্বেও নাগপ্রধান অথবা সর্পদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধগ্রন্থ 'কুল্লবগ্‌গ্‌গে'[36] থেকে শুরু করে কৃষ্ণের 'কালিয়াদমনের' নাগকাল্ট[37] অবধি সর্বত্রই সর্পের অস্তিত্ব বর্তমান। বিষ্ণুধর্মোত্তরে অনন্ত নাগের ও বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার সাঁচি, ভারহুত, মথুরা প্রমুখ প্রত্নস্থল থেকেও নাগনাগিনীর মূর্তি পাওয়া যায়।[38] এছাড়াও 'রাজমার্তণ্ড' গ্রন্থে (১০৪০-১০৬০), দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও নাগদেবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মনসা

---

[31] Karen Randolp Joines, "The Bronze Serpent in the Israelite Cult", *Journal of Biblical Literature*, Vol. 87, No. 3 (Sep., 1968): 246-248.

[32] Nupur Dasgupta, "Environs and Cults: Tracing the Roots of the Social-Psychological Paradigm of Folk Existence in Deltaic Lower Bengal", *Journal of Anthropology and Archaeology*, Vol. 2, No. 1, (June, 2014): 147-167.

[33] *তদেব্, ১৫২।*

[34] *তদেব্।*

[35] *তদেব্।*

[36] *তদেব্, ১৫৩।*

[37] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১১-২০।

[38] *তদেব্।*

মূলতঃ শিবের কন্যা এবং সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি জরৎকারু পত্নী ও আস্তিক জননী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তার অবস্থানকে অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে একটি পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

"জরৎকারুর্জগদেগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা।।
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরীতি চ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা।।"[39]

উল্লেখিত পঙ্‌ক্তিতে জরৎকারু পত্নী "মনসা" সিদ্ধযোগিনী। তিনি শৈব কাল্টের অন্তর্গত, এবং নাগরাজ বাসুকির ভগিনী হওয়ায় "নাগেশ্বরী" হিসাবে পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে লোকদেবী " মনসা"কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার মাধ্যমে সর্পকাল্টের স্বতন্ত্র চরিত্রকে অনুধাবন করা যায়। তবে, লক্ষ্য করার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেবীকে "বিষহরী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি " মানবী" স্বত্বাযুক্ত এমন একজন দেবী, যিনি " বিষ" বিশেষজ্ঞ। এর মাধ্যমে দেবীর লৌকিক সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুমান করা যায়। অতএব বলা যায়, " বিষহরী" হিসাবে পরিচিত দেবী মনসা তার " বিষ" হরণের বিদ্যার দ্বারা মানবকল্যাণ সাধন করেন। এরপর একই উক্তিতে মনসার "বিশ্বপূজিতা"র ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে, তার 'সর্পকাল্ট' থেকে 'সেক্টে' বিবর্তনের বিষয়কে আলোকপাত করা সহজসাধ্য হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মনসাকে "মহাজ্ঞান" বা "জ্ঞান" অথবা "বিদ্যার" সাথে সংযুক্ত করে সর্পের দেবীতে রূপায়িত করা হয়েছে। তিনি সর্পের রক্ষাকারী, সর্পমাতা, বিষের অধিকারী, কিন্তু 'সর্প' নয়। এখানেই উত্তর ভারতের নাগকাল্টের সাথে 'মনসা'কে পৃথক করা যায়। উত্তর ভারতে সর্প অনেকটা টোটেম স্বরূপ, মূলতঃ নাগ হিসেবে পরিচিত।

মহাভারতেও এই 'নাগ' কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে পূজিত হত। কারণ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'নাগ' মূলত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের

[39] পঞ্চানন-তর্করত্নেন (সম্পা.), *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্‌* (কলিকাতাঃ কলিকাতারাজাধান্যাম্‌, ১৮২৭ শকাব্দ), ১৬২।

বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতির লোককে বোঝায়। সর্পফণাকে উপাসনার জীবক হিসেবে ব্যবহার করার দরুণ, পরবর্তীকালে তারা নাগ জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[40] অর্থাৎ নাগপূজার মধ্যে প্রাচীনতম লৌকিক সত্তা বর্তমান। এই লৌকিক সত্তা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতের অন্তর্গত হয়ে 'অনন্ত নাগ' ও 'বাসুকি নাগের' ধারণায় অবতীর্ন হয়। এর ফলে সর্পের ধারণার সাথে যে ভীতির ধারণা যুক্ত ছিল তা ক্রমে দৈবত্ব লাভ করে। কিন্তু সর্প তখনও 'কাল্টস্বরূপ'। মনসামঙ্গল কাব্যের সময়কালে অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 'সর্পকাল্ট' তার লৌকিক সত্তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরফলে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংমিশ্রণে 'মনসার' দেবী রূপের উত্থান ঘটে। অতএব, বৈদিক শাস্ত্র, পুরাণ অথবা মহাকাব্যগুলিতে সর্প যেখানে প্রাণী, সেখানে বঙ্গীয় পুরাণে সর্পের 'মানবী' রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 'মানবী' রূপী দেবী মনসা 'শিবকন্যা', 'জরৎকারু পত্নী' এবং 'আস্তিক জননী'। তিনি পিতৃতান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের 'বর্ণবৈষম্য' ও 'লিঙ্গভিত্তিক অসমতা' এর বিরুদ্ধাচরণ করে নাগেশ্বরী হিসেবে পরিচিতি পায়। "অহিকূল" এইভাবে 'অশুভ', 'অমঙ্গল' ও 'ভয়ের' আবরণ ভেদ করে দেবীর বাহন হিসেবে 'শুভ বা মঙ্গলময়' ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়।

মনসা দেবীর নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনার পর আমাদের প্রয়োজন 'চণ্ডী' কাল্টের বিবৃতি প্রদান করা। মনসা কাল্টের বিশ্বব্যাপী রূপের পরিচয় পাওয়া গেলেও 'চণ্ডী' কাল্ট কি ভারতের নিজস্ব? অর্থাৎ এরও কি আন্তর্জাতিক রূপের অবস্থান রয়েছে? মানবসভ্যতার উন্মেষকাল থেকে মার্তৃকা উপাসনা সর্বত্র প্রচলিত। মানবজননী হিসাবে পরিচিত এই দেবী "মার্তৃকা" উপাসনার মাধ্যমে ধর্মীয় স্তরে মাতৃদেবীতে উপনীত হয়েছিলেন। আদিম সামাজিক ব্যবস্থায় মার্তৃকা দেবীগণের প্রাধান্য ছিল। 'চণ্ডী'

---

[40] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'মনসামঙ্গলঃ ভারতে সর্পপূজার উৎপত্তি-বাংলার মনসা-পূজা-মনসা-মঙ্গলকাব্য-মনসামঙ্গলের কবিগণ', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৯৭-২০০।

কাল্ট যেহেতু ‘ মাতৃমূর্তির’ ধারণার সাথে সম্পৃক্ত, তাই ‘ মাতৃমূর্তি’ সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজনীয়। Andrew Fleming এর বক্তব্য অনুযায়ী, ‘ মাদার গডেস্’ বা ‘ মাতৃমূর্তি’ একটি সার্বিক ধারণা।[41] সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি বা উৎপাদনশীল বিষয়ের সংযুক্তিকরণ এর মধ্যে ঘটেছে। মাতৃমূর্তি বলতে তাই ‘ ফার্টিলিটি কাল্ট’ বা ‘ সৃষ্টিশীল’ বা ‘ উৎপাদনশীল’ প্রতীককে বোঝায়। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, ‘ফার্টিলিটি কাল্ট’ এর ধারণা  উত্তরে ককেশাস পর্বত থেকে দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত।[42] তিনি আরও বলেন  যে, প্রাচীন ব্যাবিলন, সুমের, অক্কদ, এশিয়ামাইনর, ওশিরিয়া, ক্রিটস, গ্রীস, মিশর, ইরান প্রভৃতি দেশে মাতৃকাদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল।[43] Beatrica A. Brooks বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুসরণে ‘ফার্টিলিটি কাল্টের’ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ফার্টিলিটি কাল্ট বলতে সেখানে প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।[44] তার ধারণা অনুযায়ী, পাশ্চাত্য দেশগুলির বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অংশ এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানে প্রাপ্ত ‘ অনাবৃত’ নারীর প্রতীক মূলতঃ প্রজননের  বিষয়ভুক্ত।[45] এক্ষেত্রে তিনি মাতৃ কাল্টের বিভিন্ন রূপের উদাহরণ প্রদান করেছেন, যথাঃ আইসিস, ইনিনি, ইসতার ইত্যাদি। এইসব মাতৃ কাল্টগুলি প্রকৃতপক্ষে প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত।[46] শিবেন্দু মান্না ব্যাবিলন ও ওশিরিয়াতে প্রেম এবং উর্বরতার প্রতীক রূপে মঙ্গলময়ী মহাদেবী ইসতারের কথা বর্ণনা করেছেন।[47] তিনি মন্তব্য করেন, দেবী ইসতার ভারতীয় দেবী দুর্গারই সমরূপ।[48] এরপর তিনি ক্রিট ও গ্রীসে প্রাপ্ত

---

[41] Andrew Fleming, “The Myth of the Mother-Goddess”, *World Archaeology*, Vol. 1, No. 2, (Oct. 1969): 247-261.

[42] শিবেন্দু মান্না, ‘ভূমিকা’, *বাংলার লোকমাতাঃ দেবীচণ্ডী*, (নেদীয়াঃ নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নভেম্বর ২০০৭)।

[43] *তদেব্।*

[44] Beatrice A. Brooks, “Fertility Cult Functionaries in the Old Testament”, *Journal of Biblical Literature*, Vol. 60, No. 3 (Sep., 1941): 227.

[45] *তদেব্।*

[46] *তদেব্।*

[47] শিবেন্দু মান্না, ‘ভূমিকা’, *বাংলার লোকমাতাঃ দেবীচণ্ডী*, (নেদীয়াঃ নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নভেম্বর ২০০৭)।

[48] *তদেব্।*

'রুহি' নামক যে দেবীর উল্লেখ করেছেন, সেও যুদ্ধরত অবস্থায় অধিষ্ঠিত।[49] এশিয়া মাইনরের সিবিলি দেবী ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বায়গ্রা দেবীর বৈশিষ্ট্যও কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর সমতুল্য।[50]

মাতৃ কাল্টের বিশ্বরূপকে পর্যালোচনা করার পর প্রয়োজন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'মাতৃ কাল্টের' প্রকৃত রূপকে অনুসন্ধান করা। প্রধানত ' কাল্ট' থেকে ' দেবী' পর্যায়ে উন্নীতকরণের বিষয়কে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পৌরাণিক ব্যাখ্যা প্রদান করে, শক্তির ধারণা ও লৌকিক কাল্ট চণ্ডীর কিভাবে সহাবস্থান ঘটে সে বিষয়ে বর্ণনা করা প্রয়োজন। বিনয় ঘোষ তার গ্রন্থে মাতৃপূজার অস্থিত্ব এবং তার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, মাতা বসুন্ধরা কর্তৃক সমগ্র জীবজগতের সৃষ্টি।[51] অথর্ববেদকে ভিত্তি করে তিনি প্রধানত মাতৃমূর্তির বর্ণনা করেছেন, এবং মাতৃপূজা কিভাবে সকলশ্রেনীর মানুষের কাছে উল্লেখযোগ্য ধর্মবিশ্বাস হিসাবে পরিচিতি, সেই প্রসঙ্গেও বিবরণ দিয়েছেন। শুধুমাত্র তা নয়, নানাবিধ প্রত্যয় ও প্রতীকের মাধ্যমে মাতৃপূজা কিভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিচিত্ররূপে প্রচলিত, সেই সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ অবগত করেছেন। এছাড়া আদিম যুগ থেকে শুরু করে, "আদিশক্তি" রূপে মাতৃপূজার প্রচলন কিভাবে সমগ্র পৃথিবীতে আরম্ভ হয়েছিল সেই প্রসঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে তিনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আদিপ্রস্তর যুগে প্রাপ্ত বিভিন্ন নারীমূর্তির রঞ্জিত প্রজনন অঙ্গের নিদর্শনকে তিনি সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[52] অতএব বলা যায়, মাতৃদেবীর পূজা প্রধানত আদি ও অনন্ত। এছাড়াও তার মন্তব্য অনুযায়ী, "মাতৃদেবী" পূজার পরেই পুরুষ দেবতার পূজার প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরে। গ্রন্থাকারের মতে, কৃষি সমাজের উদ্ভবের পর প্রধানত পিতৃতন্ত্রের উত্থান ঘটে এবং "পুরুষ" দেবতা রূপে পূজিত হতে

---

49 *তদেব্।*

50 *তদেব্।*

51 বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* চতুর্থ খণ্ড, (কেলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৮৬), ১-১০।

52 *তদেব্।*

শুরু করে। প্রধানত প্রত্নতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ববিদ্ E.O.James এর তত্ত্ব অনুসরণ করে তিনি তার মতামত প্রদান করেছেন। তিনি একাধারে যেমন মাতৃদেবীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন আবার আবার যোনিসহ শিবমূর্তির কথাও স্বীকার করেছেন।[53]

বিনয় ঘোষ ছাড়া John Marshall, Mortimer Wheeler প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরাও মাতৃদেবীর প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন। হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি অসম চতুষ্কোণ পোড়ামাটির শিলের উপরিভাগে প্রসারিত পদদ্বয় এক নগ্ন স্ত্রীমূর্তি দেখানো হয়েছে, যার যোনিদেশ থেকে শস্য পল্লব নির্গমনশীল; এর আকৃতি মহেঞ্জোদারোর আদি শিবের ন্যায়।[54] Marshall স্ত্রীমূর্তিটিকে দেবীমূর্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।[55] তবে, তিনি লিঙ্গমূর্তিরূপী শিবমূর্তির কথাও অস্বীকার করেন নি। পুরাণ গ্রন্থগুলি রচনার বহু পূর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে মাতৃকা দেবীর পূজার প্রচলন ছিল, সেকথা Sir John Marshall, Ernst Mach, প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের প্রতিবেদন থেকে অনুধাবন করা যায়।

মাতৃদেবীর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পর প্রয়োজন পুরাণে ‘মাতৃ’ কাল্টের অবস্থানকে চিহ্নিত করে, চণ্ডীর অবস্থানকে আলোকপাত করা। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং পুরাণ গ্রন্থগুলিতে ‘শক্তি’ কাল্টের সাথে মাতৃ কাল্টের ধারণা সংযুক্ত হয়। এখানে শক্তি মূলতঃ নারীবাদী সত্তা[56], যিনি একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। বায়ু পুরাণ অনুযায়ী ‘শিব’ পুরুষ ও নারী এই দুই বৈশিষ্ট্যে বিভাজিত।[57] শিবের নারী সত্তা আবার ‘ শ্বেতা’ (সাদা) ও ‘ অশ্বেতা’ ( কালো) এই দুই ভাগে বিভক্ত।[58] শক্তি কাল্টের অশ্বেতা অংশে কালী, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা, এবং ভৈরবীর অবস্থান রয়েছে।[59] আবার শ্বেতা অংশে উমা, সতী,

---

[53] *তদেব্।*

[54] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপসনা,* (কলিকাতাঃ প্রকাশনা সংস্থার নাম অনুপস্থিত, ১৯৬০), ২২০।

[55] John Marshall (ed.), *Mohenjo-Daro and the Indus Civilization*, Vol. 1, (London: Arthur Probsthain, 1931), 60-62.

[56] .JUNE McDANIEL, *Offering Flowers, Feeding Skulls: Popular Goddess Worship in West Bengal*, (New York: Oxford University Press, 2004), 4-10.

[57] *তদেব্।*

[58] *তদেব্।*

[59] *তদেব্।*

গৌরী, পার্বতী, মহেশ্বরী, ললিতা এবং অন্নপূর্ণা অবস্থিত।[60] আর 'শক্তি' কাল্টের শান্ত ও অশান্ত দুটি বিষয় সম্মিলিত হয়ে 'মাতৃ' কাল্টের প্রকৃত রূপের উত্থান ঘটে।

চণ্ডীর স্থান মূলতঃ শক্তি কাল্টের অশ্বেতা অংশে অবস্থিত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বৈদিক সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়না।[61] তার মতে, চণ্ডী শব্দটি একটি অর্বাচীন শব্দ, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে যুক্ত হয়। এই শব্দটি মূলতঃ অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত।[62] চণ্ডীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি স্ত্রীদেবী হলেও, তার মধ্যে পুরুষালি সত্তা বর্তমান। এই দেবী প্রধাণত ওরাওঁ উপজাতির শক্তিদেবী 'চাণ্ডী'র রূপ।[63] মধ্যযুগীয় কয়েকটি সংস্কৃত উপপুরাণ, যথাঃ ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবীভাগবত, মার্কেণ্ডেয়, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এবং তান্ত্রিক গ্রন্থগুলিতে চণ্ডী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[64] প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা এখানে ব্যক্ত করা প্রয়োজনীয়।

"ততোহহংমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টে প্রাণধারকৈঃ।।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যস্যামহং ভুবি।"[65]

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মাতৃকা দেবীরূপে চণ্ডীর উল্লেখ তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাওয়া গেলেও, 'শাকম্ভরী' দেবীর উপাসনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুপ্রাচীন কালের সাক্ষ্যে ও ঐতিহ্যে। প্রধানত আর্যেতর সমাজ থেকে চণ্ডী কাল্ট পৌরাণিক সাহিত্যে উত্তরিত

---

60 *তদেব্।*

61 আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস-চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৩৪৬।

62 *তদেব্।*

63 *তদেব্।*

64 *তদেব্।*

65 পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা), *মার্কণ্ডেয় পুরাণ,* (কলিকাতাঃ প্রকাশনার সংস্থার নাম অনুপস্থিত, ১৩৯০), ৯১ (৪৮-৪৯)।

হয়ে ক্রমে দেবীতে পরিণত হয়েছে। কারণ অনার্য দেবী চণ্ডী পৌরাণিক ধারণার সান্নিধ্য লাভ করেই দেবীত্ব লাভ করে। তার পরেও মঙ্গলকাব্যে চণ্ডী কখনো শক্তিস্বরূপা, আবার কখনো মহামায়া। তবে, মহামায়ার সৃষ্টিশীল অংশ 'পার্বতী' ও ধ্বংসশীল অংশ 'চণ্ডী' নামে উল্লেখিত। অতএব, কাল্ট থেকে সেক্টে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'চণ্ডী'র যাত্রা তখনই সফলতা লাভ করে, যখন তা ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরাণিক ধারণার অন্তর্গত হয়।

## ১.২ 'মনসামঙ্গল' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র অবস্থান

মনসা ও চণ্ডীর নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনার পর সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যে তাদের অবস্থানকে চিহ্নিত করা আবশ্যক। মঙ্গলকাব্যে মনসা ও চণ্ডীর প্রতিফলন মূলত দ্বান্দ্বিক চরিত্র হিসাবে। সেখানে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র দেবীসত্তার থেকে নারীসত্তার প্রকাশই অনেক বেশী। আর দুজনেরই সূত্র শিবের সাথে যুক্ত। শিবের একদিকে তার পত্নী চণ্ডী ও অন্যদিকে তার জারজ সন্তান মনসা। অতএব, শিবকে ঘিরে মনসা ও তার বিমাতার মধ্যে দ্বন্দ্বও বর্তমান। কিন্তু বিবাদের বাস্তবিক কারণকে অনুসন্ধান করতে হলে, মনসার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে মনসার উত্থানকেও মঙ্গলকাব্যের নিরিখে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। মনসার জন্মবৃত্তান্তকে প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে সামাজিক অন্তরাল সৃষ্টি করেছে সেই সম্পর্কেও আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতাদের আলোচনায় আধ্যাত্মিকতার আধিক্য থাকলেও, কাব্যের বেশিরভাগ অংশে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি বা জেণ্ডার পলিটিকস্ এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্য অনুযায়ী, দেবী মনসা ত্রিজগতের দেবতা অথবা ভগবান শিবের পুত্রী। একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্যঃ

"উরগো মনসা মাতা : ত্রিজগতধাত্রী ধাতা : যোগ-জাপ্য যোগীর নন্দিনী।

উৎপত্তি পাতালপুরী : বিশ্বমাতা বিষহরি : সূক্ষ্ম শুক্ল নির্ম্মল ধারিণী।।"[66]

মনসা যে 'শিবকন্যা', উপরিউক্ত উক্তিতে তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখিত উক্তি অনুযায়ী মনসার উদ্ভব পাতাল থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'পাতাল' বা পাতালপুরী সংকীর্ণ অর্থে পরিগণিত। তবে, বর্তমান সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ধারায় যেভাবে 'পাতাল'কে বিশ্লেষণ করা হয়, তা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, 'পাতালবাসী' হল সমাজের নিচুতলার মানুষ। আর দেবী মনসা হলেন সমাজের সেই অংশের দেবী। এমনকি জন্মলগ্ন থেকে তিনি পাতালে অবস্থান করার উল্লেখ থাকায়, তিনি নিজেও 'নিম্নবর্ণীয়'। অতএব, মনসার জন্মবৃত্তান্তে প্রথমে জাতিভিত্তিক ব্যবধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর কাব্যের প্রায় প্রত্যেক সংস্করণে তার মাতার অনুপস্থিতি এই বিষয়কে আরও সন্দেহাতীত করে তোলে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের আনুমানিক ১৬৩৮-১৬৪০ খৃষ্টাব্দের[67] মধ্যে রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সর্পদেবী 'পদ্মাবলি'র জন্মের বিবরণ পাওয়া যায়। কেতকাদাসের বর্ণনা অনুযায়ী, দেবী ভগবতী একদা পাটনির ছদ্মবেশে মহেশ্বরকে বিমোহিত করেন। কামাবেগে আপ্লুত মহেশ্বর দেবী মহামায়ার ছদ্মবেশ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ায়, 'ছদ্মবেশী' পাটনির সাথে যৌন সংসর্গে উদ্যত হয়। দেবী ভগবতীও মহেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতায় রুষ্ট হয়ে অন্তর্হিত হন। এইরকম করুন পরিস্থিতিতে মহাদেব চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রণয় দৃশ্যে পুনরায় বিচলিত হয়ে কামাবেগে অচেতন হয়ে পড়েন। আর পাণিমৈথুনের দ্বারা তার বীর্য্য পদ্মপাতার নাল বেয়ে বাসুকির কোলে গিয়ে পড়ে। নাগরাজ বাসুকির সম্পর্কে এর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর ভারতে তিনি 'নাগরাজ' বা 'king of the serpents'[68] হিসাবে বিশেষ পরিচিত। মনসামঙ্গল কাব্য অনুযায়ী বাসুকি তাম্র খোলে শিবের বীর্য্যকে সংরক্ষণ করে বিধাতাকে

[66] Ketakadasa Ksemananda, *Kavya*, Sanskrit, Script: Bengali, Incomplete, Handmade paper, 36X12cm, Folio/page: 1, Government Collection (G: 3531).

[67] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল*, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.),(কেলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৪।

[68] Asutosh Bhattacharyya, "The Serpent as a Folk-Deity in Bengal", *Asian Folklore Studies*, Vol. 24, No. 1 (1965): 1-10.

তার থেকে নবজীবন নির্ম্মাণের অনুরোধ জানান। বিধাতারও স্বরূপ এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করা প্রয়োজন। শিবপুরাণ অনুযায়ী ‘ বিধাতা’ বলতে ‘ ব্রহ্মা’কেই বোঝায়। তিনি মহেশ্বরের বীর্য্য থেকে নির্ম্মাণ করলেন ‘পদ্মাবলিকে’। এই প্রসঙ্গে কাব্যের অংশটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয়।

“ কামে গদগদ অঙ্গ দেব শূলপাণি। শিবে ছলি অন্তর্দ্ধান হইল ভবানী।।
.........চক্রবাক সঙ্গ যায় চক্রবাকী-সনে। মকরন্দ পিএ অলি কমলের বনে।।
ঘন ঘন পিএ মধু, ঘন যায় সঙ্গ। কামরসে মহেশের পুলকিত অঙ্গ।।
টলিয়া হরের বীর্য্য পড়ে পদ্মপাতে। জয় জয় পুষ্পবৃষ্টি হৈল ত্রিজগতে।।
হর হারাইল বীর্য্য পদ্মপাতে থুয়্যা। পাতাল-ভুবনে গেল পদ্মনাল বায়্যা।।
গড়িয়া পড়িল বীর্য্য বাসুকির কোলে। যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল তাম্র-খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান। বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নির্ম্মাণ।।
পাইয়া হরের বীর্য্য বিধি বিচক্ষণ। যতনে নির্ম্মাণ কৈল জগজন।।
.........পাতালে হইল জন্ম, নাম পদ্মাবলি। ভূষণে বাসুকি ছিল যৌতুকমণ্ডলী।।”[69]

ক্ষেমানন্দ কর্তৃক গৃহীত মনসার জন্মের বিবরণ অনুযায়ী সেখানে পিতা হিসেবে মহেশ্বরের উল্লেখ থাকলেও, মাতার অবস্থান অনুপস্থিত। কেতকাদাসের রচনা থেকে আবার বাসুকি নাগের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। সে ‘ মহাপুরুষের’ বীর্য্যকে সংরক্ষণ করে বিধাতা কর্তৃক পদ্মাবলিকে নির্ম্মাণ করে। সুতরাং প্রকৃতি এবং শিবের বীর্য্যের সংযোগেই অলৌকিক উপায়ে দেবী মনসার উত্থান ঘটে। পৌরাণিক গাথা থেকে শুরু প্রায় সর্বত্রই ‘প্রকৃতি ও পুরুষ’ এই দুইভাগেই সৃষ্টি বিভাজিত। অতএব, প্রকৃতির অছিলায় নারীর অস্তিত্ব যে এখানে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রতিস্থাপিত, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতিকে আড়াল করে যদি ‘মনসা ও চণ্ডী’র দ্বন্দ্বের দিকে আলোকপাত করা যায়, তাহলে এই দুই নারীর দ্বন্দ্বের পিছনে শিবের অবস্থানকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। চণ্ডীর মনসার প্রতি রোষ মূলত শিবের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফলন। প্রথমত, শিবের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জারজ

[69] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৫-১৬।

সন্তান হিসাবে মনসা ভূমিষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, মনসার আবির্ভাব পরিবারে তার মূল্যকে নিশ্চিহ্ন করে তুলবে সে বিষয়ে তার প্রবল ভীতি। অতএব, ভয় ও বেদনা উভয় কারণেই মনসা চণ্ডীর আক্রোশের শিকার। এই আক্রোশের বহিঃপ্রকাশে চণ্ডী মনসার চক্ষু বিনষ্ট করে। প্রতিশোধে মনসাও চণ্ডীর প্রাণহরণ করে। উল্লেখিত বিষয়টির নেপথ্যে উক্তি প্রদান করলে এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

"বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে
লুকাইয়া রাখে আজি পুষ্পের ভিতরে।
শুনিয়া মনসা কোপে হৈল হুতাশন।
আপনা খাইয়া মোরে বল কুবচন।
আপন প্রকৃতি জেন দেখসি আমায়
হেন অসম্ভব কথা প্রস্তাবে কোথায়।
মহাকোপে চণ্ডিকা লইল কুশাবাণ
তার ঘায়ে মনসার চক্ষু হৈল কাণ।
হৃদয়ে যন্ত্রণা বড় পাইল প্রবল
বিষদৃষ্টে চাহে পদ্মা উঠিল আনল।
বিষদৃষ্টে বিষ বর্ষে চণ্ডীর উপর
ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী উত্তর-শিয়র।"[70]

মনসা শিবের জারজ কন্যা কিনা, চণ্ডী সেই সম্পর্কে সন্দিহান। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চণ্ডী কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষায় শিব পরাস্ত হয়েছে। সুন্দরী রমণী মনসা নিজেকে তাই শিবের কন্যা হিসাবে পরিচয় দিলেও, চণ্ডী কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার কন্যা যদি হয়ে থাকে, তাহলেও মনসা চণ্ডীর গর্ভজাত সন্তান নয়। অতএব, মনসা অবশ্যই শিবের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সে মনসার চক্ষু বিনষ্ট করে। চক্ষু বিনষ্টের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে মনসার সৌন্দর্যকে নষ্ট করার ধারণাকেও অগ্রাহ্য করা যায়না। প্রধানত মনসা যদি শিবের কন্যা না হয়, তাহলে শিব অসুন্দর

[70] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসাবিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশনার সময়কাল অনুপস্থিত), ৯-১৬।

মনসার দিকে আর ফিরেও তাকাবে না। অপরদিকে কাব্য অনুযায়ী মনসা প্রথম থেকেই মাতৃ ও পিতৃহীনা, বিশেষতঃ পরিত্যক্তা। অতএব, বিমাতা তার উদ্দেশ্যে কুবচন প্রদান করে তাকে প্রহার করলে, সে অনুভব করে পরিবারে তাকে সংগ্রাম করেই থাকতে হবে। মনসা প্রতিশোধ স্পৃহায় চণ্ডীকে তাই বিষপ্রয়োগ করে। পিতৃতান্ত্রিক কাব্যের রচয়িতারা মঙ্গলকাব্যের এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবারে নারীদের দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। মনসা ও চণ্ডীর দ্বন্দ্বের প্রতিফলন 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আরও বেশ কিছু অংশে দেখা যায়। এর মাধ্যমে শিবকে কেন্দ্র করে মনসা ও চণ্ডীর 'ত্রিকোণ সম্পর্ক'কে অনুধাবন করা যায়। এই সম্পর্কের দরুণ মনসাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মনসা ও চণ্ডীর পারস্পরিক আক্রোশ এতটাই প্রখর যে, সমুদ্র মন্থনে শিবের মৃত্যুকালীন পরিস্থিতিতেও এই বিরোধ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েনি। শিবকে বাঁচানোর পূর্বে মনসা তার বিমাতার কাছ থেকে বস্ত্র দাবী করে, যা অপ্রয়োজনীয় ছিল। কেবলমাত্র বিমাতার অহংকার বিচূর্ণ করার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চণ্ডী নিজ সংকট মুহুর্তেও শত্রুতা মনে রেখে মনসাকে খারাপ বস্ত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে উক্তি প্রদান করলে বিষয়টি স্বচ্ছ হবে।

"পদ্মা বলে এইরূপে বঞ্চি বন দূরে
বস্ত্রহীন কেমনে জাইব দেবপুরে।
একখানি বস্ত্র লৈয়া আইসেন সতাই
তবে বাপু জিয়াইতে আমি তথা যাই।............
শুনি চণ্ডী শীঘ্র গেলা আপনার ঘরে
ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে।
হাত পাঁচ কাচা-খানি কাঁকতলে থুয়া
চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া।"[71]

'শিব', 'চণ্ডী' ও 'মনসা' উভয়ের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের মৃত্যুকালীন পরিস্থিতিতেও দুই নারীর কাছে 'একটুকরো বস্ত্র' বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ শিব উভয় নারীর

[71] *তদেব্, ৩৪।*

সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের আক্রোশ একসময় শিবের প্রয়োজনের উর্দ্ধে চলে গেছে। এমনকি মনসার বিবাহের সময়ও চণ্ডীর ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

"জরৎকার-মুনিরে বুঝায় মাহেশ্বরী।
নাগ-রূপী কন্যা এই নাগ-অবতার
মনিরত্ন এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার।
আজি নিশি নাগভয় থাকিহ সত্বরে
ওথায় কুবুদ্ধি দিল মনসার তরে"।[72]

চণ্ডী জরৎকারু মুণিকে প্রথম থেকে নাগভয় দেখিয়ে, মনসাকে সর্পসজ্জা করতে বলেন। এর ফলপ্রসূ মনসা পতি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। মনসামঙ্গলের কাব্যকাররা 'মনসা'কে সর্বদাই নিপীড়িত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ যার বিপরীতে। তার সংগ্রাম তাই সর্বক্ষেত্রেই।

মনসামঙ্গলের মতো চণ্ডীমঙ্গলেও কি 'মনসা ও চণ্ডীর' বিবাদের ব্যাখ্যা রয়েছে? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর সংগ্রামের প্রেক্ষাপট মনসার থেকে অনেকাংশে আলাদা। কাব্যে মূলতঃ শিব ও সতীর বিবাহ থেকে শুরু করে চণ্ডীর প্রথমে কালকেতু-ফুল্লরা ও পরে ধনপতি-খুল্লনা কর্তৃক পূজা প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা রয়েছে।[73] চণ্ডী বন্দনায় 'আদিদেবী'র বহু নাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বন্দিত হয়েছে। বিভিন্ন রূপ ও নাম ধারণ করে দেবী যে সকলকে রক্ষা করে চলেছেন, এই বার্তা যেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তার পুঁথিতে প্রধানত যে নামগুলির প্রকাশ ঘটে সেগুলি হল- 'নারায়ণী', 'কামদাত্রী কাত্যায়ণী', 'সুবিদ্যাধরী', 'বারাণসী' প্রমুখ। 'চণ্ডীবন্দনা' অনুয়ায়ী তিনি 'হিমালয় কন্যা' এবং 'মেনকা'র গর্ভজাত। মুকুন্দরামের বর্ণনায় আবার দেবীর অপর এক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়।

---

[72] *তদেব, ৪৩।*

[73] মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম ভাগ, (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ১৯৫২)।

একদিকে তিনি ‘মাতা’, অপরদিকে তিনি ‘যোদ্ধা’। কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করলে এই বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব হবে।

“পট্টারম্ভ পরিধানা মাইয়াতি ভীষণ শেনা
ঈষান গৃহিণী গুহমাতা.........
অসুরের বক্ষঃস্থলে ষাট বেহানন শূলে
করে ধরি কুন্তল বন্ধনে।”[74]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে, মুকুন্দরামের কাব্যে দেবী ‘মাতা’ ও ‘যোদ্ধা’ উভয়ের সম্মিলিত রূপ হিসাবে বর্ণিত। তিনি একদিকে যেমন মাতার কর্তব্য পালন করছেন, অপরদিকে তিনি প্রয়োজনে অসুর বধ ও করছেন। তার সংগ্রাম কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে পূজা প্রতিষ্ঠার। আক্ষরিক অর্থে ততোটা সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়না। কারণ সমাজে প্রথম থেকেই তার নিজস্ব পরিচিতি রয়েছে। সে শিবের স্ত্রী, শক্তিস্বরূপা। এছাড়া সম্পূর্ণ কাব্যে কোন গৃহযুদ্ধেরও ইঙ্গিত নেই। এককথায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পূর্ণভাবেই চণ্ডীর মহিমা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে আলোচিত। ধনপতির সিংহলযাত্রার সময়ে ‘মনসা’ বা ‘পদ্মা’ অনেকক্ষেত্রে চণ্ডীর মূলঃ পরামর্শদাতা হিসবে চিহ্নিত হয়েছে। অনেকসময় ধনপতির ঔদ্ধত্যে পদ্মা তার নাগবাহিনীকে সঞ্চার করেছে ধনপতির উদ্দেশ্যে, আবার কখনো বা চণ্ডীর পূজা প্রতিষ্ঠায় তাকে কোনোরকম ঘাতক পদক্ষেপ না নেওয়ার উপদেশও দিয়েছেন।[75] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতারা মনসামঙ্গলের কাব্যকারদের মতো ‘চণ্ডী’কে প্রোটাগনিস্ট হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি দেবী, আর সর্বক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। এছাড়া চণ্ডীমঙ্গলের রচনা মনসামঙ্গলের অনেক পরে। এমনও হতে পারে কাব্যকারেরা উভয়ের দ্বন্দ্বের প্রচার না ঘটিয়ে মহিমা প্রচারে অনেক বেশী আগ্রহী হয়েছেন।

---

[74] *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বসু (সম্পা.), প্রথম ভাগ, (কলিকাতাঃ সিনেট হাউস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪), ১-৩৫০।

[75] রামকুমার মুখোপাধ্যায়, *ধনপতির সিংহলযাত্রা,* (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৭), ৪৭-৫৫।

## ১.৩ দেবীমাহাত্ম্যঃ লৌকিক ও আঞ্চলিক রূপ

গ্রামবাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবী হলেন 'মনসা' ও 'চণ্ডী'। আঞ্চলিক পরিসরের নিরিখে উভয় দেবী বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবী সত্তার সাথে সংযুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল, মনসা ও চণ্ডীর বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবীসত্তাগুলিকে কি পৌরাণিক দেবীমাহাত্ম্যের ধারণার অন্তর্গত করা যায়?, এবং এই প্রক্রিয়া কি উপায়ে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে 'দেবীমাহাত্ম্য' বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত 'মহামায়া' বা 'গ্রেট ইলিউশন'[76] একটি সার্বিক ধারণা। সকল দেবীর 'মাহাত্ম্য' এর মধ্যে সম্পৃক্ত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রাজা সুরথ ঋষি মার্কণ্ডেয়কে 'মহামায়া'র প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করার কথা বলেন। ঋষির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মহামায়ার বাহ্যিক রূপের বহিঃপ্রকাশ যেমন হোক, আভ্যন্তরীণভাবে জাগতিক সকল বিষয় তার অন্তর্গত হয়।[77] তিনি একদিকে যেমন বৃহৎ জ্ঞানের আধার, অন্যদিকে তেমন ভয়ঙ্কর একটি ধাঁধা।[78]

তিনি আবার সৃষ্টি ও ধংসের সম্মিলিত রূপ।[79] ঋষি মার্কণ্ডেয় 'মহামায়া'র রূপকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেন, যার মাধ্যমে জীবজগতের সুখ-দুঃখ, ভয়-ভক্তি, মঙ্গল-অমঙ্গল, অর্থাৎ সব পার্থিব বিষয় "দেবীমাহাত্ম্যের" ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক দেবীরা 'দেবীমাহাত্ম্যের' অন্তর্গত হয়ে কিভাবে 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'এর মূলস্রোতের সাথে সম্মিলিত হয়, তা বর্তমান আলোচনার বিষয়। কুনাল চক্রবর্তী আবার বিভিন্ন লৌকিক এবং বৈদিক মাতৃমূর্তির সংমিশ্রণের প্রসঙ্গে স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের ওপর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[80] 'দেবীমাহাত্ম্যে'র অন্তরালে উপজাতীয় দেবীরা কিভাবে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়েছেন, সেই সম্পর্কেও তিনি

---

[76] F. Eden Pargiter(Trns.), *The Markandeya Purana*, (Calcutta: The Asiatic Society, 1904)., 465-471.

[77] তদেব্।

[78] তদেব্।

[79] তদেব্।

[80] Kunal Chakrabarti, 'Appropriation as a Historical Process: The Cult of the Goddess', *Religious Process: The Puranas and the Making of a Regional Tradition*, (Delhi: Oxford University Press, 2001), 165.

মতামত প্রকাশ করেছেন।[81] ‘দেবীমাহাত্ম্যে’র বিষয়টি  কুমকুম চ্যাটার্জীর আলোচনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, কালী প্রভৃতি অবৈদিক দেবীরূপগুলির ‘দেবীমাহাত্ম্যে’র মাধ্যমে সংমিশ্রিত হয়ে কিভাবে ‘দুর্গা’, ‘মহামায়া’ প্রমুখের আকার ধারন করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[82]

বাংলার ক্ষেত্রে আবার বৈদিক ও অবৈদিক দেবদেবীর সংমিশ্রণ ঘটে জটিল প্রক্রিয়ায়। কারণ বাংলায় একাধিক লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য থাকায় উড়িষ্যার মতো এখানে কোন নির্দিষ্ট কাল্ট গড়ে ওঠেনি। কুনাল চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, বাংলায় বৈদিক ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক পরে শুরু হলেও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মাতৃপূজার অস্থিত্বকে বজায় রেখেছিল, এবং শাক্ত তত্ত্বের মাধ্যমে তাকে নতুন উপায়ে সম্প্রসারণও করেছিল।[83] ‘মহামায়া’ যেহেতু শক্তির প্রতীক, তাই বাংলার আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যে লৌকিক দেবদেবীর উত্থান ঘটে, তা ব্রাহ্মণ্য পরিচিতির সংমিশ্রণে ‘মা’ বা ‘মাতা’ এর ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে দেবীমাহাত্ম্যের সাথে সংযুক্ত হয়।

মনসা ও চণ্ডীর আঞ্চলিক সত্তা কিভাবে দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, তা অনুধাবনের পূর্বে আমাদের প্রয়োজন মনসা ও চণ্ডীর আঞ্চলিক রূপের ব্যাখ্যা প্রদান করা। সর্বপ্রথম বিভিন্ন স্থানভেদে মনসা ভয়ংকর রূপের আঞ্চলিক ব্যাখ্যা প্রদান করে, কিভাবে সে ‘মায়া’ বা ‘মাহাত্ম্যের’ ধারণার সাথে সম্মিলিত হয়, এর বর্ণনা করা অপরিহার্য। ‘মনসার’ প্রধান পরিচয় তিনি ‘সর্পদেবী’ অথবা ‘বিষহরী’। তার ব্রতকথায় তিনি উল্লেখিত হয়েছেন ‘সর্প্রাজ্ঞী’ এবং ‘ধনদেবী’ হিসাবে।[84] মনসা পূজার উৎসে যদিও আদিমতম সংস্করণ ‘সর্পপূজা’র অস্তিত্ব রয়েছে, তথাপি বাঙালীর লৌকিক জীবনে মনসার

---

[81] *তদেব্।*

[82] Kumkum Chatterjee, “Goddess encounters: Mughals, Monsters and the Goddess in Bengal”, *Modern Asian Studies*, Cambridge University Press, (March 12. 2013): 1-53.

[83] Kunal, Chakrabarti, ‘Appropriation as a Historical Process: The Cult of the Goddess’, *Religious Process: The Puranas and the Making of a Regional Tradition*, (Delhi: Oxford University Press, 2001), 165-233

[84] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘মনসা’, *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২), ২০৯-২৩৪।

প্রধান পরিচয় তিনি সাপের দেবী 'বিষহরী'। মনসার 'দৈবীসত্তার' পরিকল্পনায় মাতৃকাপূজার ঘনিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'মাতৃকাপূজার' ধারা প্রকৃতপক্ষে 'উর্বরতা বা উৎপাদন' অথবা সন্তানলাভের ধারণার সাথে সংযুক্ত। 'সাপ', 'বৃক্ষ', 'ঘট', 'সাপচিহ্নিত ঘট' প্রধানত তাঁর সাক্ষ্য বহন করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, শোলা দিয়ে এক বিশেষ আকৃতিতে নির্মিত মনসামূর্তির পূজা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। তাঁর লৌকিক নাম 'করোণ্ডি', যার অর্থ 'জোনি'।[85] সাধারণত নারীর 'যৌনাঙ্গের' ইঙ্গিত এর মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। মনসার সাথে আবার শিশুবিষয়ক ধারণাও সম্পর্কযুক্ত। মনসা 'শিশুমারক' এবং আবার তিনিই মৃতশিশুদের জীবনদাত্রী। সুতরাং, মনসা পূজার মধ্যে উর্বরতন্ত্রের যথাযথ প্রভাব বর্তমান। মনসা উপাসনার মধ্যে কুলপ্রতীক বা টোটেম ভাবনারও ইঙ্গিত পরবর্তীকালে দেখা যায়। নিম্নবর্নের দেবী হিসেবে তার যাত্রা শুরু হলেও, ক্রমাগত কুলদেবী হিসেবে মনসার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

'মনসা'ই বিষহরী দেবীর প্রকৃত নাম।[86] মিহির চৌধুরী কামিল্যা তার গ্রন্থে স্থানভেদে মনসার নামের বৈচিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে, মনসার প্রিয় নামগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'পদ্মা', 'পদ্মাবতী', 'জগৎগৌরী', 'বিষহরি'।[87] তার মন্তব্য অনুযায়ী, রাঢ় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই মনসাকে 'কেতকা', 'কমলা', 'কালীবুড়ি', 'নাগেশ্বরী' ও 'নাগমাতা' বলা হয়।[88] তিনি স্থানভেদে মনসার নামের যে বৈচিত্রের কথা আলোচনা করেছেন, নিম্নলিখিতভাবে সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হল। বাঁকুড়ায় দেবী মনসা বিভিন্ন স্থানে যেমন 'বেলকুমারী', 'বেলমাই', 'ভগীবুড়ি', 'আলগাবারি' প্রভৃতি

---

[85] Asutosh, Bhattacharyya, "The Serpent as a Folk-Deity in Bengal", *Asian Folklore Studies,* Vol. 24, No. 1 (1965): 1-10

[86] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, 'মনসা', *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২), ২১০।

[87] *তদেব।*

[88] *তদেব।*

নামে পরিচিত, তেমনি আবার বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় সর্পদেবী মনসার নাম 'কালী', 'ভগবতী'[89] প্রভৃতি। এর মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে যে, সর্পদেবী মনসা একাধারে স্থান পেতে শুরু করেছেন উচ্চবর্নের দেবীদের সঙ্গে। এমনকি তাঁকে উচ্চবর্নের দেবীদের সমতুল্য হিসেবে পূজাও করা হচ্ছে। বীরভূমের স্থানে স্থানে সর্পদেবী আবার 'হংসবাহিনী', 'শিবানী', 'বগা', 'বসন্তকুমারী', 'দিদিঠাকুরন', 'দুলমা', 'চিন্তামণি', 'জরুৎকারু মা', 'জলডুবুরি', 'পাতালে মা' (জামথলি গ্রাম), গোয়ালবুড়ি (রাজনগর তাঁতিপাড়া), 'সাঁওতালি' (রাজনগর)।[90] মনসার 'হংসবাহিনী' নাম থেকে তাঁকে দেবী সরস্বতীর অপর রূপ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে। আবার 'শিবানী', 'বগা' প্রভৃতি নামগুলি প্রধানত দেবী মনসাকে আদি দেবী দুর্গার সঙ্গে যুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাঁকুড়ার এইসব অঞ্চলগুলিতে জনগণ সর্পদেবী মনসাকে মর্যাদার সঙ্গে পূজা করেন। আবার 'দিদিঠাকুরন', 'জরুৎকারু মা' প্রভৃতি নামগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা তাঁকে কখনো 'দিদি' ও 'মা' হিসাবে পূজা করেন। তবে, জামথলি গ্রামের মনসার 'পাতালে মা', রাজনগর তাঁতিপাড়ার 'গোয়ালাবুড়ি', রাজনগরের 'সাঁওতালি' নামগুলি থেকে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। পাতালবাসিনী দেবী মনসার উল্লেখিত নামগুলি প্রধানত সমাজের এক নির্দিষ্ট শ্রেনীকেই চিহ্নিত করছে, যা প্রধানত 'নিম্নবর্ণ হিন্দু', তপশিলী ও উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু সামাজিক সংমিশ্রণের কারণে মনসার নাম কালী, ভগবতী, শিবানী ও বগা নামের সাথেও যুক্ত হয়েছে। মূলতঃ দেবীমাহাত্ম্যের ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্রের সাথে মনসার লৌকিক ধারণা যুক্ত হয়।

[89] *তদেব্।*

[90] *তদেব্।*

বর্ধমানে তাঁর লৌকিক নাম ‘ বিমলা’, ‘ ঝাড়েশ্বরী’, ‘ পীতাম্বরী’, ‘ বঙ্গেশ্বরী’, ‘ জগাতী’।[91] সিউড়ির কালীপুড়ে তিনি আবার ‘মনসা’, ‘বড় মা’, ‘মেজ মা’, ‘ছোট মা’ নামে পরিচিত।[92] মনসার ক্ষেত্রে প্রচলিত এই নামগুলির মাধ্যমে, সাধারণ জনগণের এই নিম্নবর্ণের দেবীর প্রতি আকুল ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বিষহরি মনসা একদিকে যেমন ‘ দেবী’, অপরদিকে তেমনি তাঁদের ‘মা’। অতএব, ভয়াল দেবী মনসা ‘মা’ হিসেবে যে জনগণের মধ্যে অবর্তীন হয়েছেন আলোচ্য নামগুলি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বর্ধমানের মইল গ্রামে তিনি ‘বয়নী’ নামে পরিচিত, যা প্রধানত বস্ত্রশিল্পের সাথে যুক্ত গোষ্ঠীকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।[93]

হুগলীর সরাই পাড়াতে দেবী মনসা ‘সরাই মা’ এবং হাড়ালে ‘সেজ মা’ নামে প্রসিদ্ধ।[94] ‘সরা’ যেহেতু মানুষের নিত্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং মানুষের গৃহস্থালির তথা রান্নাঘরের এক বাসন। তাই মনসার ‘সরাই মা’ নামটিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। নদীয়ার নক্শী পাড়ায় ‘ব্রহ্মাণী’ দেবীর প্রসিদ্ধ নাম।[95] অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও লোকদেবী মনসার অবস্থানের ইঙ্গিত এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। এছাড়া লোকমুখে তাঁর প্রচলিত নাম ‘কালী’, ‘চেংমুড়ি কানি’।

চব্বিশ পরগণায় সর্পদেবীর অস্তিত্বও বর্তমান। দ্বিধাবিভক্ত হলেও উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যেসকল অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত লোকেদের কুলদেবী হলেন মনসা।[96] অতএব বলা যেতে পারে যে, এইসমস্ত অঞ্চলে নিম্নবিত্তদের

---

91 *তদেব্।*

92 *তদেব্।*

93 Asutosh, Bhattacharyya, “The Serpent as a Folk-Deity in Bengal”, *Asian Folklore Studies*, Vol. 24, No. 1 (1965): 1-10.

94 মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘মনসা’, *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২), ২১০।

95 প্রণব সরকার, *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (কলকাতাঃ লোক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩), ৪০-৪১।

96 H. H. Risley,“The Tribes and Castes of Bengal”, a review by J.F.Hewitt, *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, Vols. I & II, (April. 1893): 237-300.

মধ্যে ‘ সর্পদেবী’, ‘ মনসা’ নামেই পরিচিত, যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় ‘ মনসামঙ্গল কাব্যের’ সঙ্গে। সাধারনতঃ বাউরী, বাগাল, বাগদী, রাজোড়, তাঁতি, শুঁড়ি, মাঝি, জেলে[97] প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এঁকে কুলদেবী বা গ্রাম্যদেবী জ্ঞানে মান্য করে। তবে, উচ্চবর্ণের মহিলাদের মধ্যেও মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে। সেখানে দেশ জুড়ে বিবাহিত বঁধুরা দেবীর নামে ‘উনুন পুজো’, ‘অরন্ধন’ ও ‘ খইদই’ প্রভৃতি রীতি পালন করেন। মনসার পূজার পূজারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের পুরোহিত সম্প্রদায়। তবে, হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মন্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রাধান্য বেশী থাকায়, সম্প্রতি নিম্নবর্ণের পূজোতেও ব্রাহ্মণদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মনসার আরাধনায় তার লৌকিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এর ফলপ্রসূ দেবী মনসা সমাজের সকল স্তরের ‘দেবীত্ব’ লাভ করলেও, তার লৌকিক পূজা পদ্ধতিগুলো কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যায়নি। তার ঝাঁপান বা ভাসান উৎসবের মধ্যে লৌকিক সত্তার প্রভাব সম্প্রতিকালেও লক্ষ্য করা যায়।

চণ্ডী প্রথম থেকেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত হওয়ায়, তার লৌকিক সত্তা কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে পড়ে। কিন্তু তার আঞ্চলিক নামগুলি ব্যাখ্যা করলে, তার পরিচিতি দেবী মাহাত্ম্যের অন্তর্গত কিনা তা সহজেই উপলদ্ধি করা সম্ভব হয়। চণ্ডী মূলত পৌরাণিক দেবী। কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ তথা উপপুরাণগুলিতে সে ‘ শক্তি’র অংশ হিসেবে পরিচিত। কখনো সে দুর্গা, ভগবতী, মহেশ্বরী, আবার কখনো কালী, ভদ্রকালী ও চণ্ডী। এর মাধ্যমে প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদী ও লৌকিক সত্তার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গীয় পুরাণে চণ্ডীর যে রূপ পাওয়া যায়, তাকে লৌকিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করলে চার ভাগে বিভক্ত হয়। ১) মূর্তিহীন চণ্ডীর প্রতীক, যার অবস্থান গাছ, মাটির ঢেলা ও শিলাখণ্ডে, ২)

[97] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘চণ্ডী’, *আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২), ১৯২-১৯৩।

প্রস্তর খোদিত প্রাচীন মূর্তি, ৩) চণ্ডীর ধাতু মূর্তি, এবং ৪) চণ্ডীর মৃন্ময় মূর্তি।[98] প্রত্যেকটি বিভাগের অবস্থানকে অনুসন্ধান করলে দেবী চণ্ডীর লৌকিক রূপ এর প্রকাশ সম্ভব হবে।

মূর্তিহীন চণ্ডীর প্রতীক উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটি অঞ্চলে ‘ ঢেলাইচণ্ডী’[99] হিসেবে পরিচিত। চণ্ডীর উল্লেখ্য প্রতীকের নাম অনুসরণ করলে এর সাথে ‘ঢেলা’ বা ‘মাটি’ বা ‘শিলাখণ্ডের’ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে, নৈহাটি অঞ্চলের মানুষেরা কখনো কখনো খেজুর গাছকেও চণ্ডীর এই লৌকিক নাম অনুসারে পূজা করেন। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই দেবীর নাম ‘ দেলাই চণ্ডী’।[100] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০২ খ্রী এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ‘দেলাইচণ্ডী’ বা ‘বৃক্ষপূজা’র রূপ ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি বলেন চণ্ডীর এই রূপ লৌকিক সত্তা হিসেবে পরিচিত হলেও, চণ্ডীর জ্ঞানেই “দেলাইচণ্ডী” পূজিতা।[101] বৃক্ষদেবী হিসেবে বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানার পুনিয়াজোল গ্রামে একটি শেওড়া গাছকে ‘ পুনেচণ্ডী’ হিসেবে পূজা করা হয়।[102] ‘ মাকালচণ্ডী’র অবস্থান আবার মাটির ঢেলায়। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মৎসজীবিরা এর প্রধান উপাসক।[103] মাটির ঢেলায় পূজাপদ্ধতি দেবী চণ্ডী পূজার উদারতাকে ব্যাখ্যা করে। হাওড়া জেলার নিমগাছের বৃক্ষে ‘ওলাই চণ্ডী’ও পূজিতা।[104] কলেরা নিবারণের এই দেবী ‘ওলা বিবি’ হিসেবেও খ্যাত।[105] অর্থাৎ, এই দেবী একদিকে চণ্ডী (হিন্দু), অন্যদিকে ‘বিবি’ (মুসলিম) ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিরপেক্ষ দেবী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আবার

---

98 *তদেব,* ১৯৩।

99 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা- পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৮৮-৯০।

100 *তদেব,* প্রথম খণ্ড, ১০০।

101 *তদেব,* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ১৪১, ১৬৫।

102 *তদেব,* দ্বিতীয় খণ্ড, ১০২।

103 মোহনলাল মণ্ডল, *হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী,* (পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১), ১১।

104 *তদেব,* ১১।

105 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা- পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, পৃঃ ১২৮।

হাওড়া অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে তিনি 'দিদি ঠাকুরণ'[106] হিসেবেও পরিচিত। এর মাধ্যমে দেবীর সাথে জনসাধারণের নিবিড় সম্পর্ককে অনুধাবন করা যায়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় চণ্ডী শিলাখণ্ডে পূজিতা। 'শিলাখণ্ড', 'গাছ', 'মাটির ঢেলা' প্রভৃতি ভূমিজ উপকরণ চণ্ডী ধারণার সাথে যুক্ত থাকায় তিনি কাল্ট হিসাবেও পরিগণিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, প্রকৃতির সাথে যুক্ত থাকা 'চণ্ডী' কাল্ট কিভাবে বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত হয়, এবং সেক্টে পরিণত হয়।

প্রস্তর খোদিত প্রাচীন চণ্ডী মূর্তি হিসেবে আমরা বাঁকুড়া জেলার আটবাইচণ্ডী গ্রামের 'আটবাইচণ্ডী'[107], পাত্রসায়েরে 'বসনচণ্ডী'[108], বর্ধমান জেলায় বোঁয়াই গ্রামে 'বোঁয়াই চণ্ডী'[109], মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বাসুদেবপুরে 'জয়চণ্ডী'[110], ভেলামপুরে 'দেবীচণ্ডী'[111], আসাদা গ্রামে 'দেবীচণ্ডী'[112], পুরুলিয়া জেলার সেনারা গ্রামের 'সিংহবাহিনী চণ্ডী'[113] প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু খোদিত শিলার সন্ধান পাওয়া যায় মালদহের 'বুলবুলচণ্ডী' গ্রামে 'বুলবুলচণ্ডী'[114], হাওড়ার আমতায় 'মালাইচণ্ডী'।[115] বর্ধমানে গুপ্তিপুরে 'আগড়াইচণ্ডী' একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র খোদিত মূর্তি।[116] আটবাইচণ্ডী বিকট আকৃতির। এই আকৃতির দেবী যখন ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিতা, তখন অনুধাবন করতেই হবে পৌরাণিক চণ্ডীর সংস্পর্শে তিনি মঙ্গলদায়ী দেবীতে পরিণত হয়েছে। বসনচণ্ডীর রূপও একই রকম।

---

106 *তদেব*, ২১৬।

107 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, পঞ্চম খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

108 *তদেব*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৩৪-৪৩৬।

109 *তদেব*।

110 *তদেব*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৫।

111 *তদেব*।

112 *তদেব*।

113 *তদেব*।

114 মোহনলাল মণ্ডল, *হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী*, (পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১), ২৮।

115 *তদেব*।

116 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, পঞ্চম খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৪৩৫।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রামের নাম অনুসারে চণ্ডীর নামকরণ হয়, যেমনঃ বোঁয়াই চণ্ডী। প্রধানতঃ চণ্ডী এখানে গ্রাম দেবী বা গ্রামের রক্ষাকর্তী হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ চণ্ডীর এই নামের ধারণার সাথে দেবীকে রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য করা যায়। চণ্ডীর এই রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণ তথা মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে। এখানে দেবী সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। আবার ‘জয়চণ্ডী’ ও ‘দেবীচণ্ডী’র সাথে চণ্ডীর ‘মঙ্গলময়ী’ রূপের ধারণা পাওয়া যায়। হাওড়া জেলার জয়চণ্ডী ‘দশভূজা’। অর্থাৎ তিনি দুর্গা স্বরূপ। অতএব, প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিতে যে দেবী লৌকিক হিসেবে পরিচিত ছিল, তা চণ্ডীর ধ্যানে পূজা হওয়ার পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

ধাতু ও চিন্ময় মূর্তিতে চণ্ডী কখনো সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চণ্ডী কেবলমাত্র মঙ্গলচণ্ডী হিসবেই উল্লেখিত। দ্বিজ মাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ এ এই চণ্ডীর পৌরাণিক রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। চণ্ডী আবার কখনো সিংহবাহিনী।[117] সিংহবাহিনী আবার দশভূজার সমরূপ। চণ্ডী কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু কুলনারীদের সমরূপ। এক্ষেত্রে আমরা ‘মঙ্গলচণ্ডী’, ‘জয়মঙ্গলচণ্ডী’, ‘হরিশমঙ্গলচণ্ডী’, ‘সংকটামঙ্গলচণ্ডী’ কিংবা ‘কুলাইচণ্ডী’ বা ‘নাটাইচণ্ডী’ কথা উল্লেখ করতে পারি। এইসব দেবীরা আবার বাংলার নারীদের ব্রতকথায় বিরাজমান। অর্থাৎ, চণ্ডী এখানে গৃহদেবী বা গৃহের মঙ্গলদাত্রী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ মঙ্গলকাব্যের দেবী জনপ্রিয় হলেও, প্রকৃতপক্ষে তার পরিচিতি কিন্তু ভয়ঙ্কর দেবী রূপে। কারণ তারা উভয়েই প্রকৃতির সাথে যুক্ত। আর প্রকৃতি অনিশ্চিত। তাই এই দুই কাল্টের সাথে ভয়ের বিষয় যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন উপপুরাণে অবস্থান গ্রহণের পর যখন দুই দেবী পৌরাণিক পরিচিতি লাভ করে, তখন তাদের দৈবীসত্তা থেকে ‘ভয়’ লুপ্ত হয়ে ‘ভক্তি’র উত্থান ঘটে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব যখন তারা

---

[117] *তদেব্।*

দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত হতে পারবে। মনসা ও চণ্ডীর লৌকিক ফর্মগুলো ‘দেবীমাহাত্ম্যের’ অন্তর্গত হয় মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে যুক্ত হয়। আর ব্রাহ্মণ্যবাদের রাজনীতি নিজস্বার্থে লৌকিক সত্তাগুলোর সঙ্গে পৌরাণিক দেবীসত্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডীর’ লৌকিক রূপগুলোর লৌকিক বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান

মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ ‘মনসামঙ্গল’ এবং ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শিবের উপস্থিতিও ছিল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ভারতের প্রাগ্-বৈদিক দেবতাদের মধ্যে কেবলমাত্র ‘শিব’, পরবর্তী হিন্দু সমাজে প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হন।[1] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উত্থান ঘটলেও, শিবের অস্তিত্ব কিন্তু ম্লান হয়ে যায়নি। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায়, হিন্দু ধর্মেও সামাজিক প্রয়োজনে ‘শিবকেন্দ্রিক’ ধর্মীয় ও সামাজিক ধারণার বিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবকে কেন্দ্র করে ‘ত্রিকোণ’ সম্পর্কীয় ধারণার উৎপত্তি ঘটে। এই সম্পর্কের একদিকে যেমন শিবের অবস্থান মনসার পিতা রূপে, অন্যদিকে চণ্ডীর পতি রূপে তাঁর পরিচয়ের সূত্র বহন করে মঙ্গলকাব্যগুলি। প্রকৃতপক্ষে ‘শিবের’ অস্তিত্বের মধ্যে মধ্যযুগের সমাজজীবনের প্রতিফলন সর্বাধিক।

মঙ্গলকাব্যে প্রধানত ‘শিবের’ পৌরাণিক দৈবীসত্তার সাথে মানবিক আধার সংযুক্ত হয়েছে। বিশেষত, মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবের মধ্যে লৌকিক বা সাংসারিক সত্তাকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ‘প্রতীক’ বা ‘মডেল’ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এর সাথে আবার মানবিক সত্তার সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে ‘শিবকে’ তৎকালীন সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় আবৃত করতে উদ্যত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, ‘শিবের’ প্রকৃত রূপ কিরকম? মঙ্গলকাব্য এবং শিবায়নে শিবের রূপের বহিঃপ্রকাশ পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলির দৃষ্টান্তের সমতুল্য নয়। মঙ্গলকাব্যের ‘গৃহী’ শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য,

---

[1] আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘লৌকিক শৈবধর্ম-শিবের গীত-শিবমঙ্গল কাব্য’, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪২।

শিবপুরাণের ‘তপস্বী’ শিবের তুলনায় অনেকাংশে পৃথক। আবার বঙ্গীয় পুরাণের অন্তর্গত ‘শিবায়নে’ও শিবের তপস্বী ও গৃহী রূপের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর বিভিন্ন রূপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য।

## ২.১ ‘শিব’এর রূপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

হিন্দু ধর্মে শিবের চরিত্রের সাথে যে বিভিন্ন মানবিক সত্তার সংযুক্তিকরণ ঘটেছে, এ বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিব কখনো ‘ যোগী, আবার কখনো সে ‘ কামরূপী’। অন্যদিকে সে ‘ পিতা’, আবার ‘পুত্র’ও। ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিবের রূপের মধ্যে বিবিধ প্রভেদও লক্ষ্যণীয়। শিবপুরাণ অনুযায়ী ‘ শিবের’ ধারণার পরিব্যাপ্তি অনুভব করা যায়। শিবপুরাণে শিব একাধারে যেমন ‘ শক্তি’, তেমনি ‘ মায়া’, আবার ‘জ্ঞানের’ প্রতীক।[2] তিনি ‘ সত্য’, ‘ রজ’, ‘ তম’ এর উর্দ্ধে।[3]

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও কাব্য অনুযায়ী শিব এমন এক ধরণের ‘ ডিসকোর্স’ বা ‘ ব্যাপ্তি’, যাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি সম্পৃক্ত। Wendy Doniger O’Flaherty তার আলোচনায় ‘শিবের’ স্ববিরোধী রূপের সত্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী, শিবের চরিত্রের সাথে দ্বৈত সত্তার সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এর একদিকে যেমন রয়েছে শিবের ‘ সন্ন্যাস’ রূপ, অন্যদিকে শিবের ‘ কামরূপ’ও অধিষ্ঠিত।[4] প্রকৃতপক্ষে শিবকে ‘ প্রজননের প্রতীক’[5] হিসাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যেই Wendy Doniger O’Flaherty, তাঁর তপস্বী ও কামরূপের সহাবস্থানকে চিহ্নিত করেন। অনুরূপভাবে, Levi-Straussও

---

[2] Arnold Kunst & J.L. Shastri ( ed.), *Ancient Indian Tradition and Mythology: the Siva-Purana,* Vol-I, (Delhi: Sundarlal Jain & Motilal Banarasidas, 1969), 173.

[3] *তদেব*, ১৭৪।

[4] Wendy Doniger O’Flaherty, “Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva”, Part. I, *History of Religions,* Vol. 8, No. 4 (May. 1969): 300.

[5] *তদেব*, ৩০১।

শিবের আপাতবিরোধী রূপকে আলোকপাত করেছেন।[6] শিবের ‘ বিবাহ’কে তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করেন।[7] Wendy Doniger O’Flaherty মনে করেন, হিন্দু মিথোলজি বা কল্পকাহিনীতে ‘ভক্তির অজুহাত’[8]কে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, শিবের স্ববিরোধী রূপের প্রকাশ পাওয়া যায়। আবার শিবপুরাণে উল্লেখিত তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে, তিনি ‘ জাগতিক প্রয়োজন’কে শিবের প্রেমিক রূপের কারণ হিসাবে বর্ণনা করেন।[9] ‘ জাগতিক’ প্রয়োজন বলতে এখানে শিবের ঔরসে কার্তিকের জন্মের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবপুরাণ অনুযায়ী, কেবলমাত্র শিবের ঔরসজাত সন্তান তারকাসুর বধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। কামদেব তপস্বী শিবকে তাই কাম বাণ নিক্ষেপ করেন তাঁর মধ্যে ‘যৌন আকাঙ্খা’ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে।[10]

প্রাচ্যবাদী গবেষকরা শিবকে ‘সৃষ্টি’ ও ‘বিনাশ’ এর কর্তা রূপে বিবেচনা করে, তাঁকে জীবন ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে উল্লেখ করেন।[11] এক্ষেত্রে তারা শিবের ‘ লিঙ্গরূপী’ প্রতীককে প্রজননের ধারণার সাথে যুক্ত করেন। Rene Grousset শিবের আপাতবিরোধী রূপকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথাঃ ১. শিবের লিঙ্গ রূপ, ২. শিবের তপস্বী রূপ, ৩. শিবের কামরূপ।[12] Wendy Doniger O’Flaherty শিবের ‘লিঙ্গ’ পূজাকে তন্ত্রবাদের সাথে সংযুক্ত করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুযায়ী শিবের যোগীরূপ ‘কামের উর্দ্ধে’ হলেও, তন্ত্রে শিবের ‘লিঙ্গ রূপ’ প্রজননের প্রতীক। তবে, শিবের এই রূপে যৌনতা ব্যতিরেকে, ‘ক্ষমতার’ প্রতিফলন সর্বাধিক।[13] শিবের ‘ যোনি সহযোগী লিঙ্গরূপ’, তাঁর অগ্নিসম ঔরসকে ধারণ

---

[6] *তদেব্।*
[7] *তবেদ্,* ৩০২।
[8] *তদেব্,* ৩০৩।
[9] *তদেব্,* ৩০৪।
[10] *তদেব্।*
[11] *তদেব্।*
[12] *তদেব্।*
[13] *তদেব্,* ৩১০।

করার মাধ্যম, যা সৃষ্টির হেতু প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এখন প্রশ্ন হল, পৌরাণিক উপাখ্যান ও কল্পকাহিনীগুলিতে শিবলিঙ্গের কিরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

Wendy Doniger O'Flaherty এই প্রসঙ্গে একটি কল্পকাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কাহিনী অনুযায়ী, পাইন অরণ্যে শিবের ' তপস্বী' রূপকে প্রত্যক্ষ করে সপ্তঋষির পত্নীরা বিমোহিত হয়ে পড়েন। সপ্তঋষিরা শিবের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে না পেরে ভুলবশতঃ তাঁকে অভিসম্পাত দেন। এর ফলপ্রসূ, শিবের লিঙ্গচ্ছেদন ঘটে ভূমিতে পড়ে 'লিঙ্গরূপী' প্রতীকের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কিত কাব্যে শিবের 'লিঙ্গরূপ'কে পবিত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ শিবের এই রূপের সাথে 'যোগী' ও 'ভোগী'র সমন্বয় সাধন ঘটলেও, তিনি নিজে ভোগবাদের উর্দ্ধে।[14] ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে শিবের চরিত্রে 'সুখ' ব্যতীত যৌন সংসর্গের প্রাধান্য থাকায়, সেখানে তাঁর ' তপস্বী' রূপ অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ যৌনসংগমে নির্গত শিবের ঔরসও আধ্যাত্মবাদের ছোঁয়ার আবৃত।

Wendy Doniger O'Flaherty তার প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে শিবের ' রুদ্র' রূপের বিশ্লেষণ করেছেন। 'বিনাশকারী' রূপ হিসাবে শিবের 'রুদ্র' রূপের উত্থানের বিবরণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।[15] হিন্দু ধর্মগ্রন্থে 'কাম পরিপন্থী' এই রূপের উন্মেষ ঘটে, প্রধানত কামদেব কর্তৃক শিবকে কামনা বাণে জর্জরিত করার পর।[16] ' রুদ্র' রূপে শিব শাস্তিস্বরূপ কামদেবকে ভস্মীভূত করেন। Stella Kramrisch তার প্রবন্ধেও, শিবের বিনাশকারী রূপের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মূলতঃ মহাভারত ও শিবপুরাণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিবের তপস্বী চরিত্রের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেন। তার ধারণা অনুযায়ী, 'সৃষ্টি' ও 'বিনাশ'কে কেন্দ্র করে শিবের 'তপস্বী' রূপ সংগঠিত হয়।[17] এরপর শিবের রুদ্র রূপের বিবরণের প্রসঙ্গে তিনি চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত মৃত্তিকা নির্মিত 'রুদ্রমূর্তি'কে ব্যবহার

---

14 *তদেব্*, ৩১২।

15 Wendy Doniger O'Flaherty, "Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva", PartII, *History of Religions,* Vol. 9, No. 1, (May. 1969): 1-41.

16 *তদেব্।*

17 Stella Kramrisch, "Siva Bholanatha c. 450-550", *Philadelphia Museum of Art Bulletin,* Vol. 80, No. 343/344 (Summer-Autumn, 1984): 4.

করেছেন। উল্লেখিত ‘রুদ্র’ মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এর তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত।[18] ‘রুদ্র’ রূপের অন্তরালে শিবের ‘তপস্বী’ রূপ পরিবৃত থাকায়, তিনি একে ‘The mask of Siva’[19] বা ‘শিবের মুখোশ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

Stella Kramrisch শিবের তপস্বী রূপকে কোন কোন ক্ষেত্রে ‘ভোলানাথ’ এর অনুরূপ বলে উল্লেখ করেন। ‘ভোলানাথ’ রূপ মূলতঃ ‘সমবেদনাশীল’ বা ‘সহানুভূতি’র প্রতিমূর্তি।[20] অতএব, শিবের পরিব্যাপ্তি তার বৈচিত্র্যময় আকৃতির মাধ্যমে অনুমান করা যায়। শিব ‘ যোগী’ শ্রেষ্ঠ, এবং তপস্বীর চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ের প্রতি তিনি নির্লিপ্ত। শিব যোগী হিসাবে একদিকে যেমন ক্ষমাশীল, অন্যদিকে বিনাশকারী। এখন প্রশ্ন হল, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে শিবের যৌন নির্লিপ্ত ভাব বর্ণিত হলেও, পরবর্তীতে তাঁকে কেন ‘কামরূপে’ উল্লেখ করা হয়েছে? এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, দেবাদিদেবকে মানবজাতির সাথে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, ধর্মগ্রন্থগুলিতে তিনি ‘ কামে’র প্রতীকে অবতীর্ণ হন। তাঁর কামরূপ জাগতিক প্রয়োজনের নিরিখে হলেও, যোগী শিবের আত্মাকে তা কলুষিত করতে পারেনি। তপস্বী শিবের ‘পিতা’ রূপের আবির্ভাব ঘটে প্রধানত তাঁর ‘কামরূপ’কে কেন্দ্র করেই।

Anne E. Moniusও অনুরূপভাবে ‘পিতা’ হিসাবে শিবের বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, ‘ যোদ্ধা’ এবং ‘ পিতা’র সংমিশ্রিত রূপ হল শিবের উল্লেখিত রূপ। ঋগ্বৈদিক স্তোত্রের উপর ভিত্তি করে শিবের এই জটিল বৈশিষ্ট্যের সপক্ষে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শিব প্রধানতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পিতা।[21] অর্থাৎ, প্রয়োজনে তিনি নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে পারেন। অন্ধক ও জলন্ধর নামক অসুরদ্বয়ের দৃষ্টান্ত উক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই শিবের অংশজাত, আবার তিনিই তাদের

---

[18] *তদেব্।*

[19] *তদেব্।*

[20] তদেব্, ৭।

[21] Anne E. Monius, “Siva as Heroic Father: Theology and Hagiography in Medieval South India”, *The Harvard Theological Review*, Vol. 97, No. 2 (Apr., 2004): 165-197.

বিনাশকারী।[22] ‘সৃষ্টি’ ও ‘বিনাশের’ ক্ষমতা থাকার দরুণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতা হিসাবে তাঁর পিতৃরূপ সার্থক। অনুরূপভাবে দেবতা ও অসুর উভয়েই শিবের অংশে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি স্বর্গ ও পাতাল উভয় গোলার্ধের ধারক ও বাহক। অপরদিকে Knut A. Jacobsen এর আলোচনায় ‘শিশু’রূপী শিবের ধারণা পাওয়া যায়। তিনি জনপ্রিয় হিন্দু দেবতাদের চিত্রের মধ্যে শিবের ‘শিশু’ রূপের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেন। তার ধারণা অনুযায়ী, বিগত একশ বছরে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরণের ‘পোষ্টার’ বা ‘ছবি’ নির্মিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এর মধ্যে কৃষ্ণ, রাম, হনুমান এবং সীতার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হলেও, বিগত দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে ‘শিশু’ রূপী শিবের প্রতিচ্ছবিও সমভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।[23] তবে, শিবের ‘শিশু’ রূপের ব্যাখ্যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়না। জনপ্রিয় মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমেই এর প্রথম উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ভারতে উক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত ভাষ্কর্যে পাঁচটি[24] অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ব্যাঘ্র চর্ম পরিবেষ্টিত পদ্মাসনে অবস্থানরত তপস্বী শিবের চরিত্রকে আলোকপাত করে। এর কণ্ঠে সর্প ও জটায় গঙ্গা অবস্থিত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে শিব ‘নৃত্যের দেবতা’ বা ‘নটরাজ’ হিসাবে জনপ্রিয়। শিবের নটরাজ রূপের ব্যাখ্যা Anne-Marie Gastonও প্রদান করেন। তিনি মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শিবের ‘নটরাজ’ রূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত দেবতাকে ‘শিল্পীদের দেবতা’ রূপে চিহ্নিত করে, নৃত্যকে ‘উপাসনা’ বা ‘ভক্তির’ সাথে সংযুক্ত করেছেন।[25]

---

[22] তদেব, ১৮৭।

[23] Knut A. Jacobsen, “The Child Manifestation of Siva in Contemporary Hindu Popular Prints”, *Numen*, Vol. 51, No. 3 (2004): 237-238.

[24] *তদেব*, ২৩৮।

[25] Anne-Marie Gaston, Siva in Dance, Myth and Iconography, a review by Betty True Jones, *Dance Research Journal*, Vol. 17/18, Vol. 17, no. 2 – Vol. 18, no. 1 (Autumn, 1985-Spring, 1986): 90-91.

অপরদিকে Knut A. Jacobsen শিবের নটরাজ রূপকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের নিরিখে বিচার করেছেন।[26] তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অপরিহার্য হল শিবের 'গৃহী' রূপ। সেক্ষেত্রে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিরাজমান তাঁর পিতৃ রূপকেও বিশ্লেষন করা প্রয়োজনীয়। কারণ পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে তিনি একাধারে পার্বতীর স্বামী এবং সন্তানের পিতা। অতএব অনুমান করা যায় যে, দাম্পত্য প্রেম ও পিতার দায়িত্ব পালনের সমতুল্য লৌকিক বিষয়সমূহের সংযোজনে উদ্ভব ঘটে তাঁর 'গৃহী' রূপের। চরিত্রগত প্রভেদের কারণে শিবের তৃতীয় রূপ উপরিউক্ত উভয় রূপের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। শিবের 'তপস্বী' ও 'নটরাজ' রূপের প্রকৃতি সৃষ্টি ও বিনাশের উদ্দেশ্যে বিচার্য হলেও, 'গৃহী' রূপে শিব একান্তভাবেই প্রতিপালক। লিঙ্গরূপে তিনি আবার কামের প্রতীক। ভারতীয় ভাস্কর্যে শিবের উক্ত প্রতীকের প্রচলন সর্বাধিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁর 'লিঙ্গরূপ' পুরুষের যৌনাঙ্গের সমরূপ হওয়ায়, তা প্রজননের প্রতীক হিসাবেও চিহ্নিত। 'লিঙ্গরূপ'এ শিব 'কামরূপী' হিসাবেও পরিচিত। তবে, তিনিই আবার কামের উর্দ্ধে। এরপর পঞ্চম বৈশিষ্ট্যে তিনি 'অর্ধনারীশ্বর' রূপে বিরাজমান। ভারতীয় হিন্দু ভাস্কর্যে 'অর্ধনারীশ্বর' রূপ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে।

শিবের রূপের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যতীত Knut A. Jacobsen তাঁর 'শিশু' রূপকে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এর পরিপ্রেক্ষিতেও বিবেচনা করেছেন। তার আলোচনায়, 'শতপথ ব্রাহ্মণ' অনুযায়ী 'শিব' ও 'রুদ্র' রূপের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'এ 'শিব' শব্দের তাৎপর্য 'মঙ্গলকারী' হলেও, 'রুদ্র' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'কান্না' বা 'আর্তনাদ'।[27] বায়ু পুরাণ অনুযায়ী প্রজাপতির অংশে আবির্ভূত ক্রন্দনরত শিশুকে 'রুদ্র' নামে ভূষিত করা হয়।[28] অর্থাৎ বায়ু পুরাণে শিব প্রত্যক্ষভাবে 'শিশু' হিসাবে উল্লেখিত না হলেও, 'রুদ্র' নামের মাধ্যমে তার শিশু রূপের আভাষ পাওয়া যায়।

---

[26] Knut A. Jacobsen, "The Child Manifestation of Siva in Contemporary Hindu Popular Prints", *Numen*, Vol. 51, No. 3 (2004): 238.

[27] *তদেব*, ২৪১।

[28] *তদেব*, ২৪২।

বৈদিক সাহিত্য এবং পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থে শিবের অন্যান্য রূপের মতো 'রুদ্র' রূপও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। স্কন্ধপুরাণে বিশ্বনরের পত্নী শুচিস্মিতা আবার শিবকে সন্তান রূপে পাওয়ার অভিলাস প্রকাশ করেন।[29] প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ রূপকে আরাধনা করে শিবতুল্য 'শিশু' পাওয়ার আকাঙ্খা তাঁর 'লিঙ্গ' রূপের মাহাত্ম্যকে চিহ্নিত করে। এছাড়া শিবের লিঙ্গরূপ প্রজননের প্রতীক। অর্থাৎ প্রজননের প্রতীকের সাথে কেবলমাত্র 'উৎপাদনের' সম্পর্ক নয়, 'সন্তান' লাভের প্রসঙ্গটিও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

অন্যদিকে আবার Ellen Goldberg তার প্রবন্ধে উক্ত দেবতার 'অর্ধনারীশ্বর' রূপকে লিঙ্গভিত্তিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী, শিবের এই প্রতিমূর্তি 'নারী' ও 'পুরুষ' উভয়ের সংমিশ্রণে নির্মিত।[30] তবে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'ভক্তি', 'যোগ' ও 'তন্ত্র' এর মধ্যে অবস্থিত শিবের 'অর্ধনারীশ্বর' রূপের একটি নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নারীবাদী ধারণা অনুযায়ী, পিতৃতান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে শিবের সত্তার সাথে 'অর্ধনারীশ্বর' প্রতীকের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে, তাঁর চরিত্রের মধ্যে 'পুরুষ' ও 'নারী' উভয়ের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তবে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে শিবের এই রূপকে কখনো আদর্শ 'স্ত্রী' অথবা আদর্শ 'পুরুষের' নিরিখে বিচার করা হয়নি।[31]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে 'শিব' এর রূপের প্রশস্তিকে অনুভব করা যায়। ভারতীয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বা কল্পকাহিনীগুলিতে শিবের ব্যাখ্যা সর্বাত্মক। ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তিনি সমগ্র বিশ্বের আধার। তাঁকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়গুলি আবর্তিত হয়। অর্থাৎ শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর মধ্যে সমগ্র জাগতিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার লক্ষ্য করা যায়।

---

29 *তদেব*, ২৬০।

30 Ellen Goldberg, "Ardhanarisvara in Indian Iconography: A New Interpretation", *East and West,* Vol. 49, No. 1/4 (December 1999): 175-187

31 *তদেব*।

এখন প্রশ্ন হল, শিবের রূপের তারতম্য বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে কিভাবে আবর্তিত হয়েছে? এছাড়াও অবগত হওয়া অপরিহার্য যে, সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত শিবের আদিরূপের সাথে, বৈদিক ও ধর্মশাস্ত্রের যুগের শিবের রূপের পার্থক্য কিরকম? অনুরূপভাবে, শিবপুরাণে উল্লেখিত শিবের রূপের ব্যাখ্যা, মঙ্গলকাব্যের যুগের শিবের থেকে কতোটা স্বতন্ত্র, তাও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। অপরদিকে বিচার্য বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে শিবের চরিত্রকে কিভাবে রচনা করেছেন? এছাড়াও কবিদের বর্ণনায় উল্লেখিত শিবের 'যোগী' রূপের ব্যাখ্যা কি সময় ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অপরিবর্তিত রয়েছে?, সেই প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা প্রয়োজনীয়। শিবায়ন কাব্যে উদ্ধৃত শিবের রূপের মধ্যে আবার বৈদিক ও পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে শিবের 'আদি' বা 'প্রাচীন' রূপ সময়ের বিবর্তনের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা বর্তমান আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু।

## ২.২ বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থে শিবের অবস্থান

শিবের অপর নাম 'পশুপতি'। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে 'পশুপতি' কাল্টের উদাহরণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বৈদিক সাহিত্যে শিবের অবস্থান নির্ণয়ের আগে প্রয়োজন তাঁর আদি রূপের পরিচয় বর্ণনা করা। মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন শিলমোহরে পশু পরিবেষ্টিত যে কাল্টের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তা শিবের পশুপতি রূপের সমতূল্য। ১৯২০ সালে সিন্ধু সভ্যতায় খননকার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিলমোহরগুলি সম্পর্কে John Marshall গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। John Marshall এর বক্তব্য অনুযায়ী, পশুপতি কাল্ট প্রধানত শিবের মধ্যযুগীয় রূপের সমতুল্য।[32] তিনি কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পশুপতি কাল্টকে শিবের প্রাগার্য রূপ হিসাবে বর্ণনা করেন, যথাঃ

১. ত্রিমুখ বিশিষ্ঠ কাল্ট।

[32] Doris Srinivasan, "The So-Called Proto-siva Seal from Mohenjo-Daro: An Iconological Assessment", *Archives of Asian Art*, Vol. 29 (1975/1976): 47

২. মহাযোগী বা যোগীর ভঙ্গিমায় তাঁর অধিষ্ঠান।
৩. পশু দ্বারা আবৃত।
৪. মাথায় ত্রি শিং মুকুট।
৫. হরিণের চিত্রযুক্ত সিংহাসন।[33]

John Marshall প্রদত্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশুপতি কাল্টের প্রথম আকৃতির সাথে ব্রহ্মার রূপের সংযোগ থাকলেও, মহাভারতে বর্ণিত তিলোত্তমার কাহিনীতে শিবের পঞ্চমুখ উল্লেখিত। এরপর দ্বিতীয় রূপটিতে 'পশুপতি' কাল্টের দৈহিক ভঙ্গিমাকে বিশ্লেষণ করলে, তাঁর 'যোগী' রূপের সাথে শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত, প্রতিচ্ছবিতে উক্ত কাল্টের সাথে হিংস্র পশুর সহাবস্থান লক্ষ্যণীয়। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত শিবের প্রতিকৃতিতেও হিংস্র জীবের অবস্থান বর্তমান। অতএব, এর মাধ্যমে শিবকে ' পশুপতি' কাল্টের অনুরূপ হিসাবে সহজেই অনুমান করা যায়। John Marshall এর বর্ণনায়, কাল্টের মস্তকে অবস্থিত ত্রিশূল আকৃতির মুকুটের সাথে শিবের অস্ত্র 'ত্রিশূলের' তুলনা করা যেতে পারে। অবশেষে তাঁর সিংহাসনে চিত্রিত হরিণের প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে তাঁকে 'জীবজগতের দেবতা' রূপে স্বীকার করা যায়।[34]

Doris Srinivasan আবার John Marshall এর ৪২০ নং শিল্ডের প্রথম প্লেটে উল্লেখিত 'পশুপতি' প্রতিচ্ছবিকে পুর্নবিবেচনা করতে উদ্যত হন। তার ধারণা অনুযায়ী, সেই প্লেটে চিত্রিত অর্ধ মানব এবং পশু সন্নিবিষ্ট কাল্টকে[35] পুনরায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাক্ বৈদিক প্রাচীন শিবের প্রতিমূর্তিকে যথাক্রমে ' যোগী', ' কামরূপী', ' নটরাজ', ' পশুপতি', ' অর্ধনারীশ্বর',

---

[33] Sir John Marshall (ed.), *Mohenjo-Daro and The Indus Civilization*, (London: Arthur Probsthain, 1931), 52-56.
[34] *তদেব্।*
[35] Doris Srinivasan, "The So-Called Proto-siva Seal from Mohenjo-Daro: An Iconological Assessment", *Archives of Asian Art*, Vol. 29 (1975/1976): 57.

‘মহাদেব’ এবং ‘লিঙ্গ’ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[36] এর উল্লেখ পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য এর মতে, মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত শিলমোহরগুলিতে যোগাসনারত দেবমূর্তি প্রধানত যোগীন্দ্র শিবের প্রাগার্য রূপ।[37] কালক্রমে এই রূপ পৌরাণিক শিবের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট হয়।

ঋক্‌বৈদিক সাহিত্যে ‘রুদ্র’ শিবের আদিরূপ হিসাবে পরিচিত। রুদ্র রূপের মাধ্যমেই বৈদিক ও পরবর্তীকালে শিব পূজার বাস্তবিক যোগসূত্র নির্মিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত ‘রুদ্র’ রূপের সাথে শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তফাৎ থাকলেও, পরবর্তীকালে এই রূপ ‘শিবের’ ধারণার সাথে সংযোজিত হয়ে হিন্দুধর্মে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঋক্‌বেদে ‘রুদ্র’ অপ্রধান দেবতা হিসেবে পরিচিত।[38] তিনি মূলতঃ মরুৎ এর পিতা, ক্ষমতাশালী নায়ক এবং স্বর্গের রক্ষাকর্তা।[39] কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে ইন্দ্র বা অগ্নির সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে।[40] তাঁর মধ্যে অনেক সময় আসুরিক বৈশিষ্ট্যও প্রকৃষ্ট হয়।[41] ঋক্‌বেদে মাত্র তিনটি স্তোত্রে এই দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[42] ঋক্‌বেদের স্তোত্র (১.৪৩) অনুযায়ী রুদ্র প্রতাপশালী নায়ক হলেও, সরাসরি তাঁর ঐশ্বরিক রূপের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়না।[43] তবে, তাঁর ক্ষমতাশালী চারিত্রিক বৈশিষ্টের দরুণ, পরবর্তী হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিবের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন।[44] হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে ‘রুদ্র’ মূলতঃ ধ্বংসের প্রতীক। অপরদিকে এস. কে. চ্যাটার্জী রুদ্র বা শিবকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবতা হিসাবে উল্লেখ

---

[36] Doris Srinivasan, “Unhinging Śiva from the Indus Civilization”, *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,* No. 1 (1984): 77-89.

[37] আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘লৌকিক শৈবধর্ম-শিবের গীত-শিবমঙ্গল কাব্য’, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪৩।

[38] A. A. Macdonell, “Rigveda” (I, 114 $^{6.9}$; 2, 33$^{I}$), *Vedic Mythology*, (Strassburg, 1897), 74.

[39] A. A. Macdonell, “Rigveda” (I, 114 $^{4}$; 2, 33$^{7}$), *Vedic Mythology*, (Strassburg, 1897), 76.

[40] *তদেব্।*

[41] *তদেব্।*

[42] A.Sarkar, *Siva In Medieval Indian Literature*, thesis submitted for the D.Phil (Arts) degree of the University of Calcutta, (Calcutta: 1969), 2.

[43] Basanta Kumar Ganguly, *The Rgveda Samhita*, Vol. 1, (Kolkata: The Asiatic Society, August 2004), 112-117.

[44] *তদেব্।*

করেছেন।[45] যর্জুবেদ ও অথর্ববেদে রুদ্র রূপ আবার নীলকান্ত, গিরিশা, কৃত্তিবাস প্রভৃতি নামের সাথেও সংযুক্ত হয়েছে।[46] শতপথব্রাহ্মণ এবং সূত্র'তে উক্ত দেবতা 'মহাদেব'[47] নামের অন্তর্গত হওয়ায় এই কাল্টের প্রকৃত রূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ 'মহাদেব'এর শান্ত চরিত্রের সাথে 'রুদ্র'এর বিনাশকারী সত্তা একাত্ম হয়ে সৃষ্টির ধারণাকেও নবরূপ প্রদান করেন।

তৈতেরিয় আরণ্যকে শিব 'ঈশান' নামে পরিচিত। 'ঈশান' নামে শিবের পঞ্চমুখের উল্লেখ তৈতেরিয় আরণ্যকে বর্তমান।[48] এর মাধ্যমে John Marshall উল্লেখিত ত্রিমুখী 'পশুপতি' কাল্টের সাথে শিবের সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। তৈতেরিয় আরণ্যকে 'ঈশান' নামে ভূষিত পঞ্চমুখী শিবের অবশিষ্ট নামগুলি হল যথাক্রমে 'সদাশিব', 'ভামদেব', 'অঘোর' ও তত্ত্বপুরুষ'।[49] এই নামগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে শিবের প্রতিকৃতিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হবে। কেদারে অধিষ্ঠিত 'ঈশান' দেব সত্যের প্রতীক।[50] এরপর 'ভামদেব বা ভীমশঙ্কর' নামে পুনায় অবস্থিত জ্যোর্তিলিঙ্গ শিবের উদার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটায়।[51] 'অঘোর', 'তত্ত্বপুরুষ' ও 'সদাশিব' নামের অধিকারী শিব প্রধানত আভ্যন্তরীণ জ্ঞানদীপ্তিময় একটি চরিত্র। 'শিব'এর প্রকৃত অর্থ 'জ্ঞান'[52], এবং শিবপুরাণেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত 'যোগী' শিবের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নামগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। গৃহসূত্রতে উল্লেখিত 'রুদ্ররূপী' শিবের চারটি নামের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথাঃ 'হর', 'মৃধা', 'শিব' ও 'শংকর'।[53] আলোচ্য নামগুলির মধ্যে প্রথমটি

---

[45] A.Sarkar, *Siva In Medieval Indian Literature*, thesis submitted for the D.Phil (Arts) degree of the University of Calcutta, (Calcutta: 1969), 4.

[46] *তদেব,* ৪।

[47] *তদেব,* ৬।

[48] *তদেব,* ৭-১০।

[49] *তদেব।*

[50] স্বামী নির্ম্মলানন্দ, 'শিব', *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* (কোলকাতাঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), ১৯৫।

[51] *তদেব,* ১৯৬।

[52] Arnold Kunst & J.L. Shastri (ed.), *Ancient Indian Tradition and Mythology: the Siva-Purana,* Vol-I, (Delhi: Sundarlal Jain & Motilal Banarasidas, 1969), 5-6.

[53] A.Sarkar, *Siva In Medieval Indian Literature*, thesis submitted for the D.Phil (Arts) degree of the University of Calcutta, (Calcutta: 1969), 7-10.

বাদ দিলে বাকী তিনটি নাম শান্তিপ্রিয় চরিত্রের অন্তর্গত। প্রথম নামটি মূলতঃ ‘হর’ বা ‘হরণ করা’ বা ‘কেড়ে নেওয়া’ অথবা ‘ধ্বংস করা’ অর্থে উল্লেখিত। উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত রুদ্র রূপের ক্রমবিবর্তনকে অনুধাবন করা যায়।

শিব পুরাণের শিবের মধ্যে জটিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘শিব’ এক্ষেত্রে বিভিন্ন নামে বিভক্ত। প্রথমত, শিবপুরাণে উল্লেখিত ‘লিঙ্গ’ রূপ নির্বান লাভের প্রতীক।[54] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘লিঙ্গ’ রূপ প্রধানত পুরুষের যৌনাঙ্গ। সেক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কিত বিষয়গুলিও এর সাথে সংযুক্ত। এখন প্রশ্ন হল, পুংলিঙ্গের প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে কিভাবে নির্বান লাভ সম্ভব? শিবপুরাণে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ‘শিব’ নিজেই নামহীন, গোত্রহীন এবং রূপহীন বৃহৎ ব্রাহ্মণ।[55] তাঁর লিঙ্গরূপ কেবলমাত্র যৌনতার প্রতীক নয়, এটি ‘রূপহীন’ (Niskala)[56] ও ‘রূপে’র (Sakala)[57] সমন্বয়ে নির্মিত একটি মায়া। শিবের লিঙ্গরূপ প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অন্যান্য দেবতাদের থেকে স্বতন্ত্র করে। কারণ, শিব ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণ দেবতাদের মধ্যে নিরাকার রূপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। এর মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অব্রাহ্মণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও পূজা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই শিবের ‘লিঙ্গ’ রূপের অবতারণা ঘটে। শিবপুরাণে ঋষি ‘নন্দীকেশ্বরের’ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ‘শিব প্রধানত শরীরতত্ত্বের উর্দ্ধে বিরাজমান’।[58] তবে, উপাসনার প্রয়োজনে শিবের সাথে ‘শরীরতত্ত্বের’ বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় শিবের ‘লিঙ্গ’ রূপে।

‘লিঙ্গ’ রূপে শিব সম্পূর্ণভাবে উদারমনা। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা উপাসিত। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে শিবের আরাধনার বিষয়টি যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে, প্রধানত তা ব্রাহ্মণ্যবাদী

---

54 Arnold Kunst & J.L. Shastri (ed.), *Ancient Indian Tradition and Mythology: the Siva-Purana,* Vol-I, (Delhi: Sundarlal Jain & Motilal Banarasidas, 1969), 49.

55 *তদেব,* ৫০।

56 *তদেব।*

57 *তদেব।*

58 *তদেব।*

রাজনীতির অন্তর্গত। শিবপুরাণে শিবের লিঙ্গমূর্তি নির্মাণকল্পে মৃত্তিকার প্রকারভেদ এই বিষয়ের সপক্ষে সুদৃঢ় মতামত পোষণ করে। শিবপুরাণে লিঙ্গ প্রতীক নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ' শ্বেত' মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয়দের 'লোহিত' মৃত্তিকা, বৈশ্যদের 'পিঙ্গল' এবং শূদ্রদের 'কৃষ্ণ' মৃত্তিকা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[59] অতএব অনুধাবন করা যায় যে, শিবপুরাণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি শিবকে উদার চরিত্রের প্রতিমূর্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হলেও, এর মধ্যে বর্ণভিত্তিক রাজনীতির ভেদাভেদ সুস্পষ্ট। শিবপুরাণ অনুযায়ী শিবের উক্ত রূপের সাথে একদিকে যেমন মোক্ষ লাভের বিষয় সম্পৃক্ত, অন্যদিকে তেমন সৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও সংযুক্ত।[60] প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি শিবপুরাণের মাধ্যমে শিবের রূপকে 'সার্বজনীন' রূপ হিসাবে প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন, যাকে কেন্দ্র করে সমাজের সকল শ্রেণী এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়। শিবপুরাণে 'লিঙ্গ' রূপী 'শিব' বিভিন্ন নামে উল্লেখিত। মোক্ষ, সৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিবের নামকরণের মধ্যেও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিবের নামগুলি হল যথাক্রমে 'সর্ব', 'ভাবা', 'রুদ্র', 'উগ্র', 'ভীমা', 'মহাদেব', ' পশুপতি', ' ঈশান', ' মহাকাল', ' বীরভদ্র' প্রভৃতি।[61] অর্থাৎ বলা যায়, ' ব্রহ্মতত্ত্ব' ও 'জীবতত্ত্বের' অধীনস্ত সকল বিষয় শিবের 'লিঙ্গরূপী' প্রতীকের অন্তর্গত।

শিবপুরাণে বর্ণিত শিবের পরবর্তী রূপ হল তার 'যোদ্ধা' রূপ। এখন প্রশ্ন হল, শিবের যোদ্ধা রূপের মাহাত্ম্য কি? শিবপুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, দেবতা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয় দেবতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে, তাঁদের জন্মদাতা 'শিব'ও তাঁর বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যোদ্ধা হিসেবে শিব এখানে ' মহেশ্বর'।[62] শিবের ' মহেশ্বর' রূপকে এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। 'মহেশ্বর', অর্থাৎ যিনি সমগ্র ঈশ্বর বা দেবতাদের মধ্যে 'মহান'। প্রজাপতি এবং প্রজাপালকও তাঁর

---

[59] *তদেব্।*

[60] *তদেব্,* ১৩৫।

[61] *তদেব্।*

[62] *তদেব্,* ১৪৩।

দ্বারা ভূমিষ্ঠ হন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মীমাংসার উপলক্ষ্যে তিনি মহেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। উল্লেখিত প্রসঙ্গে শিবের 'ক্ষমাশীল' রূপেরও উদাহরণ পাওয়া যায়। শিবপুরাণকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে, তাঁর ' মহাদেব' রূপের মধ্যে ক্ষমাশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।[63] অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ শিবের 'ভৈরব'[64] রূপ ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের অবসান ঘটান। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক লোভের প্রতিমূর্তি হওয়ায় ভৈরব রূপী শিব ব্রহ্মার সেই অঙ্গের বিনাশ করেন। শিবের 'ক্ষমাশীল' বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রধানত তার বিনাশকারী রূপের উত্থান ঘটে।

শিবপুরাণ অনুযায়ী শিবের সর্বশেষ রূপ হল তাঁর ' গৃহী' রূপ। শিবের আধ্যাত্মিক সত্তা এই রূপের মাধ্যমেই জাগতিক বা লৌকিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে শিবের জাগতিক সত্তার সাথে মানবিক সত্তারও সংযুক্তিকরণ ঘটে। শিবের পূর্ববর্তী রূপগুলোতে সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মধ্যে সম্পৃক্ত থাকলেও, 'গৃহী' রূপে সৃষ্টির বিষয় ক্রমে 'পুরুষ' (শিব) ও 'প্রকৃতি'তে (শিবা বা পার্বতী) বিভক্ত হয়ে যায়। গৃহী রূপে শিবের মধ্যে আদর্শ পিতার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। পিতা রূপে তিনি 'শম্ভু'[65] নামে বিরাজিত। এখন প্রশ্ন হল, বেদে উল্লেখিত বিনাশের প্রতীক শিবের 'রুদ্র' রূপ, কিভাবে তাঁর ব্রহ্মচর্য জীবন থেকে গৃহী জীবনে পদার্পণ করেন? হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, সমগ্র জীবের সৃষ্টির উপলক্ষ্যে একদা শিব শক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন।[66] এরপর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে সৃষ্টি ও প্রতিপালনের দ্বায়িত্ব তাঁরা অর্পণ করেন। ব্রহ্মাই দক্ষ, নারদ, সন্ধ্যা, শ্যামা প্রমুখের সৃষ্টিকর্তা।[67] ব্রহ্মা একসময় তাঁর নিজ পুত্রী সন্ধ্যার সঙ্গে সম্ভোগে উদ্যত হলে, সন্ধ্যা শিবের দ্বারস্থ হন।[68] শিব

---

[63] *তদেব*, ১৪৬-১৪৭।

[64] *তদেব*, ৫৫।

[65] *তদেব*, ৫৮।

[66] *তদেব*, ৬৩।

[67] *তদেব*, ১৭২।

[68] *তদেব*, ২৭৯।

তাঁকে রক্ষা করেন এবং ব্রহ্মাকে ধিক্কার জানান। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ব্রহ্মাও তাঁর পুত্রবধূ  দক্ষ রাণীর গর্ভে শক্তির স্বরূপ সতীকে প্রদান করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরামর্শে কামদেব ও রতির যৌথ প্রচেষ্টায় ক্রমে শিব ও সতীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার ঘটে। তাঁদের বিবাহ হয়, দক্ষের অমতে। প্রতিশোধ স্পৃহায় দক্ষও শিব ও সতীকে তাঁর যজ্ঞ থেকে বঞ্চিত করেন। পতির অপমানে সতী দেহত্যাগ করেন, এবং দক্ষরাজও শিবের অপর রূপ বীরভদ্রের হাতে পরাজিত হন। শক্তিরূপী সতীর থেকে বিচ্যুত হয়ে শিব পুনরায় তাঁর তপস্বী রূপ ধারণ করেন। তিনি পুনরায় তাঁর ব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করেন, সতী পুর্নজন্ম প্রাপ্ত হয়ে হিমালয় সুতা পার্বতীর সাথে বিবাহের উপলক্ষ্যে।[69] পাবর্তীর সাথে বিবাহের পরে তাঁর মধ্যে ক্রমে গৃহী ও পিতা রূপের বিকাশ ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে শিব পুরাণে ‘শিবের’ অবস্থানের বিবর্তনকে অনুমান করা যায়। প্রাগার্য দেবতা ‘পশুপতি’ কিভাবে ঋকবৈদিক যুগে ‘রুদ্র’ এর সাথে সম্মিলিত হয়ে, শিব পুরাণে বর্ণিত প্রধান দেবতা ‘মহাদেবে’ রূপায়িত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তার ধারণা করা যায়। শিবের রূপের এই জটিল বিবর্তনে তিনি কখনো যোগী রূপ বিরাজিত, আবার কখনো তাঁর ‘জাগতিক’ রূপ প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘শিবের’ ধারণার জটিল তত্ত্ব সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়ে এমনভাবে সামগ্রিক বিষয়ে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে সমগ্র লিঙ্গ ও শ্রেণী নির্বিশেষে তাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়। মঙ্গলকাব্যের যুগে আবার শিবের লৌকিক রূপ, তাঁর পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক পরিসরকে খণ্ডন করে তাঁকে সাধারণ মানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে।

## ২.৩ <u>মঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান</u>

---

[69] *তদেব*, ১৭২-৪৬৯।

মঙ্গলকাব্যে শিবকে A. Sarkar দুটি পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার গবেষণায় শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রধান এবং অপ্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। শিবের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়গুলি হলঃ

১.তপস্বী বা ভিক্ষুক রূপ।
২.গৃহী রূপ।
৩.কৃষক রূপ।
৪.যোদ্ধা রূপ।[70]

আবার শিবের অপ্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়গুলি হলঃ

১. ধূমপানরত।
২.বিলসী।
৩.শিল্পপ্রেমী।
৪.লম্পট বা ব্যাভিচারী।
৫.পর্বত, সর্প ও ষাঁড় কর্তৃক পরিবেষ্টিত।
৬.অলৌকিক ঘটনার প্রতীক।[71]

বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল উপরিউক্ত প্রধান ও অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যতিরেকে, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের সাথে শিবকে সংযুক্ত করা। এছাড়া ‘শিব’কে ‘ ডিসকোর্স’ হিসেবে গ্রহণ করে, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা কিভাবে তাঁকে সামিজিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করছেন, তাও আলোচ্য অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তু। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ‘ মনসামঙ্গল’ ও ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শিবের অবস্থান সুস্পষ্ট। শিব এখানে কখনো স্বামী, কখনো পিতা, আবার আরাধ্য দেবতা। অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তিনি ‘দরিদ্র কৃষক’ সমাজের প্রতিভূ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, উত্তরবঙ্গের সাধারণ

---

[70] A.Sarkar, *Siva In Medieval Indian Literature*, thesis submitted for the D.Phil (Arts) degree of the University of Calcutta, (Calcutta: 1969), 11-15.
[71] *তদেব্।*

কৃষিজীবী সমাজের মধ্যেও শিবের ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়।[72] কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে, তাঁর কৃষিকার্যের প্রতি অনীহা তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করে। মঙ্গলকাব্যে শিবের সংসারে বা গৃহে আর্থিক অনটনের বর্ণনার মাধ্যমে, প্রধানত দরিদ্র কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অসঙ্গতির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে বাংলার 'কৃষককুল' থেকে শিব দেবতার উৎপত্তির কথা জানা যায়।

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস তার প্রবন্ধে শিবকে আবার কোচ উপজাতির কৃষকদের দেবতা হিসাবে উল্লেখ করেন। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম কোচ উপজাতির কৃষকদের সমাজে প্রবেশ করে, কালক্রমে লৌকিক রূপের অন্তর্গত হয়ে 'কৃষি দেবতায়' রূপান্তরিত হন।[73] উত্তরবঙ্গে অবস্থিত দিনাজপুর জেলার কৃষকদের মধ্যে শিবের লৌকিক রূপ আবার 'মহারাজা' নামে খ্যাত।[74] উর্বর বা প্রজননের প্রতীক এই দেবতার মাধ্যমেই, পৌরাণিক শিব ক্রমে লৌকিক দেবতার সাথে সংমিশ্রিত হয়। অপরদিকে এর সাথে আবার ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও সংযুক্ত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করলে শিবের 'মানব' রূপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শিবকে ছত্ররূপে গ্রহণ কর, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে 'শিব' কাল্টের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই প্রধানত মানব শিবের উদ্ভব ঘটে। এখন প্রশ্ন হল, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শ্রেণীভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক ধারণার নিরিখে পুরাণের শিব কিভাবে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং শিবায়নে বর্ণিত হন? দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য অনুযায়ী, শিব সকল বর্ণের আরাধ্য দেবতা।[75] তাঁর ঔরসে এই কারণেই যেমন কার্তিকের জন্ম হয়, তেমনি আবার

---

[72] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'লৌকিক শৈবধর্ম-শিবের গীত-শিবমঙ্গল কাব্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪৩।

[73] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, 'মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ', *তবু একলব্য সময়ের সংলাপঃ মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা,* সনৎকুমার নস্কর ও দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা.), (কলকাতাঃ দিয়া পাবলিকেশন, অক্টোবর ২০১৫), ২৩।

[74] .আশুতোষ ভট্টাচার্য, "লৌকিক শৈবধর্ম-শিবের গীত-শিবমঙ্গল কাব্য", *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪৪।

[75] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮), ১৭০।

তিনি নিম্নবর্ণের দেবী মনসার ও নেতার (নেত্রা) পিতা। বৈদিক সাহিত্য এবং পুরাণে শিবপুত্র গণেশ যদিও তাঁর ঔরসজাত সন্তান নয়। কিন্তু শিবের মানব রূপকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যে গণেশও শিবের ঔরসজাত সন্তান হিসাবে উল্লেখিত। অপরদিকে 'মনসা' ও 'নেতার' জন্মের মাধ্যমে সমাজের নিম্নবর্ণকে শিবপুরাণের শিবের ধারণার মধ্যে পরিবেষ্টিত করা হয়। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণকে এবার পর্যালোচনা করে শিবের অবস্থানকে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' থেকে শিবের চরিত্রকে শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করা যায়। কাব্য অনুযায়ী, শিব ভিক্ষা করে তাঁর পরিবার প্রতিপালন করেন। সাংসারিক জীবনে শিবের 'ভিক্ষুক' রূপ পৌরাণিক 'তপস্বী' বা 'যোগী' রূপের সমতুল্য। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতেও ভিক্ষাবৃত্তি উদার ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। শিবপুরাণে শিবের উল্লেখিত ব্যক্তিত্ব মানবিক সত্তার উর্দ্ধে। তবে, নারায়ণ দেবের কাব্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করায় শিব, চণ্ডী কর্তৃক সমালোচিত। শিবের গৃহে অসচ্ছল আর্থিক অবস্থাকে উল্লেখ করে, প্রধানত তৎকালীন সমাজে দরিদ্র পরিবারের দুরাবস্থাকে উপস্থাপন করা হয় মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে। সংসারে দৈনন্দিন অভাবের কারণে উপবাসী থাকার যন্ত্রণার অভিব্যক্তি চণ্ডীর মাধ্যমে নারায়ণ দেব 'পদ্মাপুরাণ'এ উল্লেখ করেন।

"চণ্ডী বোলে সুন সিব জটিয়া ভাঙ্গর।
****************************
নিত্য উপবাসী কাল জায় বেড়াও ঘরে ঘরে।
দেব হইয়া হেন কর্ম্ম কোন দেবে করে।।
কোপ করি কহে কথা কার্ত্তীকের ইয়াই।
তোমার আর্যাণ্য ধন কড়াটেক নাই।।
আইজ খাইবারে সম্বল নাহি ঘরের ভিতর।
সকলে সামলায়াছে বসয়া বলদ।।
বার বুড়ি ঠেকী পড়ে তের বুড়ি জমা।

নিত্য ২ কুটী দিব জটা ভাঙ্গের গুড়া।।
প্রাতের্ক্কালে সিব ভাঙ্গের গুড়া খাইয়া।
কুচনি পাগল কর সিঙ্গা ডুম্বুরু বাজাইয়া।।"[76]

নারায়ণ দেবের কাব্যের উদ্ধৃত এই উক্তিতে শিব দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য কোনোরকম কর্ম না করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করায় চণ্ডী বিক্ষুব্ধ। তাঁর ক্ষোভের মাধ্যমে কেবলমাত্র সমাজে বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, কর্মের নিরিখেও একই বর্ণের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক ব্যবধানকে অনুধাবন করা যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গলেও উক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অর্থের অভাবে দেবাদিদেবের মাঝির কাছে লাঞ্ছিত হওয়া, সমাজে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। অনুরূপভাবে কাব্য অনুযায়ী তিনি ডোমিনীর কাছেও লাঞ্ছিত।

"পারের কড়ি যদি তুমি নাহি দেও শিব।
ত্রিশূল শিঙ্গা সব বিত্ত কেড়ে তোমার নিব।।
শিঙ্গা কেটে শিব হে আমি গলায় হাড় দিব।
ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া আমি লাঙ্গলে ফাল করিব।।"[77]

উদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে শ্রেণীভিত্তিক বিভাজন, এবং একই শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে অনুমান করা যায়।

দ্বিজ বংশীদাস শিবের ভিক্ষুক রূপকে আবার অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় শিব ভিক্ষুক হলেও উদারমনস্ক এবং আত্মসম্মানে পরিপূর্ণ। পার্বতীর পিতা কর্তৃক প্রদত্ত যৌতুকের প্রতি তাঁর অনীহা উল্লেখিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত পোষণে সাহায্য করে। তিনি যৌতুকে প্রদত্ত হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন তাঁর আর্থিক অভাবের অছিলায়। উল্লেখিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদানের জন্য উক্তিটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয়,

---

[76] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১২৫।
[77] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য ( সং), ( কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির,বৈশাখ ১৩৪২), ১২।

"কেবল ভিক্ষার অন্ন ঘরে নাহি কড়া।
কিমতে পুষিব আমি এই হস্তি ঘোড়া।।
***********************************
যৌতুক দিতে চাহিলে শুন আমি বলি।
ভাঙ্গ থুয়্যা খাইবারে দেও এক ঝুলি।।"[78]

উল্লেখিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে কবি বংশীদাস শিবের ভিক্ষুক রূপকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবৃত করেছেন। তাঁর কাব্যে শিব অর্থ লাভের সুযোগ পেয়েও, তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। মঙ্গলকাব্যের 'শিব' যেহেতু মানবিক সত্তাযুক্ত, শিবের মাধ্যমে কবি তাই সমাজে 'আদর্শ' পুরুষের প্রতিচ্ছবি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এর সাথে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পণপ্রথার বিষয়কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি তাঁর কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করলেও, শিবের নির্লোভী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে এমন এক ধরনের 'পুরুষের' দৃষ্টান্ত উত্থাপন করার চেষ্টা করেন, যে হবে উদারমনস্ক এবং শিবতুল্য। তবে, তার কাব্যে শিবের 'ধূমপানের' উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যে মানবিক সত্তা সম্পন্ন ধূমপানরত শিব প্রধানত নেশাগ্রস্ত পুরুষের প্রতিভূ।

মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের ভিক্ষুক রূপ ঈশ্বর তুল্য হলেও, শিব স্বয়ং গিরিসুতাকে তাঁর অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত করেন।

"ভিক্ষার অনুসারে ভ্রময়ে ঘরে ঘরে
করিয়া ডম্বর বাজনা
দারুণ কর্মগতি ইছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি বিড়ম্বনা।
*************************************
থাকিয়া হরশিরে ভিক্ষুক দেখি তাএ
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে
শুন গো গুণময়ী তোমারে হিত কহি
দরিদ্রে কেহ না আদরে।
*************************************

[78] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮), ৯৫-৯৬।

দরিদ্র পতি যার    বিফল জন্ম তার
দরিদ্রে গুণরাশি নাশে
গৃহিণী হইবে ভিক্ষে    জর্ম যাইবে দুঃখে
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।”[79]

মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে উদ্ধৃত এই উক্তিতে, দরিদ্ররূপী শিবের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত পরিবারের বাস্তবিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। উল্লেখিত উক্তি শেষের দুই পঙ্‌ক্তি অনুযায়ী, দরিদ্ররা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আবার শিবের কণ্ঠ দ্বারা এই উক্তি উদ্ধৃত হওয়ায় সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবধানকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ‘শিবের’ আঙ্গিকে তৎকালীন কবিরা দরিদ্র জীবনের অসহায় পরিস্থিতি এবং সামাজিক অসম্মানের বিষয়কে বর্ণনা করেছেন। রামানন্দ যতি ‘চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে’ আবার দরিদ্র ব্যক্তির সামাজিক স্বীকৃতির অভাবকে ‘দক্ষযজ্ঞ’ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। শিবের আর্থিক অনটনের দরুণ যজ্ঞভাগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। শিবপুরাণে এই বিষয়টিকে যদিও শিবের অনার্য পরিচিতির উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করা হয়। তবে, মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে শিবের অসচ্ছল আর্থিক অবস্থাকেই সেখানে সমালোচনা করা হয়েছে।

রামানন্দ যতির কাব্যে দক্ষ কেবলমাত্র শিবের আর্থিক অবস্থাকেই কটাক্ষ করেননি, কোচ উপজাতিদের গৃহ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের বিষয়কেও তিনি সমালোচনা করেছেন। দক্ষের সমালোচনা অনুযায়ী,

“সিদ্ধি গুট্যা দিবে    শ্মশানে থাকিবে
করিবেক তার সেবা।।
ভিক্ষা কোচ ঘরে    তারা স্নেহ বরে
কত বস আছে তায়।”[80]

---

[79] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১৯।
[80] রামানন্দ যতি, *চণ্ডী মঙ্গল কাব্য,* অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সং.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩), ২৫।

রামানন্দ যতির কাব্য অনুযায়ী সতী দক্ষ রাজার কন্যা, এবং উচ্চ বংশজাত। দক্ষ রাজার কাছে তাঁর বংশের কন্যার ভিখারী বা দরিদ্র শিবের সাথে বিবাহ হওয়া, প্রধানত তাঁর সামাজিক অবমাননার কারণ। শিব ভিক্ষা গ্রহণ করেন আবার কোচ উপজাতিদের গৃহ থেকে। কোচ প্রধানত উত্তরবঙ্গের হিন্দু উপজাতি।[81] উচ্চ বংশের জামাতা হওয়া সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের কোচ উপজাতিদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা, দক্ষ রাজার শিবের প্রতি ক্ষোভের কারণ। মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী শিব সকল বর্ণের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে। 'ভিক্ষা' গ্রহণকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করলে, এর মাধ্যমে শিবের সকল বর্ণের মধ্যে উপাসিত হওয়ার বিষয়কে অনুমান করা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিকে ভিত্তি করে শিবকে সকল বর্ণের দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেন। রামানন্দ যতির কাব্য অনুযায়ী এমন পাত্রের সাথে বিবাহ হওয়ার কারণে দক্ষ রাজা তাঁর কন্যা ও জামাতার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর মাধ্যমে সমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যে যে বিবাহ অসম্ভব, সেই বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া সমাজে অসম বর্ণ বিবাহ যে অসম্ভব তার ধারণাও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমাজে শ্রেণীভিত্তিক এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজনের প্রয়োজনে মঙ্গলকাব্যে শিবের উক্ত জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রায় সমস্ত সংস্করণেই 'শিবের' দরিদ্র জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত বর্তমান। এর মধ্যেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিবের 'বহুবিবাহ'। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও শিবের বহুবিবাহ তৎকালীন সময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কুলীনপ্রথাকে সমর্থন জ্ঞাপন করে। 'শিব' এখানে প্রতীক স্বরূপ। তিনি প্রধানতঃ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির প্রতিভূ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। শিবপুরাণে শিব পত্নীব্রতা, সতীর মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং জাগতিক প্রয়োজনে তিনি

[81] France Bhattacharya & Radha Sharma, "Food Rituals in the Chandi Mangala", *India International Centre Quarterly*, Vol. 12, No. 2, (June 1985): 173.

পুনর্বিবাহ করেন। তবে, তৎকালীন সময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যে শিবের মানবিক সত্তার সাথে পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ সাধন করা হয়। এর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতিরও বর্হিপ্রকাশও স্পষ্ট। এমনকি বহুবিবাহভিত্তিক সমাজে সাংসারিক অশান্তির প্রসঙ্গকে শিবের পরিবারের নিমিত্তে উল্লেখ করা হয়।

বহুবিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নারায়ণ দেবও শিবের একাধিক বিবাহ দেন। সেই সূত্রে তাঁর কাব্যে শিবের স্ত্রী হিসাবে 'গঙ্গা', 'গৌরী', 'চণ্ডী'র নাম উল্লেখিত।[82] গঙ্গা ব্যতিরেকে চণ্ডী, গৌরী, ভবানী, দুর্গাকে দেবীমাহাত্মের অন্তর্গত করে একটি মাত্র নারী চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যেও, শিব কর্তৃক গঙ্গাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার নেপথ্যে অন্য কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতকাদাসের কাব্য অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে যোগ্যানুষ্ঠানের কারণে দেবতাবর্গ চণ্ডীর রাঁধা অন্ন খেতে অপ্রস্তুত হলে, শিব শান্তনু মুণির পত্নী গঙ্গাকে রন্ধনের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন। শান্তনু মুনিও শর্তসাপেক্ষে গঙ্গার গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় নির্ধারণ করে দেন। শিব শর্তানুযায়ী গঙ্গাকে গৃহে পৌঁছে দিতে অসমর্থ হলে মুনি তাঁকে পরিত্যাগ করেন। এর ফলপ্রসূ শিব গঙ্গার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কাব্য অনুযায়ী বহুবিবাহকে শাস্ত্র সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কাবৃত করা হয়েছে। উক্তি অনুযায়ী,

> "শুনিঞা গঙ্গার শাপ দেব মহেশ্বর। মস্তকে রাখিল গঙ্গা জটার ভিতর।।
> শিরে গঙ্গা ধরি হৈল গঙ্গাধর। তপস্যার লাগি গেল সুমেরু-শিখর।।"[83]

গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করার অর্থ হল, তাঁকে স্ত্রী হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করা। কেতকাদাসের কাব্যে চণ্ডী ব্যতিরেকে অপর একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করা, প্রধানত শিবের বহুবিবাহের

[82] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১৫।
[83] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৪।

সমর্থনেই আলোচিত। দ্বিজ বংশীদাস আবার একাধিক বিবাহের কারণে সাংসারিক কলহকে শিবের পরিবারের নিরিখে উল্লেখ করেছেন। সেখানে শিবকে কেন্দ্র তাঁর দুই পত্নীর একে অপরের প্রতি কলঙ্ক লেপন, মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বহুবিবাহের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গঙ্গা ও চণ্ডী উভয়েই শিবের স্ত্রী। তাঁরা একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে সাংসারিক কাঠামো বিনষ্ট হবে। কাব্য অনুযায়ী, শিব তাই তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার প্রচেষ্টা করেন। শিবের এই প্রচেষ্টা লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"ব্যাকুল হইয়া দ্বন্ধ করে দুইজন।
আউদর চুল করি না পিন্দে বসন।।
গঙ্গার কোপেতে হেথা ত্রিলোক টলিল।
একত্রে প্রলয় দেখি জগৎ সকল।।
চণ্ডীর কোপেতে পৃথী না ধরয়ে ভর।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসাগর।।
তাহা দখি মহাদেব ভাবিয়া প্রমাদ।
হাতে ধরি দুইজনে ভাঙ্গিল বিবাদ।।
প্রিয় বাক্য বলি হস্ত গায়ে বুলাইল।
অনেক যতনে শিব দ্বন্ধ নিবারিল।।
তো শুনি দুইওজন শান্ত একেবারে।
খণ্ডিল সকল দুঃখ শিবের আদরে।।
প্রীতি করাইয়া গঙ্গা দুর্গার সহিতে।
পদ্মা আনি সমর্পন কোইল হাতে হাতে।।
ইহা দেখি হরষিত হৈল গঙ্গা কালী।
চণ্ডীর মনের দুঃখ না ঘুচিল কালি।।
গঙ্গা দুর্গা হরষিত খুসী তিনলোক।
মনও দিয়া শুন পদ্মার বিবাহ কৌতুক।।"[84]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তি অনুযায়ী, কলহে রত শিব তার দুই পত্নীকে বিবাদ নিবারণের উপদেশ দেন। এমনকি তিনি নিজেই তাঁদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটান। শিবের

---

[84] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্‌, বৈশাখ ১৩১৮), ১৩৩।

পরিবারিক চিত্রকে তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বাস্তবিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। আলোচ্য অংশে শিবকে কেন্দ্র করেই দুই সতীনের লড়াই প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'শিব'কে সাধারণ 'পুরুষের' প্রেক্ষিতে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে। পরিবারে সতীনদের একত্রে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নৈতিক শিক্ষাও মঙ্গলকাব্যে শিবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। উপরিউক্ত উক্তিতে অপর একটি বিষয়ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাব্য অনুযায়ী আমরা অবগত যে, শিবের কেবলমাত্র দুই পত্নী, 'গঙ্গা' ও 'চণ্ডী'। তবে, কবিতার শেষের ছয়টি চরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করলে 'গঙ্গা' ও 'চণ্ডী' এর সাথে, 'দুর্গা' ও 'কালীর' অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে 'দুর্গা' ও 'কালী' যদিও চণ্ডীর অপর রূপ। তবে, মনসামঙ্গলকাব্যে চণ্ডী ব্যতিরেকে 'পদ্মা' বা 'মনসার' আগমনে অপর দুই রূপের প্রসন্ন মনোভাব তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে। অতএব, দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য অনুযায়ী শিবের একাধিক পত্নীর পরিচয় পাওয়া যায়।

জগজ্জীবনও তাঁর কাব্যে গঙ্গা ব্যতীত শিবের বৃদ্ধ বয়সে দুর্গাকে বিয়ে করার প্রসঙ্গের উত্থাপন ঘটান। জগজ্জীবনের বর্ণনা অনুযায়ী,

"গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুণমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হৈনু নির্গিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সতিনী।।
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবিধি দ্বন্ধ কাচাল।
****************************
গঙ্গা বোলে কিছু হোক নাহি মোর কুন শোক
কপালের লেখন সতিনী।
করহ বিবাহসাজ বিলম্বের নাহি কাজ
বিভা করি আন শূলাপাণি।।"[85]

---

[85] জগজ্জীবন ঘোষাল, *মনসামঙ্গল*, শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৬০), ৫২।

শিবের বিবাহে গঙ্গার আক্ষেপ উপরিউক্ত উক্তিতে স্পষ্ট। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর আবেগ কখনোই প্রাধান্য পায়নি। মানবসত্তা সমন্বিত ‘শিব’ এর কাছে গঙ্গার আবেগও তাই মূল্যহীন। কারণ ঈশ্বর একাধিক বিবাহ করলে অন্য কোন পুরুষের একাধিক বিবাহে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকেনা। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলোতে তাই শিবেরও একাধিক বিবাহ হয়। মঙ্গলকাব্যগুলো ‘মঙ্গল’ বার্তা বা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্তে রচিত হলেও, এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহ বা কুলীনপ্রথার মতো ‘কুপ্রথা’গুলিকে বৈধ হিসাবে প্রচার করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংস্করণগুলিতে দেবী চণ্ডীর সর্বাত্মক প্রভাব থাকায়, বহুবিবাহ ব্যতীত ‘শিব’কে কেন্দ্র করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির প্রতিফলন সেভাবে লক্ষ্য করা যায়না। তবে, কাব্যের অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে বহুবিবাহের রীতি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা শিবকে যেভাবে তৎকালীন পুরুষের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন, চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা সেভাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করেননি। শিব সেখানে শিবপুরাণের ‘তপস্বী’ রূপেই বিরাজমান। শিবের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া, অন্য কোন প্রসঙ্গে চণ্ডী কর্তৃক শিবের সমালোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়না। চণ্ডীমঙ্গলের সময়কালে বহুবিবাহের প্রাধান্য থাকলেও তার স্বতন্ত্র সামাজিক প্রেক্ষিত রয়েছে। ‘শিবের’ সাথে এর কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায়না।

মনসামঙ্গল কাব্যে কবিরা পুরুষের ব্যাভিচারকে সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ‘ ব্যাভিচারী’ পুরুষ হিসাবে শিবের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। ব্যাভিচারী শিবের আবার নিম্নবর্ণের নারীদের প্রতি যৌনলালসা বর্ণভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত। মঙ্গলকাব্যে শিবের রূপ যেহেতু তৎকালীন ‘ পুরুষ’ এর সমতুল্য, এর মাধ্যমে তাই অনুমান করা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক কাব্যগুলি ‘পুরুষের’ ব্যাভিচারকে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে নারায়ণদেবের কাব্যে ডোমিনীর ছদ্মবেশে চণ্ডীর শিবকে ছলনা করার বিষয়কে উল্লেখ করা যেতে পারে। চণ্ডীর ডোমিনী রূপী ছদ্মবেশকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ শিবের যৌনসঙ্গমের অভিলাষ, মূলতঃ তাঁর ব্যাভিচারী চরিত্রের

প্রতিফলন।[86] মনসামঙ্গলের অন্যান্য সংস্করণগুলিতেও 'ডোমিনী'র ছদ্মবেশ ধারী চণ্ডী ও কামাতুর শিবের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সমাজে পুরুষের বিবাহ বর্হিভূত অবৈধ সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য, ব্যাভিচারী পুরুষের আদলে 'শিবের' চরিত্র নির্মিত হয়েছে।

কেতকাদাসের বিবরণ অনুযায়ী, একদা দেবী ভগবতী 'পাটনি'র ছদ্মবেশে মহেশ্বরকে বিমোহিত করলে, কামাবেগে আপ্লুত ভগবান শিবও ভ্রান্ত ধারণায় বশবর্তী হয়ে তাঁর সাথে যৌন সহবাসে উদ্যত হন। মহেশ্বরের করুন অবস্থায় দেবী তাঁকে একাকী কমলের বনে রেখে অন্তর্হিত হলে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রণয় দৃশ্য তাঁকে আরও বিচলিত করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে পাণিমৈথুনের দরুন তাঁর বীর্য্য পদ্মপাতার নাল বেয়ে গিয়ে পড়ে বাসুকির কোলে। এর ফলপ্রসূই মনসার জন্ম হয়।

"ভগবতী মায়াবিনী নৌকা বাহে জলে। তার রূপ দেখি হর পড়্যা গেল ভোলে।।
একাকিনী সীমন্তিনী জলে বাহে না। ননীর পুথলী তনু কোমল গা।।
*******************************************
সম্বিধান দেহ মোরে পাটনীর ঝি। তুলা আলিঙ্গন বিনে আমি নাঞি জি।।
পাটনী রমণী বল, ভাল জাতি নাশ। তপস্বী হইয়া করো পরস্ত্রীর আশ।।
*********************************************
হর বলে সীমন্তিনী, তবে হই পার। আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার।।
পাটনী রমণী পুন মহেশেরে বলে। হেনকর্ম্ম আমরা না করি কোনকালে।।
জলে নৌকা বাহি মোরা ধর্ম্মের এ খিয়া। হইলে পুণ্যের ভরা যাইব তরিয়া।।"[87]

উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিম্নবর্ণের নারীদের সামাজিক অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। কুলবধূদের যেহেতু গৃহের বাহিরে পাওয়া অসম্ভব, সমাজে তাই পুরুষের লালসাকে চরিতার্থ করার একমাত্র উপঢৌকন হিসাবে নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী নারীদের উল্লেখ,

---

[86] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১৫।
[87] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৫।

কেতকাদাসের কাব্যে পাওয়া যায়। কোন পুরুষ অন্য নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হলে সমাজে তার অখ্যাতি হয়। বিশেষত, নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী নারীর সাথে উচ্চবর্ণের পুরুষের যৌনসঙ্গম তার জাতি নাশের কারণ। তবে, এই কার্যকে যদি 'শিবে'র আঙ্গিকে সিদ্ধ করা যায়, তাহলে সমাজে ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতে পুরষের ব্যাভিচারকে স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত উপরিউক্তি অংশে পাটনির ছদ্মবেশ ধারণকারী চণ্ডী, শিবকে একাধিকবার যৌনসঙ্গম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কামাতুর শিব তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বারংবার যৌনসম্ভোগের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কেতকাদাসের কাব্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকার নৈতিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যও, আলোচ্য পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ নারী গৃহের বাইরে পদার্পণ করলেই তাঁর সামাজিক অবস্থানের অবনতি ঘটবে উপরিউক্ত উক্তিতে তা উল্লেখিত। বিপ্রদাসের কাব্যে আবার শিবের বলপূর্বক যৌনসম্ভোগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"নৌকায় চড়িলা হর বড়ো কুতূহলে।
কতদূরে গিয়া ধরি ডুমুবীর হাতে
আলিঙ্গন দেহ রামা কহে ভূতনাথে।
আমি শূলপাণি তোরে বিনয় আমার
ভজিয়া আমারে কর কামসিন্ধু পার।
**************************
চরণে পড়হু প্রভু কৃপা করো মোরে
হেন ব্যবহার নহে নিষেধি তোমারে।"[৪৪]

তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে কোন নারীর সাথে বলপূর্বক যৌনসম্ভোগ করা সমাজে নিমিত্ত ঘটনা মাত্র। শিবের যৌন সংসর্গের জন্য ডোমিনী ছদ্মবেশ ধারী চণ্ডীকে বলপ্রয়োগ করার বিষয়কে, মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা আবার আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবৃত করেছেন। নিম্নবর্ণের নারীরা যেহেতু অর্থের প্রয়োজনে গৃহের বাহিরে পেশা অবলম্বনে বাধ্য হয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে তাই

---

[৪৪] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসা-বিজয়*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশনার সময়কাল অনুপস্থিত), ১১।

তারা ভোগ্য বস্তু। বিপ্রদাসের 'মনসা-বিজয়'এও এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যের উল্লেখিত উক্তি অনুযায়ী, যৌনসম্ভোগের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব মহাদেব নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী নারী ভেবে ছদ্মবেশী চণ্ডীর হাত চেপে ধরেন। চণ্ডীও এরকম পরিস্থিতিতে নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য একাধিকবার শিবের কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু শিব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। অতএব বলা যায়, শিবকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিম্নশ্রেণীর নারীদের যৌন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের নারীরা নয়, কুলবধূরাও গৃহের বাহিরে বেরোলে বিভিন্ন যৌন হেনস্তার শিকার হবে, তা বেহুলার প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গলের কবিরা বর্ণনা করেন।

দেবাদিদেব শিব বেহুলাকেও কামনা করে তাঁর যৌনতৃষ্ণা নিবৃত্তিকরণের উদ্দেশ্যে। বিষ্ণুপালের কাব্য অনুযায়ী, বেহুলা নিরুপায় হয়ে শিবের কাছে তাঁর স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলে শিব তাঁকে 'শাঁখা', 'সিঁদুর' এবং 'সুন্দর জীবনের' প্রলোভন দেখিয়ে বিবাহ করতে উদ্যত হয়। এর মাধ্যমে পুরুষশাসিত সমাজে বিধবা নারীকে প্রলোভিত করে সম্ভোগ করার বিষয়কে অনুমান করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন,

"বেউলার নির্ত্তে গীতে দশদিগ
মোহিত সকল শিবপুরী।
সংখ বস্ত পরিধান
কি দিব কন্যা তোরে দান
লক্ষী টাকা কন্যার কাচুলি।
বলে রাল্ব সদাশিব তোয় আমায় করি ঘর।
*******************************
রহ রহ কন্যা হেদে সুন্দরী লো
রহ লো আমার শিবপুরে।
শংখ বস্তর দিব হেদে সুন্দরী লো
আর দিব হিঙ্গুলাল খাট।
নানা আভরণ গড়াইঞা দিব লো
স্বর্গের দিএ যে পারিজাত।"[89]

[89] Visnu Pala, *Manasa-Mangala*, Sukumar Sen (ed.), (Kolkata: The Asiatic Society, 1968), 113.

এক্ষেত্রে শিব স্বয়ং শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির প্রতিমূর্তি। মনসামঙ্গলের কবিরা সমস্ত ধরণের উদ্দেশ্য সাধন শিবকে সামনে রেখে সম্পন্ন করেছেন। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের চারিত্রিক অবনমনের কোন উদাহরণ পাওয়া যায়না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যদিও ধনপতির বণিকের চরিত্রের সাথে নানারকম ব্যাভিচার যুক্ত। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা কোনোরকম লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতিতে শিবকে আবদ্ধ করেননি।

মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণে পুরুষের অবৈধ সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে অনীহা সুস্পষ্ট। এমনকি মনসার জন্মের পিছনেও শিবের দায়িত্বহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শিব প্রধানত সমগ্র শ্রেণী এবং বর্ণের ধারক। কার্তিক ও গনেশের মতো ‘মনসা’ ও ‘নেতার’ জন্মের মধ্য দিয়েও তিনি দুই জগতকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে, নেতা ও মনসার জন্মের পর তাঁদের প্রতি দায়িত্বহীন মনোভাব তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতেই উল্লেখিত। মনসার জন্মকে কেন্দ্র করে ‘চণ্ডীর’ সাথে নানারকম বিবাদের ব্যাখাও মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শিবের একাধিক রমণীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণেই নেতা ও মনসার জন্ম। কাব্যে শিবের একাধিক সন্তানের জন্ম যদিও আধ্যাত্মিক মোড়কে আবদ্ধ। এখন প্রশ্ন হল, মঙ্গলকাব্যে শিব মানবিকসত্তা সম্পন্ন হওয়ায়, তাঁর ঔরসে ভূমিষ্ট সন্তান কিভাবে আধ্যাত্মিক ধারণার অন্তর্গত হতে পারে? পিতৃতান্ত্রিক কাব্যগুলি নিম্নবর্ণের দেবদেবীর জন্মের নিরিখে ঈশ্বরিক পরিবেষ্টনী নির্মাণ করে, পুরুষের ব্যাভিচারকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। অতএব, শিবের মনসাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ না করার পিছনে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির সাথে বর্ণভিত্তিক রাজনীতিও বর্তমান। আলোচ্য প্রসঙ্গে গঙ্গা শিবের ব্যাভিচার মেনে নিলেও, চণ্ডীর পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। শিবকে কেন্দ্র করেই তাই ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডীর’ মধ্য বিবাদের সূত্রপাত ঘটে।

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার জন্মের নিরিখে আধ্যাত্মিক অন্তরাল থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ‘মনসা’ যে শিবের ঔরসজাত, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এছাড়া পিতার অবৈধ সম্পর্কের কারণে

কন্যার জন্ম হওয়ায় তাঁর প্রতি সৎ মা চণ্ডীর কঠোর ব্যবহারের নিদর্শনও কাব্যে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্য মনসার জন্মের নিরিখে বিভিন্ন রকমের অন্তরাল নির্মাণ করলেও, শিবায়নে কিন্তু 'মনসার' জন্মের ক্ষেত্রে শিবের অবৈধ সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ণ' থেকে 'মনসা'র জন্ম প্রসঙ্গে বর্ণনা পাওয়া যায়। এর উপর ভিত্তি করে মনসামঙ্গলের কবিদের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করা যেতে পারে। এর সাথে মনসার 'মাতৃনিরপেক্ষ' ও 'অযোনিসম্ভবা' হওয়ার বিষয়কেও পুনরায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাব্য অনুযায়ী,

"মহাদেব মোহিত হইলা পদ্মবনে।
দেখেন কমল ফুল প্রিয়ামুখ সমতুল
পার্ব্বতী স্মরণ হৈল মনে।।ধ্রু।।
.....পুলক হইল গাত্রে ঔরস কমলপাত্রে
নিপাত হইল এক কণা।।৩।।
যেন কাঞ্চনের দ্রব বিদ্যুৎ সমান জব
প্রবেশিল কমলের নালে।
ক্রমে ক্রমে গেল তলে তলাতল রসাতল
মহাতল সপ্তম পাতালে।।
তথায়ে দক্ষের সুতা কদ্রু নামে নাগমাতা
ঋতুস্নান করে যেই জলে।
কৌমোদিকা সেই হ্রদ কবিচন্দ্র রচে পদ
পড়ে বিন্দু কমলের দলে।।৪।।১।।
ঢল ঢল করে বিন্দু যেন ইন্দুকলা।
করে করি গণ্ডুষ করিল দক্ষবালা।।
পরশে পরম সুখ পাইল শরীরে।
সুধা বুদ্ধি করিয়া রাখিল অভ্যন্তরে।
......কৌমোদিকাতটে কন্যা ধূলায় ধূসরী।
দেখিয়া ব্যাকুল যত সখী সহচরী।।
নর্ম্মদা বলেন শুন কদ্রু নাগমাতা।
উদগার করহ তুমি কেন পাও ব্যাথা।
নর্ম্মদার বোলে কন্যা করিল উদগার।

নির্গত হইল যেন ভুজঙ্গ আকার।।'[90]

কমলের বনের সুমধুর পরিবেশে একদা দেবাদিদেব মহাদেব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে সে গৌরীকে স্মরণ করেন। তবে, গৌরী অনুপস্থিতিতে তাঁর বীর্য্য গিয়ে পড়ে কমলের নালে। সেই ঔরস এরপর নাল বেয়ে সপ্তম পাতালে কৌমোদিকা হ্রদে গিয়ে পড়ে। দক্ষবালা বা নাগমাতা কদ্রু কৌমোদিকা হ্রদে ঋতুস্নান করার সময় সেই বীর্য্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়ে পড়েন।[91] এর ফলপ্রসূ সর্পরূপী মনসা জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখিত উক্তির মাধ্যমেই মনসার জন্ম প্রসঙ্গে সন্দেহের সূত্রপাত ঘটে। প্রথমতঃ নাগমাতার ঋতুস্নান।[92] সর্পের ঋতুস্নান বা মাসিকের সম্ভাবনা থাকেনা। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, সপ্তম পাতালে অবস্থিত কদ্রু অবশ্যই নিম্নবর্ণের নারী। উল্লেখিত উক্তিকে ঈশ্বরিক আবরণ মুক্ত করলে ' সপ্তম পাতাল' এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায়। শিবায়ণে ' পাতাল' অর্থে সমাজের নিম্নবর্ণকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আর ঋতুস্নানের সময় অর্থাৎ মাসিকের শেষে সে মহাদেবের সহিত শারীরিক ভাবে মিলিত হয়। কারণ শিবায়নের কাব্যের অংশে দক্ষবালার ' শারীরিক সুখের বিবরণ' পাওয়া যায়।[93] দ্বিতীয়তঃ সেই নারীর 'গর্ভবতী' হওয়ার বর্ণনা এবং তার 'প্রসব বেদনা স্বভাবতই দেবী মনসার যোনিসম্ভবা হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ করে।[94] অতএব, মনসা অবশ্যই শিবের ঔরসজাত জারজ সন্তান। শিবের আদর্শ রূপকে বজায় করার উদ্দেশ্যেই কাব্যে মনসার মাতৃ পরিচয়কে সুকৌশলে গোপন করা হয়েছে।

---

[90] রামকৃষ্ণ রায়, *শিবায়ন,* ( কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,আষাঢ় ১৩৬৩), ১৭৫। পরবর্তীকালে লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের, উইমেনস্ স্টাডিজ সেন্টারের নিউজলেটারের একটি প্রবন্ধে এই উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্পা মণ্ডল, "মনসা'র জন্মবৃত্তান্তে পিতৃতন্ত্রের অন্তরাল", *নিউজলেটার,* উইমেনস্ স্টাডিজ সেন্টার, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, কলকাতা, ভল্যুম্ ৭, (মার্চ ২০১৬), ১৬০।

[91] শিল্পা মণ্ডল, "মনসা'র জন্মবৃত্তান্তে পিতৃতন্ত্রের অন্তরাল", *নিউজলেটার,* উইমেনস্ স্টাডিজ সেন্টার, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, কলকাতা, ভল্যুম্ ৭, (মার্চ ২০১৬), ১৬১।

[92] *তদেব্।*

[93] *তদেব্।*

[94] *তদেব্।*

মনসা ও নেতা যেহেতু শিবের অংশজাত নিম্নবর্ণের কন্যা, তাঁদের জন্মের পর তাই পিতা হিসাবে শিব কোনোরকম দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়নি। এমনকি পারিবারিক অশান্তি নিবৃত্তি করণের জন্য মনসাকে সিজুয়া পর্বতের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মনসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেতাকে তাঁর সহচরী হিসেবে রাখা হয়। এই ক্ষেত্রে উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন,

"বিদায় করিয়া তবে দেব শূলপাণি। হেনকালে জনকেরে বলেন নন্দিনী।।
শুন বাপা পশুপতি নিবেদিব কি। দেবমধ্যে হইল মনসা তোমার ঝি।।
কালিনী সতাই মোর সনে কৈল দ্বন্ধ। নিদর্শন রহে মোর বাম চক্ষু অন্ধ।।
মিছাবাদে করে বাপ-ঝিএর খাঁকার। হাথেক বসন মোরে করিল বেভার।।
সিজবনে বনবাস দিয়া যাও বাপা। নিষ্ঠুর হইলে বাপ মোরে নাঞি কৃপা।।
দারুণ সিজের বনে পথ নাঞি দেখি। কেমনে থাকিব একা কাছে নাঞি সখি।।
*****************************************************
এত শুনি মহাদেব জিজ্ঞাসিল কথা। কেমনে হইলে তুমি আমার দুহিতা।।
নেট বলে যবেতব রজে হৈল ঘর্ম্ম। রজকিনী হইয়া হইল মোর জন্ম।।
এত শুনি মহাদেব তাঁরে দিল বর। সুরপুরে কাচ গিয়া দেবতা-অম্বর।।
মোর কন্যা আছেন মনসা শশীমুখী। তার অনুবৃত্তি করো হয়্যা তার সখী।।"[95]

উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা ও নেতার জন্মের ক্ষেত্রে শিবের নির্লিপ্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর 'নিরাপত্তার' অভাব সম্বন্ধে অবগত হয়েও, তিনি মনসা এবং নেতাকে কোনোরকম সুরক্ষা প্রদান করেননি। তাঁর ঘর্ম থেকে ভূমিষ্ট অপর অবৈধ কন্যা নেতাকেও তিনি সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করেননি। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে, তাঁর দুই অবৈধ সন্তানকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে, সমাজে জারজ সন্তানদের সামাজিক অবস্থানকে বর্ণনা করেছেন। মনসা এবং নেতার জন্মের পিছনে অপর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উভয়েই নিম্নবর্ণের কন্যা হিসাবে চিহ্নিত। এখন প্রশ্ন হল, তাঁদের মধ্যে মনসাই কেন একমাত্র দেবী হিসাবে

---

[95] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২৫-২৭।

স্বীকৃতি লাভ করেন? উল্লেখ করার বিষয় যে, মনসা শিবের ঔরসজাত সন্তান হওয়ায় শিবের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। অবৈধ হলেও তাই মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে সে দেবী হিসাবে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে নেতা জন্ম শিবের ঘর্ম দ্বারা। ‘ঘর্ম’ এখানে সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের পরিচয় বহন করে। নেতার স্থান হয় তাই মনসার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা কাব্যের মাধ্যমে সমাজে শ্রেণীভিত্তিক ব্যবধানকে নির্ণয় করলেও, তারা সম বর্ণের মধ্যে শ্রমের নিরিখে বর্ণভিত্তিক বিভাজনকেও উল্লেখ করেছেন।

মনসার বিবাহের ক্ষেত্রে শিবের নির্লিপ্ত মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জরুৎকারু মুণির বিবাহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কেবলমাত্র পিতৃত্বের দায়িত্ব নিরূপণের জন্য মনসার সাথে বলপূর্ব্বক তাঁর বিবাহ দেন। পরিণামে মনসা চির অসুখী। অনিচ্ছুক স্বামীর সাথে বিবাহের ফলে তাঁর কন্যার কি পরিনাম হতে পারে, সেই প্রসঙ্গে তিনি অনাগ্রহী। অপরদিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা শিবের চরিত্রকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। কাব্য অনুযায়ী, তিনি সংসার ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপালন না করলেও, তাঁর চারিত্রিক অবনতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যেহেতু ‘চণ্ডী’র মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত, তাই সেখানে চণ্ডীর ভূমিকাই সর্বাত্মক। শিবায়ণে আবার ‘শিব’, মনসামঙ্গল কাব্যের শিবের সমতুল্য।

### ২.৪ <u>পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের নামের প্রকারভেদ</u>

বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে পুরাণ, মহাকাব্য ও সর্বোপরি বঙ্গীয় পুরাণে শিবের অবস্থানকে উপরিউক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আরাধ্য শিবদেবতার বিচিত্র নামের বৃহৎমালা কি বৈদিক, পৌরাণিক এবং মঙ্গলকাব্যের শিবের নামের তুলনায় পৃথক? বাংলায় শিব ‘গ্রামদেবতা’ হিসাবেই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তবে, কোন কোন অঞ্চলে তিনি ‘কুলদেবতা’ অথবা ‘লোকদেবতা’ হিসাবেও পরমপ্রিয়। গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবার

শিবকে ঘিরে চড়ক, গাজন এবং নীলের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবও পালিত হয়। মিহির চৌধুরী কামিল্যা প্রধানত রাঢ়ভূমিকে শিবের ভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[96] তার বর্ণনায় শিবের নামের স্থানানুযায়ী প্রভেদকে লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্য এবং পুরাণে শিব 'রুদ্র' নামেই পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি শিব, ঈশান, গিরিশ, ত্রিলোচন, পশুপতি, মহেশ্বর, মহাদেব প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তবে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলভেদে শিবের নামের মধ্যেও আঞ্চলিক প্রভাব স্পষ্ট। মিহির চৌধুরী কামিল্যা শিবের বিভিন্ন নামকে স্থান অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথাঃ 'ঈশ্বর অন্তিক' নাম, 'নাথ' অন্তিক নাম এবং অন্যান্য নাম।[97]

বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের প্রচলিত নামগুলি 'ঈশ্বর অন্তিক' নাম হিসাবে জনপ্রিয়।[98] বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর গ্রামে তিনি 'এক্তেশ্বর'[99] নামে পরিচিত। বাঁকুড়া জেলায় ' এক্তেশ্বরের' উপাসনার পিছনে বিভিন্ন কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়া সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ক্ষুদি মন্বন্তরী নামক একজন রাজা এই গ্রামে উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ভোজনের আয়োজন করেছিলেন বলে, একতার স্মৃতিস্বরূপ এই গ্রামের নাম এক্তেশ্বর। আর এক্তেশর গ্রামের আরাধ্য শিবদেবতা এখানে ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক রূপে উপাসিত।[100] তবে, এক্তেশ্বরের উত্থানের পিছনে অপর একটি কিংবদন্তিও প্রচলিত রয়েছে। কিংবদন্তি আশ্রিত স্থানীয় অনুমান অনুযায়ী, মল্লভূম এবং সামন্তভূমের রাজাদের মধ্যে রাজ্যের সীমানাকে কেন্দ্র করে বিরোধ বাঁধলে, তারা দেবাদিদেব

---

[96] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, 'শিবঠাকুর', *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১২।
[97] *তদেব,* ১১৪।
[98] *তদেব,* ১১৪-১১৬।
[99] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৬।
[100] *তদেব।*

মহাদেবকে দুই সীমানার সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে বিরোধের মীমাংসা করেন।[101] অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, 'এক্তেশ্বর' নামে পরিচিত শিবদেবতা এখানে সকল শ্রেণীর মধ্যে একতা স্থাপনের মাধ্যম। শিবের এই রূপকে কেন্দ্র করেই পুরাণের শিবের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করা যায়। শিবপুরাণেও শিব বিভিন্ন রঙে সকল শ্রেণীর মধ্যে পূজিত। গ্রাম্যদেবতা 'এক্তেশ্বর'ও পুরাণের শিবের জ্ঞানে বাঁকুড়ায় জেলায় বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে উপাসিত। বাঁকুড়া জেলার কারকবেড়িয়াতে তিনি 'কারকেশ্বর'[102] নামে উপাসিত। শিবদেবতার উল্লেখিত রূপ স্থানের নাম অনুসারে নামাঙ্কিত। অনুরূপভাবে বাঁকুড়া অঞ্চলের দেউলপাড়া নামক স্থানে তিনি 'দেউলেশ্বর'[103], হদলনারায়ণপুর নামক স্থানে তিনি 'নারায়ণেশ্বর'[104], পাঁচালে 'পাঁচালেশ্বর'[105], বিল্বেশ্বর নামক স্থানে তিনি 'বিল্বেশ্বর'[106], মৌলবোনা অঞ্চলে তিনি 'মৌলেশ্বর'[107], সারেশ্বর নামক স্থানে তিনি 'সারেশ্বর'[108], বহুলপাড়া গ্রামে 'সিদ্ধেশ্বর'[109] প্রভৃতি নামে জনপ্রিয়। উল্লেখিত এই নামগুলিতে শিবদেবতা বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনো লিঙ্গরূপে, আবার কখনো মূর্তিতে উপাসিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিব এখানে গ্রাম্যদেবতা রূপে পূজিত হলেও, উপাসনার ক্ষেত্রে শিবজ্ঞানেই তিনি বিরাজমান।

বীরভূম জেলায় শিবের নামের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক প্রভাব স্পষ্ট। বীরভূম অঞ্চলের মৌলপুর নামক গ্রামে মৌলেশ্বর[110] শিবের পূজা এবং চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে মৌলেশ্বর শিব

---

[101] *তদেব*, ১০।
[102] *তদেব*, ৩৫।
[103] *তদেব*, ২৫।
[104] *তদেব*।
[105] *তদেব*, ৩৭।
[106] *তদেব*, ৩৯।
[107] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, 'শিবঠাকুর', *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৫।
[108] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৪৫।
[109] *তদেব*।
[110] *তদেব*, ২৪৯।

মন্দিরে অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জনশ্রুতি অনুসারে, মৌলেশ্বর শিবের নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম হয় মৌলপুর।[111] অনুরূপভাবে পুরুষোত্তমপুরের দেউলী গ্রামে তিনি ‘দেউলেশ্বর’[112] নামে পরিচিত। জনশ্রুতি অনুসারে এই অঞ্চলে শিবের দেউলী বা মন্দির থাকার জন্য এই গ্রামের নাম হয় দেউলী।[113] এছাড়া কলেশ্বর গ্রামে তিনি ‘ কলেশ্বর’[114], ভীমগড়ে ‘ ভীমেশ্বর’[115], দাঁড়কাতে ‘দণ্ডকেশ্বর’[116], মৌড়েশ্বরে ‘মৌড়েশ্বর’[117], সাফুলিপুরে ‘সাফুলেশ্বর’[118] প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের ‘ঈশ্বর অন্তিক’ নামের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। এখানে আদরাহাটি নামক স্থানে তিনি ‘ আদালেশ্বর’[119], বর্ধমান জেলার খোসবাগান অঞ্চলে তিনি ‘কণ্ঠেশ্বর’[120], কাংসায় ‘কংসেশ্বর’[121], কালনা অঞ্চলে তিনি ‘কুবেরেশ্বর’[122], বাবলাডিহি অঞ্চলে ‘ন্যাংটেশ্বর’[123], বর্ধমানের আলমগঞ্জে তিনি ‘ বর্ধমানেশ্বর’[124], মানকরে ‘ মল্লিকেশ্বর’[125], বর্ধমানের বিজয়বিহার অঞ্চলে তিনি ‘বিজয়ানন্দেশ্বর’[126] প্রভৃতি নামে খ্যাত।

---

[111] *তদেব্।*

[112] *তদেব্,* ২৭৮

[113] *তদেব্।*

[114] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৫।

[115] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা- পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ২৯০।

[116] *তদেব্,* ৩১৫।

[117] *তদেব্,* ৩৪০।

[118] *তদেব্,* ৩৪৫।

[119] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৫।

[120] *তদেব্।*

[121] *তদেব্।*

[122] *তদেব্।*

[123] *তদেব্।*

[124] *তদেব্।*

[125] *তদেব্।*

[126] *তদেব্।*

হুগলী জেলার মহানাদ নামক গ্রামে শিবদেবতা ‘অগ্নিশ্বর’[127] এবং ‘অখিলেশ্বর’[128] নামে ভূষিত। মহানাদে শিবের এই নামের পিছনে কিংবদন্তি রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই দুই রূপে শিব শক্তির সঙ্গে অভিন্নভাবেই উপাসিত।[129] হুগলীর পোলবা থানার অন্তর্গত দিঘনশ্বর গ্রামে ‘সর্বেশ্বর’[130] শিব জাগ্রত দেবতা হিসাবেই বহুল প্রসিদ্ধ। এছাড়াও পাউনান গ্রামে শ্রীশ্রীটাটেশ্বর[131] নামে শিবলিঙ্গটি জাগ্রত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, কামারপুকুর অঞ্চলে শিবদেবতা ‘ঈশানেশ্বর’[132], কোন্নগরে ‘কল্যানেশ্বর’[133], রতনপুরে ‘কাশীশ্বর’[134], গুড়াপ নামক স্থানে ‘গৌড়েশ্বর’[135], খানাকুলে ‘ঘণ্টেশ্বর’[136], ত্রিবেণীতে ‘চণ্ডীশ্বর’[137] এবং ‘যোগেশ্বর’[138], ফলুইওতে ‘ফুলেশ্বর’[139], গুপ্তিপাড়ায় ‘রামেশ্বর’[140], চুঁচুড়াতে ‘ষণ্ডেশ্বর’[141], মহানন্দে ‘হংসেশ্বর’[142] প্রভৃতি নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর জেলায় শিবের ‘ঈশ্বর অন্তিক’ নাম এবং তার পিছনে বিভিন্ন জনশ্রুতির প্রকারভেদও বিভিন্ন। মেদিনীপুর শহরের কর্ণগড় নামক স্থানে অনাদিলিঙ্গ শিব ‘দণ্ডেশ্বর’[143] এবং

---

[127] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৫১৯।

[128] *তদেব্।*

[129] *তদেব্,* ৫১৮।

[130] *তদেব্,* ৫২২।

[131] *তদেব্,* ৫২৩।

[132] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৬।

[133] *তদেব্।*

[134] *তদেব্।*

[135] *তদেব্।*

[136] *তদেব্।*

[137] *তদেব্।*

[138] *তদেব্।*

[139] *তদেব্।*

[140] *তদেব্।*

[141] *তদেব্।*

[142] *তদেব্।*

[143] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ২৮২-২৮৩।

‘খড়্গেশ্বর’[144] নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, শিবায়ন কাব্যের রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ তার রাজত্বকালে মহামায়ার মন্দিরের পাশে ‘দণ্ডেশ্বর’ শিবের এই মন্দির নির্মাণ করেন।[145] আবার খড়্গেশ্বর শিবের মন্দিরের পিছনে অপর একটি জনশ্রুতি বর্তমান। ‘দণ্ডেশ্বর’ শিব মন্দিরের সংলগ্ন প্রবেশদ্বারে দুই পাশে দুই প্রস্তর নির্মিত বেদী অবস্থিত। কথিত রয়েছে যে, এই দুই বেদীর দক্ষিণ পাশের বেদীর উপর বসে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তার ‘শিবায়ন’ কাব্য রচনা করেন, এবং এর উত্তরদিকের বেদীর উপর ‘খড়্গেশ্বর’ নামক গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।[146] মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত ‘কানা শোল’[147] এবং ‘বালিসাই’[148] নামক গ্রামে আবার জাগ্রত শিবদেবতা ‘ঝাড়েশ্বর’ নামে পূজিত। এখানে একটি সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দিরে ঝাড়েশ্বর নামে জনপ্রিয় শিবমূর্তিটি অবস্থিত। শিবের এই আঞ্চলিক রূপের পিছনে জনশ্রুতি বর্তমান। কিংবদন্তী অনুযায়ী, প্রায় একশ বছর পূর্বে এক জনৈক ব্যক্তি গভীর বন-জঙ্গলের মধ্য থেকে শিবমূর্তিটি উদ্ধার করে নিত্য পূজার প্রচলন করেন। কথিত আছে, সবার অলক্ষ্যে একটি গাভী জঙ্গলে প্রবেশ করে নিয়মিত এই মূর্তিটিকে দুগ্ধ প্রদান করত।[149] তবে, ‘ঝাড়েশ্বর’ শিবমূর্তিটি প্রকৃতপক্ষে কোন লিঙ্গমূর্তি নয়, এটি মূলত রথচক্রের অনুরূপ।[150]

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে বহুলোক রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য শিবের ‘ঝাড়েশ্বর’ রূপের আরাধনা করেন। আবার এই একই থানার অন্তর্গত ‘নেড়া দেউল’ নামক গ্রামের শিবলিঙ্গটি ‘কামেশ্বর’[151] নামে সুপরিচিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী, গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে

---

144 *তদেব্।*
145 *তদেব্।*
146 *তদেব্।*
147 *তদেব্,* ২৮৭।
148 *তদেব্,* ৩৮৯।
149 *তদেব্।*
150 *তদেব্।*
151 *তদেব্,* ২৮৮।

কেশপুর এবং শালবনী গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা অরণ্য পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ করলে, বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, ক্রমে ভূস্বামীতে পরিণত হয়।[152] ভূস্বামী উমাপতি দেবভট্ট এখানে 'কামেশ্বর' নামে খ্যাত শিবদেবতার মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণেই মন্দিরের চূড়াটি অসমাপ্ত থাকে যায়। উল্লেখিত মন্দির বা দেউলের অসমাপ্ত চূড়ার কারণেই এই গ্রামের নাম হয় 'নেড়া দেউল'।[153] কেশপুর থানার 'ধলহরা' গ্রামে 'বটেশ্বর'[154] নামে খ্যাত শিবের উপলক্ষ্যে চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি প্রায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকেই ধলহরা গ্রামে প্রচলিত।[155]

গড়বেতা থানার অন্তর্গত রূপারঘাগরা নামক স্থানে শিবলিঙ্গটি আবার 'ভুবনেশ্বর শিব'[156] নামে খ্যাত। পিংবনী গ্রামে চৈত্রমাসে 'জলেশ্বর'[157] নামে খ্যাত শিবদেবতার রূপকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসব পালিত হয়। একই থানার আমলাশুলী গ্রামে একটি ছোট আকারের শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি 'রামেশ্বর শিব'[158] নামে জনপ্রিয়। ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড নামক গ্রামে এক স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ 'চপলেশ্বর'[159] নামে পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ থানার অন্তর্গত বৈঁচা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি 'বটেশ্বর'[160] শিব নামে পরিচিত। গুণ্ডুত গ্রামে 'রুদ্রেশ্বর' রূপে অবস্থিত শিবকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের শেষ ১১ দিন ধরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[161] খড়িগা গ্রামেও 'খড়োশ্বর' শিবের মন্দির অবস্থিত। কিংবদন্তী অনুযায়ী, বিষ্ণুপুরের রাজা খড়্গামল্লের দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত

---

[152] *তদেব*।
[153] *তদেব*।
[154] *তদেব*, ২৯০।
[155] *তদেব*।
[156] *তদেব*, ২৯৪।
[157] *তদেব*, ২৯৫।
[158] *তদেব*, ২৯৬।
[159] *তদেব*, ৩১০।
[160] *তদেব*, ৩১৩।
[161] *তদেব*।

হওয়ায় এর নাম হয় ‘খড়্গেশ্বর’।[162] পিঙ্গলা থানার ডাঙ্গরা গ্রামের একটি মন্দিরে ‘রুদ্রেশ্বর’[163] নামে খ্যাত শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এছাড়া গোবর্দ্ধনপুরে শিবদেবতা ‘রত্নেশ্বর’[164] নামে জনপ্রিয়। তিলদাগঞ্জ এবং শোলপাটা গ্রামে শিবদেবতা আবার ‘তিলেশ্বর’[165] নামে পরিচিত। তিলেশ্বর শিবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে জনশ্রুতি অনুযায়ী জানা যায় যে, পাণ্ডাবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ গ্রামবাসী কর্তৃক জমি কর্ষণকালে একদা তার কোদালের আঘাতে একটি শিলাখণ্ড থেকে রক্ত নিঃসরণ হতে থাকে। এরপরে তিনি স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন সেই শিলাখণ্ড প্রকৃতপক্ষে শিবের প্রতীক রূপ। এরপর থেকে তিনি সেই শিলাখণ্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করে তাঁর মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করেন।[166] খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বাড়বাঁসি গ্রামে শিবদেবতা পরিচিত ‘বাণেশ্বর’[167] রূপে। কিংবদন্তী অনুযায়ী, কালাপাহাড় বা মুসলমানদের কর্তৃক বাণেশ্বর শিবমন্দিরের চূড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[168] ‘বাণেশ্বর’ রূপ ছাড়াও উল্লেখিত গ্রামে ‘পাঁচলেশ্বর’, ‘রুদ্রেশ্বর’ এবং ‘বটেশ্বর’ নামক তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[169] গোকুলপুর গ্রামে আবার ‘গোকুলেশ্বর’[170] নামে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যায় যে, গ্রামের নাম অনুসারেই দেবতার নামকরণ হয়।

নারায়ণগড়ে তিনি আবার ‘ধলেশ্বর’ ও ‘সিদ্ধেশ্বর’ নামে জনপ্রিয়।[171] অনুরূপভাবে, দেউলী গ্রামে শিবলিঙ্গটি ‘চম্পকেশ্বর’[172], ভদ্রকালী গ্রামে ‘ভদ্রেশ্বর’[173], দাঁতন থানার অন্তর্গত পলাশিয়া গ্রামে

---

[162] *তদেব্*, ৩১৫।
[163] *তদেব্*, ৩১৭।
[164] *তদেব্।*
[165] *তদেব্*, ৩১৮।
[166] *তদেব্*, ৩৪২।
[167] *তদেব্*, ৩২২।
[168] *তদেব্*, ৩২৩।
[169] *তদেব্।*
[170] *তদেব্।*
[171] *তদেব্*, ৩৩১।
[172] *তদেব্*, ৩৩২।

'মুক্তেশ্বর'[174], খণ্ডরুই গ্রামে 'শ্যামলেশ্বর'[175], কেশিয়াড়ী নামক গ্রামে স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গটি 'কাশীশ্বর'[176] নামে পরিচিত। এছাড়াও তলকেশরী পল্লীতে প্রস্তর নির্মিত অপর একটি মন্দিরে 'কপিলেশ্বর'[177] নামক বিখ্যাত শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মির্জাপুর মৌজার অন্তর্গত একটি স্থানে শিবদেবতা 'বিমলেশ্বর'[178] নামে জনপ্রিয়। খেজুরী থানার অন্তর্গত সেরখাঁ চক নামক গ্রামে শিবদেবতা 'প্রতাপেশ্বর'[179], ভগবানপুর থানার অন্তর্গত মাসুড়িয়া গ্রামে শিবলিঙ্গটি 'স্বপ্নেশ্বর'[180], এক্তারপুর গ্রামে 'ক্ষীরেশ্বর'[181], পটাশপুর থানার চন্দনপুর গ্রামে 'চন্দনেশ্বর'[182], ভোগপুর গ্রামে 'চন্দ্রেশ্বর'[183], এবং ময়না নামক স্থানে 'লোকেশ্বর'[184] নামে পরিচিত। 'লোকেশ্বর' শিবের নেপথ্যে কিংবদন্তী বর্তমান। নবম শতাব্দীতে গৌড়রাজ ধর্মপালের রাজত্বকালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়গড়ের সামন্তরাজ ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাঁকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। প্রাণভয়ে কর্ণসেন গৌড়েশ্বর ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করে, তার শ্যালিকা রম্ভাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রম্ভাবতী এবং কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন পরবর্তীকালে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সেখানে 'লোকেশ্বর' শিবকে প্রতিষ্ঠা করেন।[185] মাণিক গাঙ্গুলী এবং ঘনারাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম মঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। চন্দ্রকোনায় শিবদেবতা আবার 'মল্লেশ্বর'[186] নামে

---

173 *তদেব্।*
174 *তদেব্,* ৩৪১।
175 *তদেব্,* ৩৪৩।
176 *তদেব্,* ৩৪৮।
177 *তদেব্।*
178 *তদেব্।*
179 *তদেব্,* ৩৬২।
180 *তদেব্,* ৩৬৮।
181 *তদেব্,* ৩৬৯।
182 *তদেব্,* ৩৭৭।
183 *তদেব্,* ৪০৯।
184 *তদেব্,* ৪১৬।
185 *তদেব্।*
186 *তদেব্,* ৪৪২।

পরিচিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তুর্কি আক্রমণের সময় ইসলাম উপাসকদের অত্যাচার থেকে এই দেবতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মল্লেশ্বরের পূজারীগণ, তাঁকে প্রস্তরাবৃত করে দেন।[187] এরফলে এই দেবতা সুরক্ষিত থাকেন। ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত চন্দ্রি গ্রাম 'চন্দ্রেশ্বর'[188] নামক অনাদিলিঙ্গ শিবের নামেই নামাঙ্কিত। ধানঘোরী গ্রামে শিব পরিচিত আবার 'ধনেশ্বর'[189] নামে। উল্লেখিত নামের মাধ্যমেই অনুমান করা যায় যে, এখানে শিব প্রজনন বা আর্থিক সঙ্গতির প্রতীক। নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত 'দেউলবাড়া' গ্রামে অবস্থিত শিবলিঙ্গটি 'রামেশ্বর'[190] নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[191]

পুরুলিয়া জেলায় শিবদেবতার 'ঈশ্বর অন্তিক' নামগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কেশবেশ্বর', 'জলেশ্বর', ' বুদ্ধেশ্বর', ' সিদ্ধেশ্বর' প্রভৃতি।[192] হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের নামের প্রকারভেদও বিভিন্ন। হাওড়া জেলার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুর গ্রামে 'হটেশ্বর'[193] নামক স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ডোমজুড় থানার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামে শিবলিঙ্গগুলি আবার ' জয়েশ্বর' এবং 'অভয়েশ্বর' নামে খ্যাত।[194] জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই দুই শিবলিঙ্গ প্রায় দেড়শ বছরের প্রাচীন।[195] বাগনান থানার অন্তর্গত পশ্চিম বাইনান নামক গ্রামে শিব 'হট্টেশ্বর'[196] নামে খ্যাত। এছাড়া আমতা

---

187 *তদেব্।*

188 *তদেব্,* ৪৪৯।

189 *তদেব্,* ৪৬৯।

190 *তদেব্,* ৪৭০।

191 *তদেব্।*

192 মিহির চৌধুরী কামিল্যা, 'শিবঠাকুর', *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৬।

193 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৪১৩।

194 *তদেব্,* ৪৩০।

195 *তদেব্।*

196 *তদেব্,* ৪৭৩।

থানার তাজপুর গ্রামে শিবদেবতা ‘ কুলেশ্বর’ এবং ‘ ফুল্লেশ্বর’[197], সোনামুই গ্রামে ‘ চাটকেশ্বর’[198], সমেশ্বর গ্রামে ‘সোমেশ্বর’[199], কাষ্ঠ সাঙ্গড়া গ্রামে ‘রুদ্রেশ্বর’[200] নামে জনপ্রিয়। রুদ্রেশ্বর শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক তাৎপর্য বর্তমান। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ওসমান খাঁ উল্লেখিত গ্রামের রাণী ভবশঙ্করীর রূপের মহিমায় মোহিত হয়ে তাকে অপহরণ করতে উদ্যত হলে, রাণী তাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ওসমান খাঁ’কে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ তিনি এই মন্দির নির্মান করেন।[201] আমতা থানার তাজপুর গ্রামে শিবলিঙ্গটি ‘ ফুল্লেশ্বর’[202] নামে পরিচিত। উদয়নারায়ণপুর থানার রামপুর এবং কানসোনা গ্রামে শিবদেবতা ‘শ্মশানেশ্বর’[203] প্রভৃতি নামে জনপ্রিয়। শিবের উক্ত নামগুলি ব্যতীত রাঢ়ের দুই স্থানে প্রায় ১০৮ অথবা ১০৯ আঞ্চলিক নামবিহীন শিবমন্দির রয়েছে।[204] দুই চব্বিশ পরগণা জেলার কিছু বিখ্যাত শিবের নাম হল যথাক্রমে, গাইঘাটা থানার জলেশ্বর গ্রামে শিলাখণ্ড ‘ জলেশ্বর’[205] শিব নামে, বোলসিদ্ধি গ্রামে ‘ অনাদিশ্বর’, বরাহনগরে ‘ অমৃতেশ্বর’, পানিহাটিতে ‘ কামেশ্বর’, ‘ গিরিশ্বর’, ‘ তারকেশ্বর’ এবং ‘ রাজেশ্বর’, হালিশহরে ‘ নিগমেশ্বর’, গোবিন্দপুরে ‘ গোবিন্দেশ্বর’, সোনারপুরে ‘ ভবানীশ্বর’, শান্তিপুরে ‘ মাধবেশ্বর’ প্রভৃতি নামে বিরাজমান।[206]

---

[197] *তদেব*, ৪৮৮।
[198] *তদেব*, ৪৮৯।
[199] *তদেব।*
[200] *তদেব*, ৪৯০।
[201] *তদেব*, ৪৯২।
[202] *তদেব*, ৪৯৩।
[203] *তদেব*, ৫০৭।
[204] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৬।
[205] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ১৩।
[206] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৭।

রাঢ়বঙ্গ ব্যতীত মালদহ, দিনাজপুর এবং উত্তরবঙ্গে শিবের নামের প্রকারভেদও বিভিন্ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মালদহ জেলার মাণিকচক থানার মথুরাপুর গ্রামের ‘বাণেশ্বর’ শিবলিঙ্গ[207], পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার বালুপাড়া গ্রামের ‘রামেশ্বর’[208] শিবলিঙ্গ, কসবা মহশো গ্রামের ‘ মহেশ্বর’[209], কুচবিহার থানার গোপালপুর গ্রামের ‘ থানেশ্বর’[210]দেব, কুচবিহার জলার শীতলকুচি থানার আবুয়ার পাথর গ্রামের ‘ ক্রোধেশ্বর ভৈরব’[211], ময়নাগুড়ি থানায় ‘ জল্পেশ্বর’[212], জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা থানার জটেশ্বর গ্রামের ‘ জটেশ্বর’[213] শিব, আলিপুরদুয়ার থানার তালেশ্বরগুড়ী গ্রামের ‘ তালেশ্বর’[214] শিব এবং দার্জিলিং জেলার মিরীক থানার তারবান্ধা গ্রামের ‘মঙ্গলেশ্বর’[215] শিবলিঙ্গ বিখ্যাত।

‘ ঈশ্বর অন্তিক’ নাম ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে শিবদেবতার ‘নাথ অন্তিক’ এবং অন্যান্য নামও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ নাথ অন্তিক’ নামগুলি হল যথাক্রমে, বর্ধমান জেলায় শিবদেবতা ‘দীননাথ’, ‘ ভূতনাথ’, ‘ ভোলানাথ’, ‘ সিদ্ধিনাথ’ এবং ‘ ভৈরবনাথ’ নামে পরিচিত।[216] বাঁকুড়া জেলায় পরিচিত ‘ পরেশনাথ’, ‘ বিহারীনাথ’ ও ‘ শম্ভুনাথ’ রূপে।[217] পুরুলিয়াতে তিনি ‘ এড্ডুয়ানাথ’ এবং ‘বিরিঞ্চিনাথ’[218], মেদিনীপুর জেলায় ‘ কামেশ্বরনাথ’, ‘ কালিন্দীনাথ’, ‘ কাশীনাথ’, ‘ গোপীনাথ’ এবং

---

[207] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, প্রথম খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৩৫।
[208] *তদেব*, ৮০।
[209] *তদেব*, ৯৯।
[210] *তদেব*, ১৪৭।
[211] *তদেব*, ১৯৫।
[212] *তদেব*, ২২১।
[213] *তদেব*, ২৩৩।
[214] *তদেব*, ২৪২।
[215] *তদেব*, ২৬৬।
[216] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘শিবঠাকুর’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি*, (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), ১১৭।
[217] *তদেব*।
[218] *তদেব*।

'হেমন্তনাথ'[219], হুগলী জেলায় 'গোটেশ্বরনাথ', 'জটেশ্বরনাথ', 'তারকনাথ', 'বৈদ্যনাথ', 'ভদ্রেশ্বরনাথ' এবং 'ভৈরবনাথ', হাওড়া জেলায় 'কেদারনাথ', 'মণিনাথ', 'রঘুনাথ' এবং 'স্বয়ম্ভুনাথ' নামে পরিচিত।[220] এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শিব পরিচিত 'চৌরঙ্গীনাথ', 'গোরক্ষনাথ', 'বদরিকানাথ', 'বিশ্বনাথ' প্রভৃতি।[221] শিবদেবতার অন্যান্য নামগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল 'অভিরাম', 'কালগতি', 'কালরুদ্র', 'কালঞ্জয়', 'দুয়ারী, প্রভৃতি।[222]

পশ্চিমবঙ্গে শিবঠাকুরের নামের পরিধি উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, বিভিন্ন অঞ্চলে শিবদেবতার সাধনার প্রকৃতি কিরকম? এক্ষেত্রে শিব সাধনার বৈশিষ্ট্যকে চারটি ভাগে বিভাজন করা প্রয়োজনীয়। প্রথমত, শিবের লিঙ্গরূপের আরাধনা, দ্বিতীয়ত, শিবের পৌরাণিক রূপের আরাধনা, তৃতীয়ত, শিবের মধ্যযুগীয় রূপের আরাধনা এবং চতুর্থত, শিবের আঞ্চলিক রূপের আরাধনা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিবলিঙ্গ বা যোনীপট্টভেদকারী লিঙ্গরূপের উপাসনাই বহুল প্রচলিত। এই রূপ শিবের অনার্য রূপ হলেও, বিভিন্ন অঞ্চলে আর্য ও অনার্য নির্বিশেষে শিবিজ্ঞানেই তিনি বিরাজমান। দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, প্রভৃতি পুরাণে শিবের বিভিন্ন রূপ বা তাঁর শারীরিক গঠনের যেরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানেই তাঁকে আরাধনা করা হয়। তৃতীয় রূপে শিব সম্পূর্ণভাবে মানবিক সত্তা সম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি। এই কারণে মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্য' এবং 'শিবায়নেও' তাঁর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় রূপে শিব প্রধানত মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিবের অস্তিত্ব বহন করে। এমনকি গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেই রূপে উপাসিতও হয়। শিব সাধনার সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ আঞ্চলিক স্তরে তিনি পূজিত হন গ্রামদেবতা অথবা কুলদেবতা রূপে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন বিশিষ্ট

[219] *তদেব্।*
[220] *তদেব্।*
[221] *তদেব্।*
[222] *তদেব্।*

ব্যক্তিবর্গ নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তার আরাধ্য দেবতা শিবের মন্দির স্থাপন করেন কোন একটি বিশেষ নামে। অনেকক্ষেত্রে আবার কোন নির্দিষ্ট স্থান বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম অনুসারেও শিবের নামকরণ হয়। অতএব বলা যায়, শিবের সাধনার চতুর্থ ভাগ উল্লেখিত তিনটি ভাগের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। আঞ্চলিক স্তরে শিব প্রত্যক্ষভাবে গ্রামবাংলার জনসাধারণের কাছে একান্ত আপন।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শিবের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ের সাথে শিবকে সংযুক্ত করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের আবার তপস্বী রূপ প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত। শিবের গৃহী জীবন সেখানে তাঁর তপস্বী রূপকে খণ্ডণ করতে পারেনি। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা ‘শিব’কে তৎকালীন সমাজের পুরুষের সমতুল্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শিবের প্রতিচ্ছবির মধ্যেও সেই কারণে শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ‘শিব’ এখানে নিজেই সামাজিক রাজনীতির প্রতিমূর্তি। শিবকে ‘দরিদ্র’, ‘বহুবিবাহে’ তাঁর অবস্থান, তাঁকে ‘ব্যাভিচারী’ এবং ‘দায়িত্বহীন পিতা’ এর প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করার পিছনে, সমাজের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত। প্রধানত শিবকে বৃহৎ প্রেক্ষিতে বিচার করে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলিকে তাঁর অন্তর্গত করা হয়েছে, যার একমাত্র কারণ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা। অন্যদিকে আবার বিভিন্ন অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে শিবের নামের প্রকারভেদের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় তাঁর অস্তিত্বের পৃথক পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের অবস্থানের পিছনে সামাজিক রাজনীতির প্রভাব থাকলেও, গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিব একান্তভাবে গ্রামদেবতা। তবে এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিব আরাধনার ক্ষেত্রে গ্রামবাংলাতেও শ্রেণী ও বর্ণভিত্তিক রাজনীতি বর্তমান।

# তৃতীয় অধ্যায়

## মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাংলার বাণিজ্যপথের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বাংলায় বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হল মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাথমিকভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলে, পঞ্চদশ থেক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে, মাহাত্ম্য প্রচার ব্যতিরেকে এর অন্যান্য বিষয়গুলিকে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য একদিকে যেমন 'মনসা' ও ' চণ্ডী'র বিভিন্ন রূপের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সহযোগিতা করে, অপরদিকে তেমনি শ্রেণীভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে। অনুরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে মধ্যযুগে নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাব্যের মুখ্য চরিত্র যেমন, চন্দ্রধর, ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সওদাগররা সুদূর সিংহলে সপ্তডিঙা ও মধুকর ভাসিয়ে কিভাবে বাণিজ্য করতেন, কাব্যগুলির মাধ্যমে তার কল্পনাশ্রিত চিত্রকে অনুধাবন করা যায়। এছাড়া তাদের বাণিজ্যিক কৌশল এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তাও কাব্যে বর্ণিত।

বাংলার তথা বাঙালির বাণিজ্যের প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বাংলার বাণিজ্য আদৌ বাঙালির বাণিজ্য কিনা তাও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে উল্লেখিত। অনিরুদ্ধ রায় এই প্রসঙ্গে মনে করেন যে, 'বাংলার সওদাগর' এবং 'বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি' সমুদ্রবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, বাংলার বণিকরা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বণিক কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

থেকে যায়।[1] Duarte Barbosa এর বৃত্তান্ত অনুযায়ী বাংলার বণিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান।[2] এরা ছিলেন মূলতঃ আরব, পারস্য এবং আবিসিনিয়া অঞ্চলের লোক।[3] অতএব, বাংলার বণিকের বাস্তবতা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ছাড়াও, স্থান ও সময়ের ভিত্তিতে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে নদী বাণিজ্যপথগুলিকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

## ৩.১ সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নদীপথগুলিকে বিশ্লেষণ করার আগে প্রয়োজন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই অবিভক্ত বাংলার বৈদিশিক বাণিজ্য ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তবে, পাল রাজাদের যুগে তা আরও সুদৃঢ় হয়।[4] সুভাষ সমাজদার আবার মনে করেন যে, অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ পাল রাজাদের সময়কালে চরম রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে বাংলার বাণিজ্য শুধুমাত্র অন্তর্বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[5] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, ধর্মপালের সময়কাল থেকেই অন্তর্দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমে কৃষিলব্ধ ধনে বিবর্তিত হয়ে পড়ে, এবং পরবর্তী পাল যুগে বাংলার সমাজ সম্পূর্ণরূপে কৃষি এবং গৃহশিল্প নির্ভর হয়ে পড়ে।[6] সেন রাজা, বিশেষতঃ বল্লাল সেনের সময়কালে বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের দরুণ বাংলার বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[7]

---

[1] সুশীল চৌধুরী, 'মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,' *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০*, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২২।

[2] Duarte Barbosa, *The book of Durate Barbosa*, Mansel Longworth Dames (trs.), Vol. 2, (London: The Hakluyt Society, 1921), 135-141.

[3] *তদেব্।*

[4] S.M. Imamuddin, "Bengal's Maritime Trade with the Far East Upto the Sultanate period", *The Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXVII, No. 1 (Dacca, 1982): 13.

[5] সুভাষ সমাজদার, *বাণিজ্যে বাঙ্গালী সেকাল ও একাল*, (কলিকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, বৈশাখ ১৩৭২), ৫৮-৬৩।

[6] *তদেব্*, ৬৩।

[7] *তদেব্*, ৬৫।

আবদুল মতলেব শেখ মনে করেন যে, বাংলায় বৈদিশিক বাণিজ্য পাল রাজাদের সময়কালে সুদৃঢ়ভাবে সম্প্রসারিত হয়, এবং সুলতানি আমলে তা উন্নতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়।[8] তিনি মূলতঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বিভিন্ন আঞ্চলিক কবিদের রচনা এবং পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মাধ্যমে নিজের মতামতের সপক্ষে যুক্ত প্রদর্শন করেন। সাহিত্য এবং পর্যটকদের বিবরণীতে অতিরঞ্জনের সমস্যা থাকলেও, মধ্যযুগে বাংলায় চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম যে সুদূর প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার সাথে বৈদিশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই বিষয়টি সন্দেহাতীত।[9]

চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল মেঘনা নদীর প্রবেশপথে এবং অন্যদিকে তা বঙ্গোপসাগরের সাথেও সংযুক্ত ছিল।[10] বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত হওয়ায় দরুণ চট্টগ্রাম বাংলার প্রবেশপথ হিসাবে যেমন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি চীন, সুমাত্রা, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে বাংলার সামুদ্রিক তথা বৈদিশিক বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবেও পরিচিত ছিল।[11] রোমান ভূতত্ত্ববিদ্ Ptolemy চট্টগ্রামকে প্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ বন্দর হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[12] এই অঞ্চলটিতে প্রাচীন বাঙালি বৌদ্ধ সামন্ত ও হরিকেলা সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল।[13] পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি গুপ্ত এবং আরাকানের বৈশালী সাম্রাজ্যের অধীনস্ত ছিল প্রায় সপ্তম শতাব্দী অবধি।[14] এরপর

[8] Abdul Motleb Shaikh, ‘Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal’, *Trade and Commerce in Medieval Bengal (13th – 16th Century A.D),* Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 106.

[9] *তদেব।*

[10] N.K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, (Delhi: 1976), 145-149.

[11] P. C. Bagchi, “Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period”, *Visva Bharati Annals*, Vol. I, (1945): 101-130

[12] R. C. Majumdar, *History of Bengal Hindu Period*, Vol. I, (Dacca: The University of Dacca, 1943), 661-663.

[13] J. W. McCrindle, *Ancient India as Described by Ptolemy*, S. N. Majumdar (ed.), (Calcutta, 1927), 17-18.

[14] Abdul Motleb Shaikh, ‘Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal’, *Trade and Commerce in Medieval Bengal (13th – 16th Century A.D),* Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 106.

নবম থেকে শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মূলতঃ আরব বণিকদের আধিক্য এই বন্দরের উপর লক্ষ্য করা যায়।[15]

চট্টগ্রামের মতোই, সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও ছিল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী, যা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠে।[16] বৌদ্ধ জাতকদের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বণিক ও রাজপুত্রদের জাহাজে সুবর্ণদ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া এবং সুবর্ণদ্বীপ থেকে জাহাজে করে মূল্যবান সামগ্রী আমদানি করার উল্লেখ পাওয়া যায়।[17] Periplus of the Erythraean Sea নামক প্রাচীন গ্রন্থে, Fa Hien এবং Xuanzang এর মতো চীনা পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তাম্রলিপ্ত নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[18] পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর করমণ্ডল উপকূল থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অবধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল।[19] কিন্তু একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এই বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পায়, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বন্দর সেই স্থান দখল করে।[20]

বিভিন্ন পর্যটক যেমন, Ibn Battuta, Tome Pires, Duarte Barbosa, Caesar Frederick এবং Ralph Fitch এর বিবরণে অনুরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তবে, তাদের বৃত্তান্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিনিময় বাণিজ্যের সামগ্রীর বিস্তারিত তথ্য ব্যতিরেকে, বিশেষ কিছু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়না। বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যটকদের তাদের বিবরণীতে বাংলার বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন, সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। আবদুল মতলেব শেখের মতে,

---

15 *তদেব্।*

16 সুশীল চৌধুরী, 'মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,' *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০*, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২৩।

17 R.C. Majumdar, *The History and Culture of Indian People*, Vol. IV, (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1965), 41.

18 S.M. Imamuddin, "Bengal's Maritime Trade with the Far East Upto the Sultanate period", *The Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXVII, No. 1 (Dacca, 1982): 11.

19 *তদেব*, ১২।

20 সুভাষ সমাজদার, *বাণিজ্যে বাঙ্গালী সেকাল ও একাল*, (কলিকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, বৈশাখ ১৩৭২), ৬৯-৮২।

কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে বৈদিশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল প্রথমত, বাংলার উৎকৃষ্ট পণ্যসামগ্রী, দ্বিতীয়ত, বাংলার নদী ও সমুদ্রপথের সুগম অবস্থান, যা বাংলাকে বৈদিশিক বাণিজ্যে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল, এবং তৃতীয়ত, সুলতানি শাসনের পূর্বে বাংলার বৈদিশিক ক্ষেত্রে বিনিময় বাণিজ্য প্রথা এবং আভ্যন্তরীণ বা স্থানীয় বাজারের ক্ষেত্রে কড়িকে লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।[21] তুর্কি শাসনের পরবর্তীকালে বাংলায় নতুন মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয়, এবং এরফলে বৈদিশিক বাণিজ্য তথা জলপথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।[22]

Barbosa এর বর্ণনা অনুযায়ী এইসময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ বাংলার সাথে যুক্ত ছিল। প্রথমটি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বার্মার উপকূল হয়ে রামরি দ্বীপ, আরাকান, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা, পাটনি, ত্রেঙ্গেনু এবং চম্পা হয়ে চীন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[23] দ্বিতীয় বাণিজ্যপথটি আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উড়িষ্যার উপকূল হয়ে করমণ্ডল উপকূল বরাবর কয়াল ও কাট্টান দুর্গের উপর দিয়ে সিংহল, মালাবার উপকূল হয়ে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের মধ্যে দিয়ে আরব এবং আবিসিনিয়া ও লোহিত সাগর থেকে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[24] এই বাণিজ্যপথকে কেন্দ্র করে আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বণিকরা ছাড়াও চীন ও অন্যান্য সুদূর প্রাচ্যের বণিকদের বাংলায় পণ্য বোঝাই করে বাণিজ্য করার প্রসঙ্গটি Barbosa তার বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন।[25] এই সমস্ত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুতি ও রেশম বস্ত্র, চিনি এমনকি ক্রীতদাসও,

---

[21] Abdul Motleb Shaikh, 'Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal', *Trade and Commerce in Medieval Bengal (13th – 16th Century A.D),* Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 107.

[22] S.M. Imamuddin, "Bengal's Maritime Trade with the Far East Upto the Sultanate period", *The Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXVII, No. 1 (Dacca, 1982): 12.

[23] Duarte Barbosa, *The book of Durate Barbosa*, Mansel Longworth Dames (trs.), Vol. 2, (London: The Hakluyt Society, 1921), 135-147.

[24] *তদেব্।*

[25] *তদেব্।*

যাদেরকে করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, সুমাত্রা, সিংহল, মালাক্কা ও পেগুর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হত।[26] অনুরূপভাবে ইতালীয় পর্যটক ভারথেমো বাংলায় সুতি বস্ত্র, চিনি, আদা, খাদ্যশস্য প্রভৃতির আধিক্যের জন্য, বাংলাকে বিশ্বের সর্বাধিক অর্থবান দেশ হিসাবে আখ্যা প্রদান করেছেন।[27] এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা থেকে সেইসময় সুতী ও রেশম বস্ত্র তুর্কি, সিরিয়া, পারস্য, আরব, ইথিওপিয়া ও ভারতের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি করা হত।[28] পর্যটক M. Caesar Frederick ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে[29] সাতগাঁও-এ এসে অনুরূপ বৃত্তান্ত প্রদান করেন। তার বৃত্তান্ত অনুযায়ী, সাতগাঁও থেকে প্রতি বছর ৩৫টি জাহাজ চাল, বস্ত্র, লাক্ষ্যা, চিনি, মরিচ প্রভৃতি সামগ্রী নিয়ে বিদেশে রওনা দিত।[30] Vasco da Gama আবার বাংলায় চাল গম ও বস্ত্রের সম্ভার ছাড়াও বিপুল রূপোর ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করেছেন।[31] সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা সুশীল চৌধুরীও তার গ্রন্থে প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আধার করে তিনি তার বক্তব্য প্রদান করেন। তার ধারণা অনুযায়ী সপ্তগ্রাম বন্দর এতোটাই সুপ্রসিদ্ধ যে, সেখানে বাইরের সওদাগরারাই বাণিজ্য করতে আসে।[32] সপ্তগ্রামের বণিকদের বাণিজ্যের জন্য অন্য কোথাও যেতে হয়না।[33]

বাংলার সাথে যেহেতু চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তাই বহু চীনা রাষ্ট্রদূত এবং পর্যটক মধ্যযুগে ভারতে আসেন। চীনা পর্যটক যথাঃ Fei Xin এবং Ma Huan উল্লেখিত সময়ে ভারতে আসেন

---

26 *তদেব*, ১৪৫।

27 Abdul Motleb Shaikh, ‘Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal’, Trade and Commerce in Medieval Bengal ($13^{th}$ – $16^{th}$ Century A.D), Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 108-110.

28 *তদেব।*

29 *তদেব।*

30 *তদেব।*

31 S.M. Imamuddin, “Bengal’s Maritime Trade with the Far East Upto the Sultanate period”, The Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XXVII, No. 1 (Dacca, 1982): 13.

32 সুশীল চৌধুরী, ‘মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,’ *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০*, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২৩।

33 *তদেব।*

এবং বাংলার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করেন।[34] তাদের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, বাংলার ধনসম্পদের পরিমাণ ছিল জাভার ঐশ্বর্যের সমতুল্য।[35] Ma Huan এর বিবরণী অনুযায়ী, বাঙালি বণিকদের বাণিজ্যতরীগুলি আকার আয়তনে যেমন ছিল বিশাল, তেমনি তারা সংখ্যাতেও ছিল অধিক। বাংলার সুলতানেরা যে পরিমাণ উপঢৌকন চীনে পাঠাতেন তার মাধ্যমে সুলতানদের বৈদিশিক বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণকে অনুধাবন করা যায়।[36] চীন থেকে বহু সামগ্রী এইসময় বাংলায় আসত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রূপো, রেশম, পোর্সেলিন, তামা, লোহা, সিঁদুর, পারদ প্রভৃতি, এবং বাংলা থেকে চীনে রপ্তানি হত মসলিন, মুক্তা, দামী পাথর, ঘোড়া, সোনা ও রূপার কাজ করা ঘোড়ার জিন, সুতির কাপড়, মখমল, পশমের বস্ত্র, চিনি, গোলমরিচ প্রভৃতি।[37] সুতিবস্ত্র ও চিনি মূলতঃ এই দুই পণ্য চীনে রপ্তানি করা হত। Simon Digby যদিও মনে করেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে বাংলায় বৃহৎ পরিমাণে সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হতনা।[38] উল্লেখিত পণ্য সামগ্রী ছাড়াও মরিচ ও ঘোড়াও চীনে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল অন্যতম। Ibn Battuta, Barbosa, Marco Polo প্রমুখের বর্ণনায় বাংলায় ক্রীতদাস বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[39]

বাংলার সাথে মালাক্কারও দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। উক্ত বাণিজ্যপথের মধ্যে মালাক্কা ছিল বাণিজ্যিক আমদানি ও রপ্তানির অন্যতম ক্ষেত্র। পারস্য, আরব ও ভারতীয় বণিকদের ব্যবসার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় মালাক্কা ক্রমে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। Tome Pires এর মতে, অন্যান্য স্থানের বণিকদের মতো বাঙালি বণিকরাও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মালাক্কার উপর নির্ভরশীল

---

[34] Haraprasad Ray, *Trade and Diplomacy In India-China Relations: A Study of Bengal during the Fifteenth Century*,(New Delhi: Radiant Publishers, 1993), 61-73.

[35] *তদেব্।*

[36] P. C. Bagchi, “Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period”, *Visva Bharati Annals*, Vol. I, (1945): 113-123.

[37] *তদেব্*, ১১৫-১১৬।

[38] Simon Digby, ‘The Maritime Trade of India,’ *The Cambridge Economic History of India: C. 1200- 1750*, Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (ed.), Vol-I, (Delhi: Cambridge University Press, 1984), 142.

[39] Abdul Motleb Shaikh, ‘Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal’, *Trade and Commerce in Medieval Bengal (13th – 16th Century A.D)*, Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 109.

হয়ে পড়ে।[40] তিনি আরও বলেন যে, বাংলা থেকে প্রতি বছর চার থেকে পাঁচটি বড় জাহাজ বস্ত্র বোঝাই করে সরাসরি মালাক্কায় আসত এবং চড়া দামে তাদের বস্ত্র সেখানে বিক্রি করত।[41] শুধুমাত্র মালাক্কায় নয় বাংলার বস্ত্রের চাহিদা পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।[42] এছাড়াও তিনি বলেছেন যে, বাংলা, করমণ্ডল এবং গুজরাট থেকে আসা পণ্যের আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ ক্রসাডোস, এবং ভারতীয় বণিকদের থেকে প্রায় ৩০,০০০ ক্রসাডোস শুল্ক হিসাবে আদায় করা হত।[43] Tome Pires এর মতে, মালাক্কায় অন্তত এক হাজার গুজরাটি ও চার হাজার বাঙালি ও আরব বণিক বাণিজ্য করতেন আসতেন।[44]

বাংলার সঙ্গে পারস্যেরও বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল। হুগলী বন্দরের মাধ্যমে চিনি, বস্ত্র, সালফেট, খাদ্যদ্রব্য, লোহা ও আফিম বাংলা থেকে পারস্যে রপ্তানি করা হত।[45] এছাড়াও পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সাথে বাণিজ্য বাংলার হুগলী বন্দরের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়েছিল।[46] ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে এক পর্তুগিজ নাবিক বাঙালি বণিকদের সুদূর বোখারা পর্যন্ত বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[47] ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পর্যটক Anthony Jenkins তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বোখারাতে বাঙালি বণিকের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন।[48]

---

[40] Armando Cortesao (trns.), *The Suma Oriental of Tome Pires 1512-1515*, Vol. I, (London: The Hakluyt Society, 1944), 142-143.

[41] *তদেব*, ১১১-১১২।

[42] *তদেব*।

[43] *তদেব*, ৯২-৯৩।

[44] *তদেব*।

[45] Abdul Motleb Shaikh, 'Growth and Development of Trade and Commerce in Bengal', *Trade and Commerce in Medieval Bengal (13$^{th}$ – 16$^{th}$ Century A.D)*, Thesis submitted for the award of degree of Doctor of Philosophy in History, Centre of Advanced Study, (Aligarh: Aligarh Muslim University, Department of History, 2019), 112-114.

[46] *তদেব*।

[47] *তদেব*।

[48] J.J.A Campos, *History of The Portuguese in Bengal*, (Patna: Janaki Prakashan, 1979), 30-31.

উক্ত বিবৃতির মাধ্যমে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলার সাথে ভারতীয় উপকূল, সুদূর প্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সাথে গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাংলার বন্দরগুলির উপর গুজরাটি, আরব ও পারস্য দেশের বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বাংলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল চাল, গম, চিনি, সুতী ও রেশম বস্ত্র, মরিচ, ও অন্যান্য মশলা প্রভৃতি। অন্যদিকে বিদেশ থেকে সোনা, রূপা, তামা, চন্দনকাঠ, কর্পূর, দামী পাথর, শঙ্খ, কড়ি, আফিম, কার্পেট, ঘোড়া, ক্রীতদাস প্রভৃতি বাংলায় আমদানি করা হত। এই সমস্ত বাণিজ্যিক দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষত সোনা ও রূপার আমদানির কারণে বাংলা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার বৈদিশিক বাণিজ্যের আধিপত্য ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে ক্রমে হ্রাস পায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈদিশিক বাণিজ্যের বেশিরভাগই আরব ও পারস্য দেশের বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই এই বাণিজ্যের অধিকাংশই পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে।[49] এই সকল বণিকেরা প্রধানত বলপ্রয়োগ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভারতীয় বাণিজ্য বন্দরগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের শেষের দিকে ইউরোপীয় বণিকরা তাদের দক্ষ ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করে সুদূর এশিয়ার বাণিজ্যপথগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। এরফলে বাংলার নৌবাণিজ্য ক্রমে পর্তুগীজদের হস্তগত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে পর্তুগীজ বণিকরা গোয়া ও মালাক্কার মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি নিজেদের দখলে এনে সেখানে কারখানা ও কুঠি নির্মাণ করে। ১৫৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে তারা কুঠী নির্মাণ করেন।[50] শুধু তাই নয়, ষোড়শ শতকের শেষভাগে এশীয় বণিকদের অনেক বেশী হারে শুল্ক দিতে হত। অতএব অনুমান করা যায় যে, বাংলায় ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক

---

[49] *তদেব্*, ১৩-১৪।

[50] *তদেব্।*

শক্তির ক্রমবিকাশে ভারতীয়, বিশেষত বাংলার বণিকদের বাণিজ্য বন্দরে অবস্থান সীমিত হয়ে পড়ে। এরপর আবার বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের পতন ঘটলে, ক্রমে হুগলী বন্দরকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায়।[51] ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সময়কালে ওলন্দাজদের আগমনে হুগলী, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় ওলন্দাজ কুঠি নির্মিত হয়।[52] Francois Bernier এর মতে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ওলন্দাজরা কাশিমবাজার কারখানাতে ৭০০ থেকে ৮০০ রেশমের তাঁতী নিযুক্ত করেছিলেন।[53] এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যায় যে, ইউরোপীয় বণিকদের পূর্বে আরব এবং অন্যান্য বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন ঘটলেও, ইউরোপীয় বণিকদের কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঔপনিবেশবাদকে কায়েম করা। এরপর পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের আগমনে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

### ৩.২ অঞ্চল ও কালভেদে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাণিজ্যিক পথের বিবরণ

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার বাণিজ্যপথকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক উপাদান হল মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কাব্যের নায়কেরা যথাঃ চন্দ্রধর, ধনপতি এবং শ্রীমন্ত বণিক কোন পথে দক্ষিণ পাটন বা সিংহলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন, তা বর্তমান আলোচনার মূল উপজীব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবিদের আলোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কল্পনাশ্রিত। তবে, তাদের বর্ণনার মাধ্যমে সওদাগররা কাব্যে ঠিক কোন পথে বাণিজ্য করছে তার একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম দিকের কবি হলেন নারায়ণ দেব। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতানুসারে, নারায়ণ দেব রাঢ় বঙ্গ থেকে এসে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনস্ত তড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণায় বোরগ্রামে বসতি

---

[51] সুভাষ সমাজদার, *বাণিজ্যে বাঙ্গালী সেকাল ও একাল*, (কলিকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, বৈশাখ ১৩৭২), ১২৫।

[52] *তদেব*, ১২৬।

[53] *তদেব*।

স্থাপন করেন।[54] অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর এই কবি চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্যপথকে যে পূর্ববঙ্গ বরাবর নির্ধারণ করবেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ দেব কর্তৃক গৃহীত যাত্রাপথের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন,

"প্রথমে এড়ায় ডিঙ্গার ঠাট রাজপুরে চকিঘাট
আপন রায্য সিমাদহ এড়ায়।
ভবানিপুর কামনাড়া ময়নাবাশু অন্তরিপাড়া
মৈধ্যে ২ মঞ্জিল গোঞয়।।
বাহিল গডিয়ার থানা ফরমান করিল মানা
হাট ঘাট বাজার সহর।।
সোলসত গাববে বায় আকাসে উড়িয়া যায়
রাতারাতি মহিন্দ্র নগর।।
দেবনদি পরিহরি বহিয়া পড়ে সুরেশ্বরি
গঙ্গা দেখি হরসিত হৈল।
*************************
চুনাখালির গঙ্গার ঘাট বারয় কোসেব পুণ্যঘাট
গঙ্গা যথা উত্তরবাহিনী।
হাড়িয়াকান্দা ববতবব ত্রিভগা মনোহর
সেত গঙ্গা যাব মিঠা পানি।।
ত্রিপিণী দিয়া ভাটী সপ্তগ্রাম কুমারহাটী
রাত্রি দিনে বহিয়া এড়ায়।
মঞ্জিল গউল করি রন্ধন ভোজন করি
ভাটিয়ালে নাওড়া বাওয়ায়।।
চালক্ষেত দিয়া ভাটী মুলাজোড়া দক্ষিণহাটী
বেতকোণা সুন্দর নগর।
শ্রীজগন্নাথে বচে পাসড়ি মনসা আছে
চৌর্দয় ডিঙ্গা চলে মঞ্চেস্বর।।"[55]

[54] অর্ণব ঘোষ, 'মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা', *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২*, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৬।

[55] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১৫৯-১৬০।

নারায়ণ দেবের বর্ণনা অনুযায়ী, চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্যতরী প্রথমে রাজপুরের চকিঘাট, তারপর সিমাদহ, ভবানীপুর, কামনাড়া, ময়নাবাগু, কস্তুরিপাড়া, তারপর গড়িয়া থানা এবং এর অন্তর্গত হাট, বাজার ও শহর অতিক্রম করে দেবনদী ছেড়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। এরপর চুনাখালিতে গঙ্গার উত্তর বাহিনী গতিপথ ধরে হাড়িয়াকান্ধা, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, মূলাজোড়, বেত্রকোনা ও তারপর সুন্দর নগরে এসে পৌঁছায়। এখন প্রশ্ন হল, নারায়ণ দেবের প্রদত্ত নদীপথের বাস্তবতা কোথায়? এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, নারায়ণ দেবের এই গতিপথ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কল্পনাশ্রিত। তবে, বিবরণে প্রদত্ত কিছু জায়গার নাম অনুযায়ী কবির সেই স্থানগুলির সম্পর্কে ধারণা থাকার বিষয়ে অনুমান করা যায়। প্রথমেই আসি দেবনদীর বিষয়ে। নারায়ণ দেবের কাব্যে উল্লেখিত যে, তিনি দেবনদী পরিহার করে গঙ্গায় এসে পড়েন। তাহলে দেবনদীকে প্রকৃত অর্থে 'দেবতার নদী' হিসাবে অনুমান করা যাতে পারে। অর্ণব ঘোষ তার প্রবন্ধে 'দেবনদী'কে দামোদর নদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[56] তার মতানুসারে বণিকদের যাত্রাপথে ভৌগলিক কারণে দামোদর নদের অবস্থান থাকা স্বাভাবিক। এরপর আবার ত্রিবেণী অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমেরও উল্লেখ উপরিউক্ত কাব্যাংশে বর্তমান। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রায় সব সংস্করণগুলিতে 'ত্রিবেণী' সঙ্গমের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি নারায়ণ দেব হয়তো তৎকালীন বণিকদের বাণিজ্যপথে এই স্থানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে তার রচনায় এর উল্লেখ করেছেন। এরপর আসা যাক, সপ্তগ্রামের প্রসঙ্গে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকে বাণিজ্য নগরী হিসাবে সপ্তগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।[57] সেই সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি নারায়ণ দেবের কাব্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়।[58] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারায়ণ দেব গঙ্গার কোন গতিপথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন? অর্ণব ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন যে, গঙ্গার যে উপনদীটি ধরে

---

[56] অর্ণব ঘোষ, 'মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা', *ইতিহাস অনুসন্ধান* ৩২, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৬।

[57] সুশীল চৌধুরী, 'মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,' *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০*, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২২।

[58] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ২৫৬।

চন্দ্রধর বণিক অগ্রসর হয়েছেন, তা প্রধানত পূর্ববাহিনী।[59] তবে, উপরিউক্ত উক্তিতে কবি চুনাখালির গঙ্গার উত্তরবাহিনী নদীপথ ধরে বণিক বাণিজ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন, সেই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। নারায়ণ দেব চাঁদ সওদাগরের যাত্রাপথে মধ্যে কিছু 'দহ' বা হ্রদের উল্লেখ করেছেন। ভৌগলিক ক্ষেত্রে এই 'দহ'গুলির কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। তবে, আক্ষরিক অর্থে দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে যদি স্থানগুলির অবস্থানকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে কাব্যে এর গুরুত্বকে অনুধাবন করা যাবে। নারায়ণ দেব বেত্রকোণা থেকে শুরু সাগরদহ অবধি যে যাত্রাপথের কাল্পনিক বিবরণ প্রদান করেছেন তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

"চৈদ্দ ডিঙ্গা লইয়া সাধু বাণিজ্যেত জায়।
প্রিথিবির নদ নদী বাহিয়া এড়ায়।।
হেকাদহ বেকাদহ আর কুচিয়ামোড়া।
রাম লক্ষণ দুই দহ এড়াইল মালজোড়া।।
নানা দহ বাহিয়া জায় আনন্দিত মন।
জোকাদহে পড়ে গিয়া নাএর পাটন।।
************************
চুন পাইয়া ডিঙ্গা জোকে এড়িল তখন।
************************
জোকাদহের জোক জত সন্ধানে মারিয়া।
নানা দহ বাহিয়া জায় আনন্দ করিয়া।।
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিল তখন।
কাকড়দহে পড়ে ডিঙ্গা নাএর পাটন।।
************************
নানা দহ বাহিয়া জায় হরসিত মন।
কড়িয়াদহে পড়ে গিয়া নায়ের পাটন।।
কড়ি দেখি চন্দ্রধর হরিস অন্তরে
নায়েত গড়ন গড়ে সুনাই কামারে।।
হাসিতে হাসিতে তবে বোলে অধিকারী।
লোহার ডাইড় গড়ী দেও কড়ি বন্ধি করি।।
**************************
চৈর্দ্দ ডিঙ্গা লইয়া চান্দো বাহিয়া জায় ঝাঁটী।
বোলে চালে এড়াইল দুর্জয় সিংহের ঘাটী।।

[59] অর্ণব ঘোষ, 'মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা', *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২*, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৬।

হরিপুর এড়াইয়া পাইল মহিন্দ্র নগর।।
সোবন্যের সিবলিঙ্গ দেখিয়া সদাগরে।
**************************
ভাবানিপুর দেখিলেক সোবন্যের পার্ব্বতি।
তাহারে পুজিল তবে চান্দো বুর্দ্ধিমতি।।"[60]

সাগরদহে পৌঁছানোর আগে চন্দ্রধর বণিক বিভিন্ন 'দহ' অথবা 'হ্রদ' পেরিয়ে অগ্রসর হন। এদের মধ্যে অন্যতম হল, হেকাদহ, বেকাদহ, কুচিয়ামোড়া, মালজোড়া, জোকাদহ, কাকড়দহ, কড়িদহ, দুর্জয় সিংহের ঘাটী, হরিপুর, মহিন্দ্র নগর, ভবানীপুর, এবং তারপর সাগরদহ। নারায়ণ দেবের কাব্যে উল্লেখিত 'দহ'গুলির কোন ভৌগলিক প্রমাণ পাওয়া যায়না। তাহলে নারায়ণ দেব কেন এইরকম হ্রদের নামের উল্লেখ করেছেন? এর উত্তর স্বরূপ বলা প্রয়োজন যে, নারায়ণ দেব সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই 'দহ'গুলির দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে আবার উক্ত হ্রদগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মুনাফার সাথে জড়িত। উদাহরণ হিসাবে, 'কড়িদহে'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিতে 'কড়িদহ' চন্দ্রধর বণিকের বিপুল পরিমাণে কড়ি সংগ্রহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতি নয়, অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লাভের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে কবি 'দহ'গুলির উদাহরণ প্রদান করেন। এছাড়াও সাগরদহের নদীপথ যেহেতু সুন্দরবনের গতিপথ ধরে প্রবাহিত হয়, তাই অনুমান করা যেতে পারে কবি সেইসব অঞ্চলের তৎকালীন আঞ্চলিক নামকে অনুসরণ করেছেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নামকে কেন্দ্র করেও সেই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখিত 'দুর্জয় সিংহের ঘাটী'র কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আক্ষরিক অর্থে দুর্জয় সিংহের ঘাটী বলতে 'দুর্জয়' নামক কোন ব্যক্তির নামও অনুসারে সেই অঞ্চলের নামকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরোক্ষভাবে বিচার

[60] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১৬০-১৬১।

করলে সেই অঞ্চলে সিংহের প্রাদুর্ভাবকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, ভৌগলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে নারায়ণ দেব বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নামকে কেন্দ্র করে কল্পনা মিশ্রিত একটি বাণিজ্যপথের বিবরণ প্রদান করেছেন।

নারায়ণ দেবের মতো প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্তও বিভিন্ন 'দহে'র অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে[61] রচিত বিজয়গুপ্তের কাব্যে নদীপথের কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়না। তবে, বিজয়গুপ্ত হ্রদ বা 'দহ'গুলির যে বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা একদিকে যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে, অপরদিকে তেমনি এর মাধ্যমে বিভিন্ন দহ থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের কাব্যে চন্দ্রধর বণিক চোদ্দ ডিঙ্গা ও মধুকরের মাধ্যমে ঠিক কোন 'দহ'গুলি অতিক্রম করলেন, এই প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়,

"একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা চালাইল সত্বর।
ডিঙ্গা চালান করে সাধু গঙ্গাসাগর।।
*************************
গহন সমুদ্রে যাইয়া পাই সওদাগর।
সমূদ্রের ঢেউ লাগে দেখি লাগে ডর।।
চান্দ বলে ভাই সব না কর বিষাদ।
সাহস করিয়া আজি তরিব প্রমাদ।।
এতেক বলিয়া ভাসে সমুদ্রের ভিতর।
মালিমে ডাকিয়ে বলে শুন সদাগর।।
জোকের থানা এই সমুদ্র মাঝার।
চাপিয়া রাখিল নৌকা নহে আগুসার।।
************************
ঔষধ ফেলাইয়া দেখ কোনোরূপ হয়।
ক্ষার চূর্ণ মিশাইয়া ফেলাও ত্বরায়।।
************************
সমুদ্র বাহিয়া যায় চান্দ সদাগরে।।
এক বাঁক হইতে সাধু আর বাঁক যায়।

[61] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ২৬৪।

মালিমা ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।।
শঙ্খ সমুদ্রে আছে বুঝিলাম সন্ধান।
*************************
চান্দর নফর দনা জানে নানা সন্ধি।
লোহার চাই পাতিয়া শঙ্খ করে বন্দী
*************************
এইরূপে চলে যায় হরষিত মন।
মধ্য গাঙ্গে এক পুরী দেখিল তখন।।
দূরে থাকি দেখে তাহা চান্দ সদাগর।
কার পুরী দেখি এই সমুদ্র ভিতর।।
কেহ বলে ডাকাইতে ভাত রান্ধি খায়।
কেহ বলে রাজা বুঝি জলকর লয়।।
*************************
এক বাঁক হইতে ডিঙ্গা চলে দিয়া জয়।
কুম্ভীরে সমুদ্রে গিয়া বাহিয়া কুলায়।।
*************************
তীর গোলা মারিলেক কুম্ভীর উপর।
তীর গোলা খাইয়া কুম্ভীর হইল তল।।"[62]

বিজয়গুপ্তের কাব্যের উদ্ধৃত কাব্যাংশটির প্রথম দুই সারিতে বণিকের তরী গঙ্গাসাগর পাড়ি দিয়ে যে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট। এরপর তার চোদ্দ ডিঙ্গা ও মধুকর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে প্রথমে জোকদহ, তারপর শঙ্খদহের মধ্যে দিয়ে ক্রমে জলদস্যুদের ঘাঁটী অতিক্রম করে কুমীর দহে গিয়ে পৌঁছায়। নারায়ণ দেবের মতোই বিজয়গুপ্তের বর্ণনাতেও 'দহ'গুলির ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাথে মুনাফাজনক অবস্থানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, শঙ্খদহ থেকে তার শঙ্খ সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, নারায়ণ দেব 'কড়িদহে'র যে উদাহরণ প্রদান করেছিলেন, তা বিজয়গুপ্তের কাব্যে পাওয়া যায়না। এর মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে যে, উভয় কবিই দুই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পদ 'কড়ি' ও 'শঙ্খে'র উল্লেখ করেছেন কেবলমাত্র বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কল্পনাকে কেন্দ্র করেই। এই কারণে জলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে উভয় কবির

[62] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল*, শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ১২৪-১২৬।

কল্পনাতে সামান্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। এরপর গঙ্গাসাগরে অবস্থানকালে চন্দ্রধর বণিক জাহাজের প্রধান নাবিকের কাছ থেকে চর্তুদিকের বাণিজ্য নগরীগুলির সম্পর্কে অবগত হন। নাবিকের কাছ থেকে সওদাগর উত্তরদিকে রাজা মুক্তীশ্বরের কথা জানতে পারেন। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এই রাজার কোন বিবরণ পাওয়া না গেলেও, মুক্তীশ্বরের রাজত্বে তার দেশের লোকেদের 'মরিচের অন্ন'[63] খাওয়ার উক্তির মাধ্যমে, বঙ্গোপসাগরের উত্তরদিকের রাজত্বে মশলা বাণিজ্যের সমৃদ্ধিকে অনুমান করা যায়। এরপর সওদাগর পূর্ব্ব দেশের রাজা বিদ্যাসঙ্গের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন।[64] নাবিকের বর্ণনা অনুযায়ী সেই দেশের লোকেরা বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সেখানে সকল জাতির নারীরা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, এবং দেশের সকল মানুষের জন্য একই রকম নিয়ম নির্ধারিত। নাবিক এই দেশের সকল লোকেদের দুরাচারী হিসাবে গণ্য করেছেন।[65] প্রধান নাবিক এরপর বণিককে গঙ্গাসাগরের পশ্চিমদিকের দেশ সম্পর্কে অবগত করে। তার ধারণা অনুযায়ী পশ্চিম দেশের মানুষ বর্বর প্রজাতির।[66] সেখানে হিন্দু ব্রাহ্মণের কোন চিহ্ন নেই, এমনকি ভট্টাচার্য্য পদবীধারী ব্যক্তিও কৃষিকাজ করে।[67] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখানে নারীদের বিবাহ হয় ষোল বছর বয়সে।[68] বিজয়গুপ্তের কাব্যে মালিমে[69] বা প্রধান নাবিক প্রদত্ত বর্ণনা একদিকে যেমন কবিতার মাধ্যমে বাণিজ্যপথগুলির কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা প্রদান করে, অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চন্দ্রধর বণিকের দেশের সামাজিক নিয়মের সাথে পূর্ব এবং পশ্চিম দেশের সামাজিক নিয়ম ভিন্ন হওয়ায় কবি সেইসব দেশকে দুরাচারী বা বর্বর দেশ হিসাবে

---

[63] *তদেব*, ১২৬।

[64] *তদেব*।

[65] *তদেব*।

[66] *তদেব*, ১২৭।

[67] *তদেব*।

[68] *তদেব*।

[69] *তদেব*, ১২৪।

চিহ্নিত করেছেন। দক্ষিণ পাটন অর্থাৎ রাজা বিক্রমকেশরের দেশকে নাবিক খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

"দক্ষিণ পাটনের কথা শুন সদাগর।
অবোধ নগরে সেই পরম সুন্দর।।
সেই দেশের রাজার কথা শুন সদাগর।
রাজার নাম তথা বিক্রমকেশর।।
সে দেশের লোক অতি বড় ধনী।
ভেলায় করিয়া রাখে মাণিক্য দোহারী।।
অমাবস্যার পর তিথি আসে পৌর্ণমাসী।
ঢেউতে নিয়া শঙ্খ মুক্তা তোলে রাশি রাশি।।
হাট কুড়াইয়া খায় হাটরিয়া কাঙ্গাল।
পাটিতে করিয়া শুকায় মুকুতা প্রবাল।।
এতেক শুনিয়া সাধুর আনন্দিত মন।
নিশ্চয় কহিল যাব দক্ষিণ পাটন।।"[70]

উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ পাটনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে অনুমান করা যায়। এরসাথে নগরীতে মূল্যবান পাথর তথা শঙ্খ, মুক্তো, প্রবালের প্রাচুর্যের বিবরণও উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখিত। অতএব, দক্ষিণ পাটন ব্যবসার জন্য যে উপযুক্ত তা উল্লেখিত উক্তির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যেও মধ্যযুগের বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বারাসাত[71] অঞ্চলের বাসিন্দা বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে[72] তার কাব্য রচনা করেন। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্য থেকে নদী বাণিজ্যপথের বিবরণ পাওয়া যায়, তা মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিদের তুলনায় অনুপুঙ্খ। রামেশ্বর ঘাট থেকে বণিক তার বাণিজ্যযাত্রা

---

[70] *তদেব,* ১২৭-১২৮।

[71] অর্ণব ঘোষ, 'মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা', *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২,* কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৭।

[72] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসামঙ্গল,* অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.), (কলকাতাঃ রত্নাবলী,এপ্রিল ২০০২), ১৩৪।

শুরু করে দক্ষিণ পাটন অবধি পৌঁছান। বিপ্রদাসের রচিত নদী বাণিজ্যপথকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করলে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। বিপ্রদাসের কাব্য অনুযায়ী,

"রাজঘাট রামেশ্বর বাহিয়া এড়ায়
ধর্মখান বাহিয়া অজয় নদী পায়।
উজবনি বাহিয়া হইল উপনীত
শিবা-নদী সাড়াই বাহিল ত্বরান্বিত।
উজনি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্র-ঘাটে
ইন্দ্র-চরণ পূজে সেই নদী-তটে।
ইন্দ্রানী বাহিয়া নদিয়ায় উপনীত
**********************
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে
ফুলিয়া বাহিয়া হাতিকান্দা উপনীতে।
গুপ্তিপাড়া বাহিয়া সিঙ্গারপুর আইসে
ত্রিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে।।
বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
*********************************************
দেখিয়া ত্রিবেণী গাঙ্গ চাঁদো রাজা মনে রঙ্গ
কূলেতে চাপায় মধূকর
*********************************************
দিন দুই তথা রহি মিলিত বুহিত
কুমারহট্ট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত।
ডাহিনে হুগলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকীনাড়া।
মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।
চাপদানির ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।
পূজিল নিমাই-তীর্থ করিয়া উত্তম।
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম।
চানক বাহিয়া যায় বুড়িনিয়ার দেশ।
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।
খড়দহে শ্রীপাটে কড়িয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।
রিসিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুকচর।
পশ্চিমে রহিষে রাজা বাহে কোননগর।

ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।
**********************
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা
নিশিদিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।
পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।
***********************
কালিঘাটে চাঁদো রাজা কালিকা পূজিয়া
চুরাঘাট বাহি যায় জয়ধ্বনি দিয়া।
*************************
বাহিয়া বারুইপুর মহাকোলাহলে।
*************************
নেট লইয়া বিষহরি     মনে অনুমান করি
প্রবেশিলা কালিদহ-কূলে
*************************
হুলিয়ার গঙ্গে বাহি চলিল তুরিত
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত।
তীর্থকার্য চাঁদো রাজা করিল তথায়
বদরিকা কুণ্ডে জল লইল নৌকায়।
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয়াগড়
শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়।
*********************
সঙ্কেতমাধবে পুজে হইয়া একমন
তীর্থকার্য্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ।”[73]

পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাসের কাব্যে চন্দ্রধর বণিক আদি গঙ্গার গতিপথ ধরেই গঙ্গাসাগর অবধি পাড়ি দিয়েছেন। বিপ্রদাসে বর্ণনা অনুযায়ী বণিক রাজঘাট রামেশ্বর থেকে যাত্রা শুরু করে ধর্মখাল বেয়ে অজয় নদী অবধি পৌঁছান। তারপর সেখান থেকে উজবনি শিবা নদী বেয়ে কাটোয়ায় এসে পৌঁছায়। কাটোয়া থেকে ইন্দ্রানি নদী বেয়ে চন্দ্রধর বণিকের সপ্তডিঙ্গা ও মধুকর নদিয়ায় উপনীত হয়। এরপর ফুলিয়া, হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, সিঙ্গারপুর পার হয়ে ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছায়।

---

[73] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসাবিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশনার সময়কাল অনুপস্থিত), ১৪২-১৪৬।

এর মাঝে বিপ্রদাস প্রথমে ত্রিবেণীর পরে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করলেও, নিজ ভুল শুধরে তিনি আবার সপ্তগ্রামকে ত্রিবেণীর পূর্বেই উপস্থাপন করেছেন। এরপর তার বাণিজ্য জাহাজ ক্রমে কুমারহট্ট, ডানে হুগলি, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরা, পূর্বে কাঁকীনাড়া, মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার হয়ে ক্রমে দেগঙ্গাতে প্রবেশ করেন। দেগঙ্গার পর নিমাইতীর্থ, যা বর্তমানে ‘বৈদ্যবাটী’[74] নামে পরিচিত, হয়ে চানক, মাহেশ, খড়দহ, ডানে রিষড়া, বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্ননগর, ডানে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আঁড়িয়াদহ, পশ্চিমে ঘুসুড়ি, চিতপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাট, বারুইপুর হয়ে কালিদহতে এসে পৌঁছায়। কালিদহ পেরিয়ে ছত্রভোগ হয়ে বণিক বদরিকা কুণ্ড, হাথিয়াগড় হয়ে গঙ্গার শতমুখে এসে পৌঁছান। এখান থেকে সওদাগর মূলত বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেন।

এখন প্রশ্ন হল ‘কালিদহে’র অবস্থান গঙ্গার প্রাচীন গতিপথের ঠিক কোন অঞ্চলে? উক্তি অনুযায়ী এর অবস্থান বারুইপুর এবং ছত্রভোগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। রীলা মুখার্জীর মতানুসারে, ‘কালিদহ’ বলতে বৃহৎ হ্রদকে বোঝায়।[75] তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে সুদক্ষিণা পত্রিকায় এই বিষয়ে তথ্য প্রমাণ সহযোগে বিবরণ প্রদান করেছেন। তার মতানুযায়ী, বারুইপুরের পুরনো বাজার থেকে দক্ষিণের কুলপি রোডের পূর্বদিকে ধবধবি ও সূর্যপুর স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে কালিদহ ও শিঙ্গাদহ নামে দুটি মজে যাওয়া খালের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[76] এই দুই খালের পশ্চিম পার্শ্বে আদি গঙ্গা থেকে নির্গত হয়ে চাঁদখালি নামক একটি স্থানের মধ্য দিয়ে এই স্রোত দুটি পরস্পর সমান্তরাল অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে বিস্তৃত ছিল। মনসামঙ্গলে বর্ণিত কালিদহে চম্পক নগরের বণিকের বাণিজ্যতরী এই স্থানে নিমজ্জিত হয় বলে তিনি

---

[74] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, (কলিকাতাঃ বুক এম্পোরিয়াম, মাঘ ১৩৫৬), ৯৩।

[75] Rila Mukherjee (ed.), ‘Introduction’, *Pelagic Passageways: The Northen Bay of Bengal Before Colonialism*, (Delhi: Primus Books, 2011), 123.

[76] অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, *দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণ রায়*, (কলিকাতাঃ দে বুক স্টোর, অক্টোবর ২০০৫), ২৫।

মনে করেন।[77] কৃষ্ণকালী মণ্ডল অনুরূপভাবে বলেছেন যে, এই অঞ্চলেই অবস্থিত ‘চাঁদের খালি’ নামক স্থানটিকে কালিদহের পরবর্তীকালের নাম হিসাবে উল্লেখিত।[78] গঙ্গার শতমুখে বা সাগর সঙ্গমে পৌঁছানোর পর বণিক সেখান থেকে বিভিন্ন কাল্পনিক দহ এবং দেশ যথা কিরাতের দেশ, এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ, হাদিয়াদহ, জোকাদহ, সর্পদহ, কড়িয়াদহ, শঙ্খদহ, মনসাদহ, সিংহদহ অতিক্রম করে অনুপাম পাটন বা দক্ষিণ পাটনে উপনীত হন।[79] নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের মতো বিপ্রদাস পিপিলাইও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থানকে উল্লেখিত দহগুলির মাধ্যমে চিহ্নিত করেন। তবে, নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের কাব্যের মতো বিপ্রদাস পিপিলাইও কড়িদহ ও শঙ্খদহের বাণিজ্যিক গুরুত্বকে তার কাব্যের মাধ্যমে উল্লেখ করেন।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চন্দ্রধর বণিকের যাত্রাপথের সুস্পষ্ট ভৌগলিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, তিনি যে কামারহাটি থেকে নিজের যাত্রা শুরু করেন তা কাব্যে উল্লেখিত। উক্ত প্রসঙ্গে একটি পঙ্ক্তির উল্লেখ করলে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

‘‘নিজ রাজ্য ছাড়াইল হাস্য পরিহাসে।
ছাড়ায় কামারহাটী আঁখির নিমেষে।।
মধ্যনগর কুল দক্ষিণে থুইয়া।
দুর্জ্জয় প্রতাপগড় ছারায় বাহিয়া।।
ছাড়ায়্যা গোপালপুর রামনগর।
বাহিয়া আসিয়া পড়ে কালীদ সাগর।।
ডাইনে গন্ধর্ব্বপুর বামে বীরাঙ্গনা।
কামেশ্বর বায়্যা যায় মন্দারের থানা।।
পিচলতা বামে রাখি যায় তাড়াতাড়ি।
সম্মুখে নগর দেখে রাম বিষ্ণুপুরী।।
***********************

[77] *তদেব্।*
[78] কৃষ্ণকালী মণ্ডল, *প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর,* (বারুইপুরঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, ২০০৩), ৬৭।
[79] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসাবিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশনার সময়কাল অনুপস্থিত), ১৪৬।

সাগর সঙ্গমে এই গঙ্গা শতমুখী।
শিবের বাঁকে চৌদ্দ ডিঙ্গা রহিলেক ঠেকি
************************
সাগর সঙ্গম দেখি    চন্দ্রধর বলে ডাকি,'
শুনহ পণ্ডিত শুভঙ্কর।
****************************
কপিল মুনির তপোবনে।"[80]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চন্দ্রবণিকের বাণিজ্যতরী তার বসতভূমি থেকে কামারহাটি অবধি কোন কোন অঞ্চল পেরিয়ে এসেছে, তার কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে, কামারহাটি থেকে দক্ষিণে মধ্যনগর কূলে দুর্জ্জয় প্রতাপগড়ের স্থান পেরিয়ে ক্রমে গোপালপুর ও রামনগর হয়ে কালীদ সাগর বা কালিদহে এসে উপনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বংশীদাসের বণিকের বাণিজ্যপথ আদিগঙ্গার গতিপথ ধরেই কালিদহে এসে পৌঁছায়। কাব্যে যদিও এর কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে, কামারহাটি নামক স্থান যেহেতু আদিগঙ্গার গতিপথের মধ্যেই পড়ে তাই অনুমান করা যতে পারে, তিনি উক্ত গতিপথকেই তার অবলম্বন করেছেন। এরপর গোপালপুর, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি হয় বংশীদাসের গতিপথের আঞ্চলিক নাম, অথবা বংশীদাস প্রদত্ত কাল্পনিক নাম। কালিদহের পর আরও কিছু স্থানীয় অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমনঃ ডানে গন্ধর্ব্বপুর, বামে বীরাঙ্গনা, তারপর কামেশ্বর, মন্দার, পিচলতা, বিষ্ণুপুরী এবং তারপর সাগর সঙ্গমে এসে পৌঁছান।

সাগর সঙ্গমে উপনীত হয়ে তিনি কপিল মুণির আশ্রম দেখেন। এর মাধ্যমে কবির ভৌগলিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও, 'কপিল মুণি'র আশ্রমের উল্লেখকে কেন্দ্র করে তার ধর্মীয় স্থান সম্বন্ধে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তা অনুমান করা যায়। বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণ পাটন যাওয়ার পথে

---

[80] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮), ৩২০-৩২২।

বংশীদাস ডানদিকে কলিঙ্গ[81] রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছে। এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে, কবির কাব্যে বঙ্গোপসাগরের যে সামুদ্রিক পথকে কেন্দ্র করে বণিকের তরী দক্ষিণ পাটনে যায়, তা নিশ্চয় কলিঙ্গ শহরের ডানদিক দিয়ে প্রবাহিত। এরপর মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলির মতো বংশীদাসের সংস্করণেও কাঁকড়া দহ, জোঁক দহ ও কুমীর দহের বিবরণ পাওয়া যায়।[82] কিন্তু অন্যান্য সংস্করণগুলির মতো কড়িদহ ও শঙ্খদহের উল্লেখ পাওয়া যায়না। কবি হয়তো বাণিজ্যিক মুনাফার প্রসঙ্গে ততোটা ওয়াকিবহাল ছিলেননা। তবে, তিনি সিংহল আসার আগে ‘ সেতুবন্ধের’[83] উল্লেখ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি যে চন্দ্রধর বণিককে বিভিন্ন কাল্পনিক পথের মাধ্যমে সিংহলে পৌঁছে দিয়েছেন, তা কাব্যে সেতুবন্ধের উপস্থিতির মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ[84] নাগাদ রচিত তার ‘ মনসামঙ্গল’ কাব্যে চন্দ্রধর বণিকের গতিপথকে বর্ণনা করেছেন। তার কাব্যে বণিকের যাত্রাপথ ঠিক এইরকম,

“সদাগর বাহে ডিঙ্গা শুভক্ষণ বেলা। প্রথমে বাহিল সাধু ঘাট চাঁপাতলা।
চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গার ঠাকুর। নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর।।
বুদ্ধের কাণ্ডার বাহে বাঁকা দামোদর। বর্দ্ধমান এড়াইয়া চলিল সত্বর।।
আল গঙ্গাপুরখান পশ্চাত করিয়া, তবে গেল সদাগর দেপুর বাহিয়া।।
নোয়াদা বাহিয়া সাধু পাইল গিয়া কেজা। বুহিত্রে করিল সাধু মহেশের পূজা।।
সদাগর বলে ঝাট করি বাহ ডিঙ্গা। গোদাবেন্যা এড়াইয়া বাজাইল শিঙ্গা।।
জগাতি কুকুরঘাটা পশ্চাত করিয়া। সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাধু বাহে শিয়ালিয়া।।
বোদাল্যা জাগাল্যা বাহে নাহি অবসান। বাহে নারিকেলডাঙ্গা দেবীর বিশ্রাম।।
বৈদ্যপুর সদাগর বাহে শীঘ্রগরি। গরলপুর দিয়া ডিঙ্গা পাইল ভাগীরথী।।
ত্রিপিনীতে কহে সাধু গঙ্গার কাহিনী। ক্ষেমানন্দ বলে রক্ষ ঈশান-নন্দিনী।।”[85]

---

[81] *তদেব*, ৩২৩।
[82] *তদেব*, ৩২৯-৩৩০।
[83] *তদেব*, ৩৩১।
[84] অর্ণব ঘোষ, ‘ মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা’, *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২*, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৯।

[85] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল*, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২২৪।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্যতরী প্রথমে চাঁপাতলা, নবখণ্ড হয়ে বাঁকা দামোদর বেয়ে বর্ধমান এড়িয়ে গঙ্গাপুর, দেপুর, নোয়াদা, কেজা, গোদাবেন্যা, জগাতি কুকুরঘাটা, শিয়ালিয়া, বোদাল্যা, জাগাল্যা, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গরলপুর হয়ে সোজা ভাগীরথী নদী হয়ে ত্রিবেণীতে গিয়ে পৌঁছান। এখানে চাঁপাতলা থেকে ত্রিবেণী অবধি বর্ণিত চাঁদ সওদাগরের গঙ্গায় পৌঁছানোর পথ বাঁকা দামোদর হয়েই প্রবাহিত। নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুসারে, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দে বর্ণিত বাণিজ্যপথের শাখাটি মূলতঃ " বাঁকা দামোদরের" মাধ্যমেই প্রবাহিত। এছাড়া এই বাঁকা দামোদরের তীরে যেসব স্থানের ব্যাখ্যা কেতকাদাস করেছেন যেমনঃ "কুঝাটি বা ওঝাটি, গোবিন্দপুর, গাংপুর, দে-পুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গহরপুর" সবই দক্ষিণবাহী প্রবাহপথের অন্তর্গত, যা একসময় সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ ছিল।[86] Joao de Barros এর নক্‌শাতেও এর অনুরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। Joao de Barros এর বর্ণনা অনুযায়ী, "বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদর যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ।"[87] নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুসারে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে এবং Joao de Barros এর নক্‌শা অনুযায়ী উল্লেখিত পথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীন পথ।[88]

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, " ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, দামোদর নদের গতিপথ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৫৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দামোদরের গতিপথে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মূল কারণ দামোদরের নদীখাতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ ও

---

[86] নীহাররঞ্জন রায়, *বাংলার নদনদী*, (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), ১৯-২০।

[87] *তদেব*, ১৯।

[88] *তদেব*।

বন্যা।......... ১৫৫০ সালে প্রকাশিত ‘দ্য বারোসের’ মানচিত্রে দেখা গেছে, দামোদর নদের মূল প্রবাহ কানা দামোদরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। অথচ, পরে ১৬৪০ সালে অধিকাংশ জলই প্রবাহিত হচ্ছে গাঙ্গুর ও বেহুলার খাত দিয়ে। পরে কালনার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু দামোদরের এই প্রবাহ পথ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৬৬০ সালের বন্যায় দামোদরের জল আমতার খাত দিয়ে বইতে শুরু করেছে এবং হুগলির সঙ্গে মিলিত হয়েছে ফলতার কাছে”।[89] অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, কেতকাদাসের তার কাব্যের নায়ককে যে পথে ত্রিবেণীতে পাঠিয়েছেন তা মূলতঃ দামোদর নদীর দক্ষিণবাহী প্রবাহপথের অন্তর্গত। এরপর ত্রিবেণী থেকে শুরু করে দক্ষিণ পাটন অবধি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে পথের বিবরণ প্রদান করেছেন, তার বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়,

“বাহ বাহ বলি সাধু কহে ঘনে ঘন। প্রভাতে ত্রিবেণী বায়্যা করিল গমন।।
নবহট্ট কুমারহট্ট বাহে কলাবালি। কাঁঠালপাড়া ভাটপাড়া আর মুড়াজুলি।।
গরলপাড়া ডাহিনে রাখিয়া সদাগর। গিরিটি বাহবিয়া সাধু চলিল সত্বর।।
দিগঙ্গে আইল সাধু পুণ্যবান ঘাটে। নিমের গাছেতে যথা ওড়ফুল ফুটে।।
পশ্চাত করিয়া সাধু চলিল দিগঙ্গ। বামে থুয়্যা খড়দহ পাইল কোঙরঙ্গ।।
কাটি গঙ্গা দিয়া সাধু কালীঘাটে যায়। হনুঘাট সদাগর পশ্চাতে এড়ায়।।
বায়ুবেগে বাহে ডিঙ্গা নাহি অবসান। বেতড় বাহিয়া সাধু পাইল নবাসন।।
বামে হিজুলির পথ কৈল তেয়াগন। হাড়খাল এড়াইল সাধুর নন্দন।।
মোহনা বাহিয়া চলে সাধুর তরণী। স্রোতপথে যায় ডিঙ্গা সলিল-সরণী।।
অঙ্গার খালেতে সাধু কৈল শিবপূজা। দূর হৈতে দেখা পাইল জগন্নাথ-ধ্বজা।।
সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাধু গেল নীলাচলে। বুহিত্র রাখিয়া তথা সাধু কিছু বলে।।
*******************************************
নীলাচল সদাগর পশ্চাত করিয়া। চলিল মনের সুখে সাত ডিঙ্গা লয়্যা।।
বাহ বাহ বলে সাধু নাহি বলে রহ। বুহিত্র বাহিয়া সাধু গেল জোঁকদহ।।
করিশুণ্ড হেন জোঁক দেখ্যা ভয় মনে। কাণ্ডার পেলিয়া দিল ক্ষারে এর চুনে।।
জোঁকদহ সদাগর পশ্চাত করিয়া। বাহিল কাঁকড়াদহ সাত ডিঙ্গা লয়্যা।।
দাড়া দিয়া সে কাঁকড়া ডিঙ্গা সব রাখে। বুদ্ধের কাণ্ডারী সব শিবা-ভাষা ডাকে।।
এড়ায়্যা কাঁকড়াদহ গেল সদাগর। শঙ্খদহ সদাগর বাভিল সত্বর।।
কড়্যাদহ সদাগর করি তেয়াগন। সেতুবন্ধে কহে গিয়া শ্রীরামের গুণ।।
*******************************************
সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাত করিয়া। পঙ্কদহ সদাগর গেল এড়াইয়া।।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকিল বুহিতাল। পশ্চাতে করিয়া গেল লঙ্কার ময়াল।।

[89] দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের নদনদী,* (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪), ৩৭।

পবনের বেগে ধায় সপ্ত মধুকর। এড়াইল হেদ্যাদহ চাঁদ সদাগর।।
মনসার পাদপদ্মে ক্ষেমানন্দ কহে। সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাধু গেল কালীদহে।।"[90]

ত্রিবেণীর পর চন্দ্রধর বণিক ক্রমে নবহট্ট, কুমারহট্ট, কলাবালি, কাঁঠালপাড়া, ভাটপাড়া, মুড়াজুলি, গরলপাড়া, গিরিটি (গিরিডি) অতিক্রম করে দেগঙ্গাতে এসে পৌঁছায়। দেগঙ্গার পর বাঁদিকে খড়দহ, কোঙরঙ্গ পেরিয়ে কাটা (কাটি) গঙ্গা দিয়ে কালীঘাটে এসে পৌঁছায়। এরপর হনুঘাট পেরিয়ে বণিকের বাণিজ্যতরী বেতড়ে এসে পৌঁছায়। সেখানে বাঁদিকে হিজুলির পথ বেয়ে হাড়খাল ও অঙ্গারখাল হয়ে আদিগঙ্গার পথ হয়ে নীলাচলে গিয়ে উপনীত হন। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যেও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতকাদাসও তার কাব্যে নীলাচল অর্থাৎ উড়িষ্যার উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিদের মত কেতকাদাসও বেতড়ের পর আদিগঙ্গার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাহলে কেতকাদাস কেন পথ পরিবর্তন করিয়ে নীলাচলের হয়ে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করালেন? অর্ণব ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ব্যাখ্যায় চাঁদের বাণিজ্যপথ বেতড়ের পর হিজুলির স্বাভাবিক আদিগঙ্গার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে হাড়গঙ্গা ও অঙ্গারখাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পৌঁছায়।[91] এর অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, "......আদি গঙ্গার পথে পলি জমতে শুরু করার ফলে সেই পথে বাণিজ্য তরী যাওয়ার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। তাই, ভিন্ন পথে সমুদ্রযাত্রা।"[92]

১৭৬৪ থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে Rennell'র নক্‌শাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নক্‌শাতে আদিগঙ্গার ক্ষীণ রেখা চিত্রিত। ১৭০০-১৭২২ খৃষ্টাব্দের নবাব আলিবর্দীও নৌবাণিজ্যের জন্য গঙ্গাকে

---

[90] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২২৬-২২৯।

[91] অর্ণব ঘোষ, 'মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা', *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২,* কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৬০।

[92] *তদেব,* ১৬১।

বর্তমান গতিপথের অন্তর্গত করেন।[93] দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "নৌবাণিজ্যের সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে একটি খাল কেটে সরস্বতী নদীর পুরাতন মজা খাতে হুগলি (ভাগীরথী) নদীর জলধারা বইয়ে দেন নবাব আলিবর্দী। পরবর্তী সময়ে এই জলধারা প্রবল হয়ে ওঠে দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদীর জল পেয়ে। ......১৭৮৫ সালে করনেল টলি আদি গঙ্গার পথের খানিকটা খনন করে পূর্বে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। .........সরস্বতী নদীর খাতে ভাগীরথীর জলধারা প্রবাহের জন্য আর টালার নালা কাটায় আদি গঙ্গা তাড়াতাড়ি মজে যায়।...... সপ্তদশ শতকের পরও থেকেই আদি গঙ্গা মজতে শুরু করে।"[94] উল্লেখিত কারণেই প্রধানত সপ্তদশ শতকের কাব্যে কেতকাদাস পথ পরিবর্তন করে নীলাচলের পাশ দিয়ে বণিককে সাগরে পৌঁছে দিয়েছেন। নীলাচলের পর কবি ক্রমে জোঁকদহ, কাঁকড়াদহ, শঙ্খদহ ও কড়িদহ এড়িয়ে সেতুবন্ধ অবধি বণিকের বাণিজ্যপথকে নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, মনসামঙ্গল কাব্যের পূর্বের সংস্করণগুলিতে সেতুবন্ধের আগে এইসব দহগুলি অবস্থিত ছিল। কিন্তু কেতকাদাস নীলাচলের পরই এই হ্রদগুলির অবস্থান দেখিয়েছেন। এর মাধ্যমেই পূর্বের সংস্করণগুলির সাথে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র এই দহগুলি নয়, সেতুবন্ধের পরে তিনি পঙ্কদহ, হেদ্যাদহ ও কালীদহের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেতুবন্ধ বলতে প্রায় সিংহলের কাছাকাছি বণিকের বাণিজ্যতরীর অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। অতএব অনুধাবন করা যায়, কালীদহের অবস্থানও ঠিক সমুদ্রের অন্তবর্তী হয়ে সিংহলের প্রায় কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। বিপ্রদাসের কাব্যে কালীদহের অবস্থান ছিল বারুইপুর ও ছত্রভোগের মাঝামঝি স্থানে, সেখানে কেতকাদাসের সংস্করণে কালীদহের বিপরীত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

---

[93] *তদেব্।*

[94] দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের নদনদী*, (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪), ৩৮।

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার কল্পনাশ্রিত ভৌগলিক অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার কাব্যে চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্যডিঙা গগড়িয়া ঘাট বেয়ে ভ্রমরাদহতে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে ভাগীরথীর ধার ধরে ঘাটদহ, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ত্রিমুখী ধারা বেয়ে সাগরসঙ্গমে এসে পৌঁছান। এরপর কাঁকড়ার জল, শঙ্খদহ, ধনাইদহ, কড়িদহ থকে ভাগীরথীতে এসে পৌঁছান, এবং সেখান থেকে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। এই প্রসঙ্গে জগজ্জীবন কর্তৃক প্রদত্ত কাব্যাংশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

"গগড়িয়া ঘাট বায়া    ভ্রমরাদহতে গিয়া
পাছে পাল্য ভাগীরথীর ধার।।
**************************
ঘাটদহে ঘাটেশ্বর পূজে উপহারে।
নবদ্বীপে দেখিল চৈতন্য অবতার।।
মজিলে মজিলে সাধু যায় দিনে দিনে।
স্নান তর্পণ করে ত্রিবেণী নদী-স্থানে।।
যেখানে রহিছে গঙ্গা হৈয়া তিন ধারে।
সে দিগ বাহিয়া গঙ্গা পড়িল সাগরে।।
তার পাছে লাগ পায় কাঁকড়ার জল।
সেখানে সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা হবে তল।।
কতদূর বাহিয়া পাইল শঙ্খদহ।
সাধু বলে ধনাইদহের কথা।
মনাই কণ্ঢার কহে এই শঙ্খদহ।
সাধু বোলে মনাই শঙ্খ বন্দী করহ।।
***********************
তার পাছে লাগ পাইল নামে কড়িদহ।
সাধু বলে মনাই ই দহের কথা কহ।
মনাই কণ্ঢার কহে কড়িদহ নাম।
এই কড়ি পাইলে সিদ্ধ হয় সব কাম।
কড়িদহ বাহিয়া পাইল ভাগীরথী।
সেইখান হইতে সাধু আনন্দিত অতি।।
যাইয়া পাইল সাধু পাটনের বাস।"[95]

[95] জগজ্জীবন ঘোষাল, *মনসামঙ্গল*, শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৬০), ১২৬-১৩০।

আলোচ্য উক্তি থেকে এই বিষয়টি অনুমান করা যায় যে, জগজ্জীবনের কাব্যে বণিকের বাণিজ্যতরী ভাগীরথীর কূল বেয়ে যে পথে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, তা মূলতঃ আদিগঙ্গার পথ। এর আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় নবদ্বীপে চাঁদ সওদাগরের অবস্থানের মাধ্যমে। এরপর তিনি আদিগঙ্গার গতিপথের মাধ্যমে ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে পৌঁছান। ত্রিবেণী সঙ্গমে ত্রিমুখী অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে তিনি তর্পণ করেন, তা কাব্যাংশে স্পষ্ট। এরপর কবি আদিগঙ্গার বাকী স্থানগুলির উল্লেখ না করে সরাসরি বণিককে সাগরে উপনীত করেন। এখানেই তার ভৌগলিক বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে অবগত না থাকার বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। সাগরসঙ্গমে তিনি বিভিন্ন দহ বা হ্রদের উল্লেখ করেন অবশ্যই নৌবাণিজ্যের দুর্বিসহ পরিস্থিতিকে বাস্তব রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে। তবে, কড়িদহ ও শঙ্খদহের উল্লেখ পূর্ববর্তী কবিদের মতো বাণিজ্যিক প্রয়োজনকে উত্থাপন করার উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও সময় নির্বিশেষে মনসামঙ্গল কাব্যে বণিকদের বাণিজ্যিক গতিপথকে অনুধাবন করা যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও নদী গতিপথের কিরকম বিবরণ রয়েছে এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা অপরিহার্য। বর্তমান অধ্যায়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুই বণিক যথাঃ ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্যপথকে বিবৃত করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন কেবলমাত্র বর্হিবাণিজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তেমনি আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যের দৃষ্টান্ত বর্তমান। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি স্থানীয় রাজার নির্দেশে কখনো আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিলেন, আবার কখনো স্থানীয় রাজার রাজকোষ পরিপূর্ণ করার দৌলতে তিনি সামুদ্রিক বাণিজ্যেও পাড়ি দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক রাজার অবস্থানের কথা David L. Curley তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার মতানুসারে, স্থানীয় রাজাদের তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় বণিকরা আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যে লিপ্ত হচ্ছেন, এবং তার বদলে

রাজার কাছ থেকে উপঢৌকন ও সম্মান লাভ করছেন।[96] দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতি বণিক রাজার নির্দেশে আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। আবার শ্রীপতি অথবা শ্রীমন্ত কেবলমাত্র সিংহল থেকে পিতা ধনপতিকে উদ্ধার কল্পে বৈদিশিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়েছিলেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে দ্বিজ মাধব তার কাব্যে উভয়ের যাত্রাপথকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করা প্রযোজ্য। কাব্যের প্রথমাংশে ধনপতি স্বর্ণ পিঞ্জর আনয়নের উদ্দেশ্যে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় তিনি যে যাত্রাপথ গ্রহণ করেন তা হল,

"ভূপতির আজ্ঞা সাধু রহিতে না পারে।
বিদায় হইয়া আইল আপনার পুরে।।
************************
ত্বরায়ে চলিল সাধু গৌড় নগরে।।
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল সাধুর ভৃত্য বহুজন।।
বামকুলি বেজকুলি এড়িয়াতে যায়ে।
বিনোদপুরেত গিয়া উপনীত হয়ে।।
সিংহপুর এড়ি যায় চণ্ডিকার হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট।"[97]

উল্লেখিত উক্তিতে ধনপতি বণিক দোলা বা পালকিতে করে স্থলপথে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম কর গৌড়ে গিয়ে পৌঁছান। তার যাত্রাপথের অন্তর্গত স্থানগুলি হল বামাকুলি, বেজকুলি, বিনোদপুর, সিংহপুর ও চণ্ডীকার হাট। নদীবাণিজ্যে হাট বা বাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়না। তাই অনুমান করা যেতে পারে বণিক স্থলপথে গৌড়ে পৌঁছান। এখন প্রশ্নও হল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও কি সওদাগর একই স্থলপথ অতিক্রম করে গৌড়ে পৌঁছেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন,

"বিদায় করিয়া সাধু চলিলা সত্বরে
প্রথমে করিল বাসা মজালিষপুরে।

[96] David L. Curley, 'Tribute Exchange' and the Liminality of Foreign Merchants in Mukunda's Candimangal', *Poetry and History: Bengali Mangal-kabya and Social Change in Precolonial Bengal*, (New Delhi: Chronicle Books, 2008), 116-120.
[97] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ১৩৫।

বার্বকপুরেতে গেল দ্বিতীয় দিবসে
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে।
বালীঘাটায় উত্তরিল দোলার ধাওনি
রন্ধন ভোজন করি গোঙাইল রজনি।
**********************
সিতলপুরেতে গেল চতুর্থ দিবসে
বড় গঙ্গা পার হয়্যা গৌড়ে প্রবেশে।"[98]

মুকুন্দরামের কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী ধনপতি বণিকের নিজের অঞ্চল থেকে গৌড়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল প্রায় চারদিন। তিনি প্রথমে মজালিষপুর, তারপর বার্বকপুর, বালীঘাটা এবং সিতলপুর অঞ্চল হয়ে বড় গঙ্গা পেরিয়ে অবশেষে গৌড়ে উপনীত হন। মুকুন্দরাম এবং দ্বিজ মাধবের রচনায় আঞ্চলিক নামের পার্থক্য বর্তমান। উভয় কবিই নিজ বসতিস্থল থেকে কল্পনার আশ্রয়ে অথবা আঞ্চলিক নামের ভিত্তিতে ধনপতি বণিকের স্থলপথের যাত্রাপথকে নির্মাণ করেছিলেন। মানিকদত্তের কাব্যে আবার মুকুন্দরামের কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন অঞ্চলের নামের সাথে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। মানিকদত্তের কাব্য অনুযায়ী,

"শিবনামে ধনপতি মন্ত্র জাপ কৈল।
প্রথম মজিলে বাসা বনগ্রামে বৈল।।
দিতী এ মজিল বাসা সিমলা নগরে।
ত্রিতী এ মজিলে বাসা কৈল শীতলপুরে।।
গৌড়ের রাজা তার নাম ধনেশ্বর।
সেইখানে গেল ধনপতি সদাগর।।"[99]

মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি বণিকের স্থলপথে গৌড়ে যেতে সময় লাগে প্রায় তিন দিন। এই যাত্রাপথে তিনি প্রথমে বনগ্রাম, তারপর সিমলা নগর এবং পরে শীতলপুরে পৌঁছান। 'শীতলপুর' নামক স্থানটির উল্লেখ মুকুন্দরামও তার কাব্যে উল্লেখ করেছেন। অতএব, এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের

[98] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১২৭।
[99] মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, শ্রীসুনীল কুমার ওঝা ( সম্পা.), পি-এইচ,ডি ( কলা শাখা) ডিগ্রিলাভের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৮১), ১৯০।

বাস্তব অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু এই অঞ্চল ব্যতীত আর কোন অঞ্চলের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়না।

এখন প্রশ্ন হল ধনপতি ও শ্রীপতি অথবা শ্রীমন্ত বণিক কোন নদীপথ অবলম্বন করে সিংহলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। ধনপতি বণিক মূলতঃ স্থানীয় রাজার আদেশ অনুযায়ী চন্দনকাঠ ও চামর আনয়নের উদ্দেশ্যে নৌবাণিজ্য শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলি যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলভেদে রচিত, তাই যাত্রাপথের মধ্যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। সর্বপ্রথম ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের[100] মধ্যে রচিত কবি দ্বিজ মাধবের ‘ মঙ্গলচণ্ডীর গীত’এ ধনপতি ও শ্রীমন্ত বণিকের যাত্রাপথের কিরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, তা আলোচ্য অধ্যায়ের উপজীব্য। অর্ণব ঘোষের মতে তিনি প্রধানত সপ্তগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, এরপরে তিনি পূর্ববঙ্গে চলে যান।[101] অর্থাৎ তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে তার কাব্যের নায়কের যাত্রাপথকে নির্মাণ করেন। যাত্রাপথ অনুযায়ী,

“মুনির ঘাট বাহিয়া এড়াইল তখনি।
ত্বরায়ে বাহিয়া চলে ইছানির পানি।।
ছিলিমপুর কাছিমপুর আগমপুর যায়ে।
মঙ্গলকোট বাহিয়া চামরী গাঙ্গ পায়ে।।
ইন্দ্রাণীস্বরূপা বাহে সাধু দিয়া ত্বরা।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা।।
***********************
গহরপুর বাহি ডিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম।।
ত্রিপিণীর ঘাটে নিয়া ছাপাইল না।
***********************
ত্বরা এড়াইয়া যায়ে গোরিয়া রাজার ঘাট।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার হাট।।
************************
ত্বরায়ে বাহিয়া সাধু যায়ে পাইকপাড়া।
মুলুয়াযোড়ের মেলান বাহিল তখনি।

[100] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৩৯৪।

[101] অর্ণব ঘোষ, ‘ মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা’, *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২,* কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৭।

*************************
নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দন।
পান্যাটি বাহিয়া যায়ে আগরপুর জলে।।
খিরাইতলা বাহিল বুঝিয়া ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি।।
চিত্রপুর বাহি সাধু যায় সাবধানে।
বেতরেত উত্তরিল সাধুর সপ্ত না।।
*************************
হাউল ঘাট বাহি সাধু গেল সৈদপুর।।
ডাইনে গোপালনগর কানাইর গাঁট পায়ে।।
ছেফলা গাঙ্গ বাহি ডিঙ্গা যায়ে হিজলিয়া।।
***************************
মদনমণ্ডল বাহি চলে সাত-মেখলী।।
****************************
মোকরাতে উত্তরিল সপ্ত মধুকর।।
******************************
ছয় ডিঙ্গা ডুবিল মোকরার জলে।
এক ডিঙ্গা বাহি যায়ে নগর সিংহলে।।”[102]

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতি বণিক প্রথমে মুনির ঘাট ইছানীর পানি বেয়ে, তারপর ছিলিমপুর, কাছিমপুর, আগমপুর হয়ে মঙ্গলকোটে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে চামরী গাঙ্গ বেয়ে ইন্দ্রাণী, কুমুদপুরা, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী হয়ে কুমারহাট, পাইকপাড়া, মুলাজোড়, নিমাইদত্তের হাট বা বৈদ্যবাটী, পান্যাটি বা পানিহাটি, আগরপুর, খিরাইতলা, বরাহনগর, চিত্রপুর বা চিতপুর, বেতরে বা বেতড়, হাউল ঘাট, সৈদপুর, গোপালনগর, কানাইর ঘাট, ছেফলা, হিজলিয়া, মদনমণ্ডল বা মেদনমল্ল হয়ে মক্‌রাতে এসে তার সপ্তডিঙ্গা হারান। এরপর তিনি একটি ডিঙ্গা নিয়েই ক্রমে কড়িদহ, শঙ্খদহ, জোঁকদহ, কাঁকড়াদহ, মশাদহ পেরিয়ে কালীদহে কমলেকামিনী দেখে সিংহলে গিয়ে পৌঁছান।[103] ধনপতি বণিকের যাত্রাপথের মধ্যে ছিলিমপুর, আগমপুর ও কাছিমপুর ব্যতীত মঙ্গলকোটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে দ্বিজ মাধব কর্তৃক প্রদত্ত যাত্রাপথ যে আদিগঙ্গার পথ দিয়েই অগ্রসর হয়েছে, তার অনুমান করা যায়। অর্ণব ঘোষের মতে, বাণিজ্যপথে মঙ্গলকোটের উপস্থিতি অনুযায়ী বণিকের

---

[102] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ২০২-২০৭।

[103] *তদেব*, ২০৭-২০৯।

যাত্রাপথ অজয় নদীর কোন একটি শাখা নদীর মাধ্যমেই অগ্রসর হয়েছে।[104] এছাড়াও সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে যে বাণিজ্যপথের বিবরণ রয়েছে, তা বিপ্রদাসের গতিপথের সমরূপ। অর্থাৎ এই বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দ্বিজ মাধবে বর্ণিত বাণিজ্যিক গতিপথ প্রধানত আদিগঙ্গার স্বাভাবিক পথ। দ্বিজ মাধব শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্যপথেরও একইরকম বিবরণ প্রদান করেছেন। তার কাব্যাংশের বর্ণনা অনুযায়ী, শ্রীমন্ত বণিক প্রথমে ইছানী নদী বেয়ে ছিলিমপুর, কাছিমপুর হয়ে মঙ্গলকোটে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে কুমুদপুরা, নগরদ্বীপ, ললিতপুর, গহরপুর হয়ে সপ্তগ্রাম এবং ত্রিবেণীতে উপনীত হন। এরপর কুমার হাট বা কুমারহট্ট, পাইকপাড়া, মুলুয়া-যোড় বা মূলাজোড়, নিমাই দত্তের ঘাট, চাম্পান, পান্যাটি, আগরপুর, খিরাইতলা, বরাহনগর, চিত্র-কোন, কুচিয়ান, বেতর বা বেতড়, সইদপুর বা সৈদপুর, গোপালনগর, কানাইঘাট, বেলগাছি, ছেফলা, মণ্ডলপুর হয়ে মোকরাতে এসে পৌঁছান, এবং সেখান থেকে জোঁকদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ, কালিদহ প্রভৃতি হ্রদ পেরিয়ে সিংহলে গিয়ে পৌছান।[105]

নগরদ্বীপ, ললিতপুর এবং গহরপুর বাদ দিলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত  বণিকের যাত্রাপথ প্রায় একইরকম। এছাড়া উভয়েই মকরাতে বা মোকরাতে এসে চণ্ডীর ছলনায় প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। তবে, বাস্তবতার ভিত্তিতে যদি মঙ্গলকাব্যের যাত্রাপথগুলি অনুসরণ করা যায় তাহলে কালিদহ হোক বা মোকরা, ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই কবিরা মনসা ও চণ্ডী কর্তৃক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিবরণ প্রদান করেছেন। কালিদহের অবস্থান মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একাধিক সংস্করণে একাধিক রকম। বিপ্রদাসে কালিদহ সাগরসঙ্গমের কিছুটা আগে অবস্থিত হলেও অন্যান্য সংস্করণগুলিতে তার অবস্থান সমুদ্রের ভিতরে। অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কালিদহের

---

104 অর্ণব ঘোষ, ‘মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যে নদীপথ ও সমুদ্রকথা’, *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২,* কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮), ১৫৮।

105 দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ২৩২-২৪০।

অবস্থান সিংহলে সেতুবন্ধের কিছুটা আগে, যেখান পিতা ও পুত্র উভয়েই কমলে-কামিনী দর্শন করেন। আবার চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্যতরী কালিদহেই নিমজ্জিত হয়। এর মাধ্যমে সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকাকে অনুধাবন করা যায়।

দ্বিজ মাধবের মতো মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও ধনপতি ও শ্রীপতি বণিকের বাণিজ্যপথের বিবরণ পাওয়া যায়। দামিন্যার বাসিন্দা মুকুন্দরাম উভয় বণিকের যাত্রাপথকে নিজের বসতভূমি থেকেই নির্ধারণ করবে, তা স্বাভাবিক। ধনপতির যাত্রাপথের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি প্রথমে ভ্রমরার ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করেন। তারপর ললিতপুর, ইন্দ্রানী, নবদ্বীপ, পাড়পুর, শান্তিপুর, আম্মুয়া, গুপ্তপাড়া, চণ্ডীগাছা, কোদালিয়া, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, কোঙরনগর বা কোন্ননগর, ছত্রভোগ, মেদনমল্ল, বীরখানা এবং মগরাতে এসে পৌঁছায়।[106] দ্বিজ মাধবের বর্ণনার মতো মুকুন্দরামের কাব্যেও মগরাতেই ধনপতি বণিকের ছয়টি ডিঙ্গা নিমজ্জিত হয়। তারপর সংকেত মাধব ও সাগরসঙ্গম হয়ে নীলাচল, চড়াইগুহা, চন্দ্রসিদ্ধদ্বীপ, জোঁকদহ, শঙ্খদহ, সর্পদহ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হাদুআদহ, কালিদহ হয়ে সিংহলে গিয়ে উপনীত হন।[107] কিন্তু মুকুন্দরামে শ্রীমন্ত সওদাগরের যাত্রাপথ ধনপতি বণিকের তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ এবং বাস্তব সম্মত। মুকুন্দরামের বর্ণনা অনুযায়ী, শ্রীমন্ত বণিক প্রথমে ভ্রমরার নদী পেরিয়ে কৌলগ্রাম, চাকদা, মুমাখালা, থানাঘাট, মুড়ুকা, হুসেনপুর, গড়পাড়া, দৌলতপুর, কাঁকিলায়, গাঙ্গপাড়া, কুলীনপুর, কোঙরপুর, বেলাডোবা, আঙ্গারপুর, সোনালিয়া, নবগাঁ, বাগ্যনকোল, উধনপুর, নোআহাটি, পাথাইঘাটা-গঙ্গা-ললিতপুর, মাঠ্যারি, সপরখানা, বেলনাপুর, পূর্বস্থলি, নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়, শান্তিপুর, গুপ্তপাড়া, মহেশপুর, হালিশহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, নিমাইদত্তের ঘাট, বেতড়, নবাসন, হিজুলিয়া, ছত্রভোগ, কালিপাড়া, হাথ্যাগড়, মেদনমল্ল, বিরখানা, এবং মগরা হয়ে সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়।[108] ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয় সওদাগর

---

[106] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১৯৬-১৯৭।

[107] *তদেব*, ১৯৮-২০১।

[108] *তদেব*, ২৩০-২৩৫।

বিভিন্ন শাখানদী বেয়ে আদিগঙ্গার গতিপথ ধরেই যে সিংহলে পৌঁছান তা উপরিউক্ত যাত্রাপথের মাধ্যমে অনুমান করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাণিজ্যপথগুলির সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বাণিজ্যপথের বিবরণ নয়, এই পথগুলির বাস্তব সম্মত ভৌগলিক বিবরণও কাব্যগুলির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা বিভিন্ন দহের উল্লেখ করেছেন। এই দহগুলির কোন ভৌগলিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, কড়িদহ ও শঙ্খদহের মতো হ্রদগুলি থেকে যেমন বাণিজ্যিক লাভের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়, তেমনি কাঁকড়াদহ, জোঁকদহ, কুম্ভীরদহ এবং সর্বোপরি কালিদহ ও মগরা( মোকরা) নামক হ্রদগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতিকেও উপলব্ধি করা যায়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের বিবরণ

দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হলে বাংলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তুর্কী আক্রমণ ও তাদের ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া মধ্যযুগের ব্রাহ্মণীয় হিন্দু সমাজকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। বর্ণব্যবস্থায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ক্রমে ইসলামিয় ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হতে শুরু করে। এর ফলপ্রসূই, মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই দেবী, অর্থাৎ 'মনসা' ও 'চণ্ডী'কে  তৎকালীন ব্রাহ্মণীবাদী সমাজ এমন এক ধরণের 'বর্ম' হিসাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যাকে আধার করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পুনরায় 'হিন্দু' ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজসাধ্য হবে। Richard Eton এই ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, যথাঃ ১. ইমিগ্রেশন বা অভিপ্রয়ানের তত্ত্ব, ২. সোর্ড বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব, ৩. রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব, ৪. রিলিজিয়ান অব্ স্যোশাল লিবারেশন বা সামাজিক ও ধর্মীয় উদারীকরণ তত্ত্ব।[1] Eton এর তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'ইমিগ্রেশন বা অভিপ্রয়ানের তত্ত্ব' কোনোরকম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত নয়। উল্লেখিত তত্ত্বে মূলতঃ ভারতীয় মুসলমানদের একটা বৃহৎ অংশকে আরব বা ইরানিয় উপত্যকা থেকে আগত মুসলমানদের উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[2]

---

[1] Richard M. Eaton, 'Mass Conversion to Islam: Theories and Protagonists', *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, (New Delhi: Oxford University Press, 1994), 112-118.
[2] *তদেব*, ১১৩।

জগদীশনারায়ণ সরকারের মতে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে বিদেশী মুসলমান, আরব, ফার্সী, তূর্কী ও মোগলরা বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।[3] এদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গদেশের হিন্দুনারীদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং এই মিশ্র বিবাহের ফলস্বরূপ বাংলার চার শ্রেণীর মুসলমানের আবির্ভাব ঘটে, যথা- ক) বহিরাগত মুসলিম যারা স্ত্রী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, খ) যারা বাংলায় এসে বিবাহ করেন, গ) স্থানীয় মিশ্র মুসলিম, এবং ঘ) ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমান।[4] Eton এর পরবর্তী অর্থাৎ ‘সোর্ড বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব’ অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বেশিরভাগই মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়। উক্ত তত্ত্বের সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। Richard Eton এর পরবর্তী তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতীয় হিন্দুদের একটা অংশ অহিন্দু শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ ও সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেন।[5]

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইবন বতুতা উল্লেখ করেন যে, ভারতীয়রা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে খলজি সুলতানদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে তারা সুলতানদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের পদমর্যাদাও গ্রহণ করেন।[6] উনবিংশ শতাব্দীর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, উচ্চবর্ণীয় ভারতীয়’রাও রাজস্ব দেওয়া থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় ক্রমশ ইসলাম ধর্মের অনুগত হয়ে পড়ে।[7] Eton এর সর্বশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী, নিম্নবর্ণীয় ভারতীয়রা হিন্দু বর্ণপ্রথার নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[8] তারা মূলতঃ সুফী

---

[3] জগদীশনারায়ণ সরকার, ‘বঙ্গদেশের ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তাহার প্রতিক্রিয়া’, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮৮), ১৯।

[4] *তদেব*।

[5] Richard M. Eaton, ‘Mass Conversion to Islam: Theories and Protagonists’, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, (New Delhi: Oxford University Press, 1994), 112-118.

[6] *তদেব*, ১১৬।

[7] *তদেব*।

[8] *তদেব*।

শেখদের দ্বারা প্রচারিত ইসলাম ধর্মের উদারমনস্ক ধ্যানধারণায় আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়।[9] এখন প্রশ্ন হল, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন কিরূপ? মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ হিন্দু দেবতা ও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। অর্থাৎ সেখানে তুর্কী শাসকদের বাংলায় আক্রমণের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিষয়ে তথ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খলার চিত্রকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা কিভাবে কাব্যে বর্ণনা করেছেন, সেই সম্পর্কেও ধারণা থাকা আবশ্যক। শুধুমাত্র তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিতে পরিপুষ্ট মঙ্গলকাব্যগুলি, ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে হিন্দু মুসলমান ধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছে এই প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজনীয়।

## ৪.১ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেইসলাম ধর্মের প্রচার ও ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের বিবরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল’ এ বাংলায় মুসলমান আক্রমণ ও সামাজিক অরাজকতার সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের তুলনায় নারায়ণ দেব এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান না করলেও, তার প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে ময়মনসিংহ জেলার ইসলাম আক্রমণের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। পুঁথির একটি অংশে চন্দ্রধর বণিক লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলাকে বিবাহ দিয়ে শীঘ্র দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সাহে বণিকের কাছে আবেদন জানায়। কারণ হিসেবে চন্দ্রধর বণিক ‘হুসেন-হাসনের’ আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি উদ্ধৃত করলে এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

“হুসেন হাসনের নিকট আমার পুরি।
না জানি বাজ্যেত কীবা হইল ডাকা চুরি।”[10]

[9] *তদেব,* ১৭।
[10] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭), ২৩৫।

নারায়ণ দেবের পুঁথির এই উক্তিটিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচার করলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় পাঠান সুলতান হুসেন শাহ্ এর সময়কালকে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ অবধি তার রাজত্বকাল অব্যাহত থাকে।[11] তার আঞ্চলিক সম্প্রসারণ বিহার থেকে শুরু করে কামরূপ ও আসাম, এরপর উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং অবশেষে চট্টগ্রাম অবধি সম্প্রসারিত হয়।[12] সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও ধনসম্পদ লুণ্ঠণের ভয় চন্দ্র বণিকের কণ্ঠ থেকে ব্যক্ত করে, নারায়ণ দেব ইসলাম আক্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করেছেন। কবির ধারণা অনুযায়ী, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাংলায় আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা।

নারায়ণ দেবের কাব্যের অপর একটি উক্তিতে দেবী মনসা কালনাগিনীকে ‘ হাসন-হুসেন’ নামক দুই শাসকের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন। উক্তিটি হলঃ

“হাসন হুসেন দুই ভাই আমি গেলাম তার ঠাই
দিল্বিপের হয়ে রাজা।
আমার রাখাল মারি ভাঙ্গিছিল ঘট বাড়ি।
ভয়ে দিল নব লক্ষের পূজা।।”[13]

নারায়ণ দেব মুসলিম আক্রমণে হিন্দু দেবতা ও দেবীদের অনিশ্চিত অবস্থানের কথা এই উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। এর সাথে ইসলাম আক্রমণে হিন্দু মন্দির, দেউল কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল সেই বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণের সময় বিভিন্ন দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন।[14] আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে

---

[11] Momtazur Rahman Tarafdar, ‘Husain Shahi Dynasty 1494-1538’, *Husain Shahi Bengal 1494-1538 A.D.: A Socio-Political Study*, (Dacca: Asiatic Society Of Pakistan, 1965), 34.

[12] *তদেব*, ৩৮।

[13] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭), ২৩-২৭।

[14] দীনেশচন্দ্র সেন, ‘বঙ্গের স্বাধীন নবাবগণঃ ১৩৪০ খৃঃ হইতে ১৫৭৮ খৃঃ’, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১), ৬৩২।

নারায়ণ দেবের কাব্যে ‘মনসা’ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হলেও, যেকোন ধর্মের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণে ধর্মীয় পীঠস্থানগুলিই যে সর্বপ্রথম আক্রমণের শিকার হয়, সেই বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর মনসার মাধ্যমে মুসলমান শাসকদের প্রতি উদ্ধৃত বিদ্বেষ প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির অন্তর্গত, যা কাব্যে ক্রমে সামাজিক বিদ্বেষ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, উক্তিটির শেষ বাক্যে ‘নব লক্ষের পূজা’ দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এই ‘পূজা’ কে কার উদ্দেশ্যে প্রদান করে সেই বিষয়ে কবি কোন স্পষ্ট বিবরণ প্রদান করেননি। তবে, ‘পূজা’ শব্দটির সাথে হিন্দু আরাধনার সম্পর্ক রয়েছে, তাই কবি হয়তো ‘মনসা’ পূজার কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনসার কাছে এই পূজা রাখালদের অথবা মুসলমান শাসকদের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে কিনা, সেই বিষয়টিও অস্পষ্ট। মনসামঙ্গলের পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে এই বিষয়ে অবশ্যই আলোকপাত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ইসলাম শাসক ও সুফী সাধকদের ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়াকে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের কবিরা কিভাবে বর্ণনা করেছেন, তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল’ এ ‘ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার’ কারণে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পূর্বে বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনার সময়কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। তিনি কাব্যের প্রথমাংশে তার জন্মস্থান ও কাল সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

“ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক।।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী।।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্‌সিম্।।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।

মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।"[15]

'ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক' এই পদটিকে বিশ্লেষণ করলে বিজয়গুপ্তের কাব্যের সময়কাল হয় ১৪০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ। উক্তিতে নৃপতি হুসেনের উল্লেখ আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে, বিজয়গুপ্তের উল্লেখিত সময়কালে মধ্যযুগের রাজনীতিতে হুসেন শাহ্ এর রাজত্বকালের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।[16] হুসেন শাহ্ এর সময়কাল মূলতঃ ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ। আর তিনি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অবস্থান করেছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য উক্ত পদটিকে কাব্যের আরও দুটি পাঠান্তর থেকে বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত পাঠটিকে বিবেচনা করেন,

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।"[17]

উল্লেখিত সময়কালকে বিশ্লেষণ করলে বিজয়গুপ্তের রচনাকাল ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। হুসেন শাহ্ এই সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন। অতএব, বিজয় গুপ্ত কর্তৃক রচিত 'পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গলে' যে মুসলমান বিদ্বেষের উল্লেখ থাকবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল বিজয়গুপ্ত তার কাব্যে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? কাব্যের 'হাসেন হোসেন সংবাদ' নামক অংশে হাসেন ও হোসেন দুই কাজির বিবরণ রয়েছে। হোসেনহাটি গ্রামের নিকটে যাদের বাসস্থান। তারা হিন্দুধর্মের বিরোধী। কাব্যের হোসেনহাটি গ্রামের বাস্তবিক অবস্থানের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাব্যের একটি অংশে সৈয়দ মোল্লা 'হাসেন-হোসেনের' কাছে ভাগীরথী নদীর তীরে 'হিন্দুর ভূত' পূজা হওয়ার নালিশ

---

[15] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৪।

[16] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'ভূমিকা', *বাইশ কবির মনসা মঙ্গল বা বাইশা,* (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪), ২০।

[17] *তদেব।*

জানায়।[18] আর হুগলী নদী ‘ভাগীরথী-হুগলী’ নামেও পরিচিত। অতএব বলা যায়, এই অঞ্চলের কোন একটি গ্রামকে কবি হাসেন-হোসেনের নাম অনুসারে কাব্যে হোসেনহাটি নামকরণ করেছেন। কাব্যে হাসেন হোসেন বলতে সরাসরি ‘হোসেন শাহ্’কে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হুসেন শাহ্ এর রাজত্বকালে কবি তার কাব্যে ‘হাসেন-হোসেন’ পর্বের মাধ্যমে তৎকালীন মুসলমান সাম্রাজ্যবাদকে সমালোচনা করেছেন। শুধু তা নয়, মুসলমান আক্রমণে হিন্দু ‘ব্রাহ্মণেরা’ কতটা নিরাপত্তাহীন সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন। কাব্যের একটি অংশ এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

“দক্ষিণে হোসেনহাটি গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ।।
হাসেন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।।
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম।।
****************************
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।।
ব্রাহ্মণ সুজন তথায় বসে অতিশয়।
গৃহ ঘর তোলায় না-----দুর্জ্জনের ভয়।।”[19]

বৈদ্য পণ্ডিত বিজয়গুপ্ত[20] উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিটিতে প্রধাণত ব্রাহ্মণদেরকে মুসলমান আক্রোশের প্রধান শিকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ কবির মতে ব্রাহ্মণরা হিন্দুজাতির প্রধান কর্ণধার। আর ব্রাহ্মণদের ধর্মচ্যুত করার মাধ্যম হল পৈতে ছিড়ে দেওয়া ও তাদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া। উক্তিটিতে কবি ব্রাহ্মণদের ‘সুজন’ ও মুসলমানদের ‘দুর্জ্জন’ বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব অনুমান করা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্বকে কবি কেবলমাত্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসেবে উল্লেখ করেননি।

---

[18] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কেলিকাতাঃ শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৫৫।

[19] *তদেব,* ৫৪।

[20] *তদেব,* ৪।

মুসলমান কাজী কর্তৃক ব্রাহ্মণদের পৈতে ছিঁড়ে দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করে, তিনি এই দ্বন্দ্বকে ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্ব হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। অপর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্ত তার কাব্যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মের অব্রাহ্মণদের ধর্মান্তরীকরণের বিষয়ে নীরব।

কাব্যের একটি অংশে দেখা যায়, মনসা পূজা করার জন্য ইসলাম শাসক রাখাল, কুমোর ও বারুইদের বন্দী করেছেন। কারণ রাখালদের মনসাপূজায় কুমোর ও বারুইরা ঘট ও পান যোগান দিয়েছে। কিন্তু হাসেন ও হোসেন বন্দী অব্রাহ্মণদের ধর্ম পরিবর্তন করিয়েছে কিনা সেই বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায়না। এমনকি কাব্যে মনসাকে ‘ হিন্দুর ভূত’[21] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়গুপ্ত যদিও চাতুর্যের সঙ্গে মুসলমান শাসকের মুখ থেকে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু দেবীকে ‘হিন্দুর ভূত’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাব্যগুলি যেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণা পুষ্ট, তাই মনসাকে ‘হিন্দুর ভূত’ হিসাবে বর্ণনা করা ব্রাহ্মণ মস্তিষ্কপ্রসূত কিনা, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বিপ্রদাস পিপিলাইও তার কাব্যে নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবী মনসাকে ‘ ডাইনি হিন্দুয়ানি’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বিজয়গুপ্তের মতো বিপ্রদাসও ইসলাম ধর্মের কোন পৃষ্ঠপোষকের দ্বারাই মনসাকে ‘ডাইনি’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনসাকে ‘হিন্দুর ভূত’ বা ‘ডাইনি’ হিসেবে পরিগণিত করা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির অন্তর্গত কিনা, তা বিশ্লেষণ করার বিষয়।

এবার দেখা প্রয়োজন, বিজয়গুপ্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য কবিরা তাদের কাব্যে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার কি কি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন? Richard Eton এর গ্রন্থ থেকে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার চারটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, ইসলাম বিদ্বেষী কাব্যগুলো কেবলমাত্র বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের বিষয়েই আলোকপাত করে। একটি উক্তি এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনঃ

“হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।।

[21] *তদেব*, ৫৫।

গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।।"[22]

উপরিউক্ত পঙক্তিতে বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের অস্ত্র হিসাবে 'রুটি' ও 'এড়া' খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে রুটির চল ছিল না। রুটি মূলতঃ ইসলামদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে পড়ে। আর 'এড়া' বলতে মূলতঃ 'মাংস'[23] কে বোঝান হয়েছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যের এই অংশের মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যাভ্যাসের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে একটি ধর্মের মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের মানুষকে সহজেই ধর্মান্তরিত করতে পারে। আর 'মাংস', বিশেষতঃ গরুর মাংস খাইয়ে হিন্দু জাতিকে অপবিত্র বা ধর্মচ্যুত করে দেওয়ার প্রয়াস মূলতঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত। কাব্য ব্যতিরেকে ইতিহাসেও এর নজির পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হুসেন শাহ্ শাসক হওয়ার পূর্বে গৌড়ের সর্বপ্রধান ভূমধ্যিকারীর সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, সুবুদ্ধি রায় ভৃত্য হুসেন শাহ্ এর উপর কয়েকবার বেত্রাঘাত করেছিলেন। এর ফলপ্রসূ হুসেন শাহ্ গৌড়ের শাসক পদ লাভ করার পর পত্নীর প্ররোচনায় গোমাংস খাইয়ে সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মনাশ করেন।[24] কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে হিন্দু ধর্মের অন্যান্য বর্ণের মধ্যে 'মাংস' খাওয়ার প্রচলন ছিল, তাহলে 'মাংস' খাইয়ে জাতিনাশ করার বিষয়টি কি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যেই গৃহীত? 'সুবুদ্ধি রায়' নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব, কিংবদন্তীতেও কি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিনাশ করার ব্যাপারেই আলোচনা করা হয়েছে? একথা অবশ্যই

---

[22] *তদেব।*

[23] বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য সংকলিত বিজয়গুপ্তের *'পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল'* এর শব্দকোষে 'এড়া' শব্দের অর্থ 'মাংস'। বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ২৪২। অনুরূপভাবে অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত *'মনসামঙ্গল'* কাব্যে 'এড়া' শব্দ 'হেড়া' হিসাবে বর্ণিত। এর অর্থও মাংস। আবার 'গোরুর হেড়া' ও 'মহিষের হেড়া'ও বর্ণনা পাওয়া যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪), ১০৭।

[24] দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গের স্বাধীন নবাবগণঃ ১৩৪০ খৃঃ হইতে ১৫৭৮ খৃঃ', *বৃহৎ বঙ্গ,* দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১), ৬৩৩।

বলতে হবে যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র নিজেদেরকেই ‘ধর্মের প্রতীক’ বলে মনে করেন। তাই তারা ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার মোড়ককে কেন্দ্র করে পরোক্ষভাবে নিজ স্বার্থই চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। আর হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের দেবী মনসাকে ইসলাম ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, মূলতঃ তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির অন্তর্গত।

ইসলাম ধর্মান্তরীকরনের অপর একটি প্রক্রিয়া ছিল কানে কলিমা বা কল্‌মা পাঠ করা। বিপ্রদাস পিপিলাই ‘মনসা-বিজয়’ এ কলিমা পাঠ করে ধর্মান্তরীকরণের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’ এ তৎকালীন ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের উপাদান পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্য রচনাকালে গৌড়ের সুলতান ছিল ‘হুসেন শাহ্, তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। বিপ্রদাস পিপিলাই তার কাব্যে ‘কালিমা’ পাঠ করে ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রদান করেছেন। উক্তিটি হলঃ

“পদ্মা প্রবেশিয়া হাসনের পুরী
নাহি কিছু দুঃখ শোক   সদা আনন্দিত লোক
দেখিয়া কৌতুকী বিষহরী।
************************
কাজি মজলিস করি  কেতাব কোরান ধরি
খাতাগুলা তজবিজ করে
সোয়ার পেয়াদা কত  মজুদাত শত শত
সদা পাঁচ হাতিয়ার ধরে।
কেহ বা জুলুম করে  কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করয়ে নছাব
জয়েক ছৈয়দ মোল্লা   জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কলিমা দিল   মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে যত মুসলমান
শিখায়ে নামাজ অজু   সদাই মক্তবে রজু
নিরন্তন খলিপা যোগান।”[25]

---

[25] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসা-বিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, সময়কাল অনুপস্থিত), ৬৭।

উপরিউক্ত পঙক্তি Richard Eton প্রদত্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে ‘সোর্ড থিসিস’ বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব এবং ‘রিলিজিয়ান অব্ স্যোশাল লিবারেশন’ বা সামাজিক ও ধর্মীয় উদারীকরণ তত্ত্বের পরিচয় বহন করে। উক্তি অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, হাসনের অনুগামীরা একহাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তা নয়। অন্যদিকে নিম্নবর্নের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের উদার মনোভাব ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম পরিবর্তন করে।[26] এমনকি বিপ্রদাস পিপিলাই নিজেও এই বিষয়টি স্বীকার করেন। তার কাব্যাংশের ‘ কেহ গুনা শিরে ধরে’ এবং ‘ রুজু করি করয়ে নছাব’, এই দুটি বাক্যের দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়। ‘ গুনা’ কথার অর্থ হল ‘ পাপ’।[27] উল্লেখিত কাব্যাংশে ইসলাম ধর্মকে ‘পাপ’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ অনুযায়ী ‘কেউ স্বেচ্ছায় পাপ মস্তকে ধারণ করে’। আবার ‘রুজু’ কথার অর্থ হল ‘আবেদন’[28] এবং ‘নছাব’ কথার অর্থ হল ‘গোষ্ঠীভূত হওয়া’।[29] অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হল ‘ কেউ আবেদন করে ইসলাম গোষ্ঠীভূত হয়’। অতএব এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিপ্রদাস পিপিলাই একদিকে যেমন বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তনেরও দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন।

জগদীশনারায়ণ সরকারের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে নিম্নবর্ণের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও সময় বিশেষে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন।[30] আর ইসলাম

---

[26] জগদীশনারায়ণ সরকার, ‘ বঙ্গদেশের ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তাহার প্রতিক্রিয়া’, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮), ১৫।

[27] সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের *‘মনসা-বিজয়’* কাব্যের শব্দকোষে ‘গুনা’ শব্দের অর্থ ‘পাপ’ বা ‘sin’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসা-বিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, সময়কাল অনুপস্থিত), ৩২১।

[28] *তদেব,* ৩৪৪।

[29] *তদেব,* ৩৩০।

[30] জগদীশনারায়ণ সরকার, ‘ বঙ্গদেশের ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তাহার প্রতিক্রিয়া’, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮), ১৫।

গ্রহণকারী হিন্দুদের সৈয়দ ও মোল্লারা কলিমা পাঠ করা ইসলামে দীক্ষা প্রদান করতেন তার বিপ্রদাসের উপরিউক্ত কাব্যাংশ থেকে অনুমান করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, ‘বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ’ প্রক্রিয়া কি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যেই ছিল? কারণ বিপ্রদাসের কাব্যে দুই ধরণের ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে কোন ধর্ম পরিবর্তনের তত্ত্ব কোন বর্ণের নিরিখে ছিল তা অনুধাবন করা যায়না। কবি বংশীদাস আবার মনে করেন, ইসলাম ধর্মপ্রচারকরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের জাতিনাশ করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। তার কাব্যের উক্তি অনুযায়ী,

“ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করিবার ছলে।
কর্ণেত কলিমা পড়ে যবন সকলে।।”[31]

দ্বিজ বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ভট্টাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[32] তার কাব্য রচনার কিছুকাল পূর্বেই পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল বাংলার বারো ভুইঞার অন্যতম ঈশা খাঁ এর অধিকারভুক্ত হয়।[33] ইতিপূর্বে লক্ষণ হাজ্‌রা নামক একজন হিন্দু-ভাবাপন্ন কোচ্‌রাজা সেই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনে করেন, ঈশা খাঁর ময়মনসিংহ অধিকার করার সাথে বাংলায় মুসলমান বর্ম দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[34] সতীশচন্দ্র মিত্র তার ‘যশোহর্‌-খুল্‌নার ইতিহাস’ নামক গ্রন্থে ঈশা খাঁ এর আগমন ও বারো ভুইঞার মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠার পিছনে ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে, ঈশা খাঁ সুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। এরপর নিজের অসামান্য

---

[31] বংশীদাস রায়, *পদ্মাপুরাণ,* রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্‌, বৈশাখ ১৩১৮ সন), ১৮১।

[32] আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘ভূমিকা’, *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,* (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪), ৬৭-৭৩।

[33] *তদেব্‌।*

[34] *তদেব্‌।*

প্রতিভাবলে তিনি অচিরেই আড়াই হাজারী সেনানায়ক হন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তিনি সোণার গাঁও এর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।[35] এই সময়কালে শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সাথে তার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।[36] কিন্তু ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করায় চাঁদ রায় প্রাণত্যাগ করেন।[37] এরপর ঈশা খাঁ বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করে বাজুহা ও সোণারগাঁ এর শাসনভার লাভ করেন এবং কতকগুলি নতুন দুর্গ নির্মান করেন।[38] পরবর্তীকালে তিনি আরও সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করে।[39] ঈশা খাঁ সোণারগাঁয়ে ও পরে কোচ রাজাকে পরাজিত করে জঙ্গলবাড়ীতে পৃথক রাজধানী স্থাপন করেন।[40] অবশেষে মানসিংহ এর সঙ্গে যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি তার সঙ্গে আগ্রায় গিয়ে ২২ পরগণার জমিদারী ও 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি লাভ করেন। এরপর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ এর মৃত্যু হয়।[41] এমনকি আকবরের রাজত্বকালেও পূর্ব বাংলার এই ২২ পরগণার অধিকার ঈশা খাঁ উত্তরসূরিদের হাতেই করায়ত্ত ছিল।[42]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য থেকে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিফলনের বিবরণ প্রদানকালে 'ঈশা খাঁ' এর ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয় করার প্রয়োজন কি ছিল? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বংশীদাসের ' পদ্মাপুরাণ' এর প্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে 'স্থান', 'সময়' ও 'ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের' বিবরণ প্রদান না করলে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যকার

---

[35] সতীশচন্দ্র মিত্র, 'বঙ্গে বার ভূঞা', *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩২৯), ১৬-৪৪।

[36] *তদেব।*

[37] *তদেব।*

[38] *তদেব*, ৬৬-৬৭।

[39] *তদেব।*

[40] *তদেব।*

[41] *তদেব।*

[42] James Wise, "On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal", *Journal of The Asiatic Society Of Bengal*, Vol. XLIII, Part I, Nos. I to IV; with nineteen plates (1874): 211.

তার কাব্যে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করছেন তা অনুমান করা সম্ভব নয়। বংশীদাসের কাব্যে কবি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের শিকার বলে উল্লেখ করেন। আর তিনি মূলতঃ তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতাকে কেন্দ্র করেই কাব্যে এই বক্তব্য প্রদান করেছেন। বংশীদাসের কাব্য রচনার আগেই ময়মনসিংহ অঞ্চল ঈশা খাঁ এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বিষয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশা খাঁ এর সময়কালের রাজনৈতিক অবস্থান বংশীদাসের কাব্যের অন্যতম রসদ। ঈশা খাঁ এর সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ, সবকিছুই ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত। বিশেষতঃ হিন্দু বিধবার অহিন্দু শাসকের সাথে বিবাহ গোঁড়া হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে অবশ্যই চক্ষুশূল। অতএব বলা যায়, ‘ ভট্টাচার্য’ পদবীধারী ব্রাহ্মণ কাব্যকার, তার কাব্যে ঈশা খাঁ কর্তৃক বিভিন্ন অনাচারকে হিন্দুজাতির ‘জাতিভ্রষ্ট’ করার ‘ষড়যন্ত্র’ হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য ও ঈশা খাঁ ঐতিহাসিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে অপর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের কর্ণে বা কানে ‘ কালমা্’ বা ‘ কলিমা’ পাঠ করে ধর্মান্তরীকরণ ব্যতিরেকে ‘বিবাহ’ বা ‘ সম্ভোগের’ মাধ্যমে ধর্ম পরিবর্তনও সম্ভব। জগদীশনারায়ণ সরকার তার ‘ বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক’ নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে স্বাভাবিক কারণবশতঃই মুসলিম যোদ্ধারা নারী সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি। অতএব, দৈহিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য মুসলমান যোদ্ধারা হিন্দু নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[43] তার ব্যতীত কখনও কখনও ধর্ম পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেও হিন্দু নারীর সাথে মুসলমান, অথবা ধর্মান্তরিত মুসলমান পুরুষের বিবাহ দেওয়া হত। আবার ধর্মান্তরিত হিন্দুর সাথে মুসলমান রমণীর বিবাহ দিয়ে তার ধর্ম পরিবর্তনকে স্থায়ী করা হত। জগদীশনারায়ণ সরকার

[43] জগদীশনারায়ণ সরকার, ‘ সমাজের সাক্ষ্য’, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ( মধ্যযুগ)*, ( কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮), ৪৬।

তুর্ক-আফগান যুগে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলমান বিবাহের তালিকা প্রদান করেছেন[44], যথাঃ-

ক) ১৩৪২-৫৭ খৃঃ ইলিয়াস শাহ্ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা ফুলমতিকে বিবাহ করেন।
খ) সুলতান সিকন্দর শাহ্ এরও এক হিন্দু পত্নী ছিল। এর গর্ভজাত পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ ভবিষ্যতের সুলতান হন।
গ) রাজা গণেশ ও সুলতান আজম শাহের বিধবা পত্নী ফুলজানি।
ঘ) হুসেন শাহের কন্যা ও ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ মদন ভাদুড়ীর পুত্র কন্দর্পদেব।
ঙ) হুসেন শাহের উজীর চতুরঙ্গ রান স্বীয় ধর্মান্তর সম্পূর্ণ করতে মুসলিম রমণীকে বিবাহ করেন। তার গর্ভজাত দুই পুত্র সুবি খান ও সুচি খান খুলনা জেলার সেনের বাজারে পরবর্তীকালে কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন।
চ) সাতক্ষীরা অঞ্চলে এক ফকির ধর্মপ্রচারে এসে স্থানীয় রাজা মুকুট রায়কে যুদ্ধে হত্যা করে, তার কন্যা চম্পাবতীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করেন। বিবাহের পর রাজকন্যা চম্পাবতী 'মাইচম্পা' নাম গ্রহণ করেন।
ছ)মুর্শিদাবাদের মুর্তজা খান বিবাহ করেন পরম বৈষ্ণব আনন্দময়ীকে।
জ)সুন্দরবন অঞ্চলে 'গাজী মিঞার বিয়া' উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। 'কালুগাজী ও চম্পাবতীর বিয়া' কাহিনীতে ঐতিহাসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে 'আন্তঃসাম্প্রদায়িক'[45] বিবাহ ব্যাপকহারে সংঘটিত হয়েছিল। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রাথমিকভাবে দৈহিক ও রাজনৈতিক তাগিদ পূরণের উদ্দেশ্যেই নিহিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিতে পুষ্ট মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণের কাব্যকাররা ' আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ'গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু জাতিনাশ করার মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এরফলে কাব্যে ' আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ' অনেকক্ষেত্রেই ইসলাম পুরুষ কর্তৃক হিন্দু রমণীর উপর অত্যাচারের বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। 'বিবাহভিত্তিক ধর্মপরিবর্তন' যে কতটা সামাজিক ও ধর্মবিদ্বেষের কারণ তার নজির মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়।

১৫৬০ শকাব্দ[46] বা ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কবি হিন্দু রমণীর ইসলাম আক্রমণের আশঙ্কার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। আর এই ভয় শুধুমাত্র

---

[44] *তদেব,* ৪৬-৪৭।

[45] *তদেব,* ৪৮।

[46] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪), ৭ ।

সাধারণ হিন্দু রমণীর নয়, স্বয়ং দেবী মনসারও। কেতকাদাসের কাব্যের একটি অংশে দেখা যায়, দেবী মনসা স্বয়ং ইসলাম স্পর্শে জাত বিনাশের ভয়ে ভীত। উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়,

> "যবন আইল তথাঃ মনে ভাবে বিশ্বমাতাঃ ছুঁইলে হইব বড় লাজ।
> ছুঁইলে যবন জাতিঃ ভুবনে কুষশ খ্যাতিঃ অপযশ দেবতা-সমাজ।।"[47]

উদ্ধৃত উক্তিটিতে স্বয়ং নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবী 'মনসা'র মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ইসলাম ভীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আর মুসলমান কর্তৃক কোন নারী নিগৃহীত হলে সে সমাজচ্যুত হবে, উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের সংস্করণে মনসাকে কখনো 'বেশ্যা'[48], কখনো 'স্বামীপরিত্যক্তা'[49], আবার কখনো 'জারজ সন্তান'[50] হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগরও বারংবার মনসাকে স্বামীপরিত্যক্তা ও পিতৃপরিচয়হীন হওয়ার কারণে পূজা দিতে অস্বীকার করেছে। এমনকি, মনসার নিজের পিতাও পরিচয় জানার পূর্বে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যত হয়েছেন। তবে, সমাজ বর্হিভূত রমণীকে 'যবনের স্পর্শ' করার ব্যাপারে কবি কেতকাদাসের চিন্তার কারণ কি? মনসামঙ্গলে নিম্নবর্ণের বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারী নারীদের ওপর ব্রাহ্মণ পুরুষের যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে নজির থাকলেও, কবিরা কখনো তাদের সমালোচনা করেননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক নারীর সতীত্ব নাশকে আধ্যাত্মিক মোড়কে আবৃত করেন। উদাহরণ হিসেবে, খেয়ানীর ছদ্মবেশ ধারণকারী গৌরীকে শিবের সাথে যৌন সংসর্গ করার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কথা বলা যেতে পারে। কবিদের কাছে তা কখনোই সচেতনতার বিষয় নয়। অতএব অনুমান করা যেতে পারে, 'মনসা'র মুসলমান ব্যক্তিদের স্পর্শ করার 'ভয়' মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ তারা যদি

---

[47] *তদেব,* ১০৬।

[48] *তদেব,* ১৫৯।

[49] *তদেব,* ৮০।

[50] *তদেব,* ১৫।

কেবলমাত্র নারীদের সামাজিক লাঞ্ছনার বিষয়ে সচেতন হত, তাহলে সেখানে ধর্মভিত্তিক মোড়ক থাকতনা। এখানে কবিদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের অর্থাৎ হিন্দু ঘরের মেয়েদের মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু নারীরা যে নিজ ধর্মের মধ্যেও অত্যাচারের শিকার হতে পারে, সেই বিষয়ে কবিরা নিশ্চুপ।

কেতকাদাসের কাব্যের অপর একটি উক্তিতে দেখা যায়, মুসলমান শাসকের অনুচর সাদ্যা হাসনের নিকট ‘ মনসার’ রূপ বর্ণনা করছে। কাব্যের এই অংশের মাধ্যমে কবি অবশ্য ইসলাম শাসকের হিন্দু রমণীর প্রতি প্রলোভনের বিষয়ে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। কাব্যের অংশ অনুযায়ী, হাসনের অনুচর ‘ সাদ্যা’ হাসনের নগরীতে ‘ হিন্দু’ দেবী মনসার পূজা বন্ধ করতে উদ্যত হলে, রাখালদের দ্বারা সে নিগৃহীত হয়। সাদ্যা রাখালদের মনসা পূজা বন্ধ করতে অসমর্থ হলে সে হাসন রাজার কাছে হিন্দু দেবী ও তার ভক্তদের শাস্তি দেওয়ার আর্জি জানায়। এক্ষেত্রে সাদ্যা হাসন রাজার নিকটে মনসার ‘কামিনী’ রূপের বর্ণনা করেন। এর একমাত্র লক্ষ্য হাসন রাজা মনসার রূপের বর্ণনায় মোহিত হয়ে মনসার সতীত্ব নাশ করতে উদ্যত হবে। আর মনসার সতীত্ব নাশ করলে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া সম্ভব হবে। কেতকাদাস প্রকৃতপক্ষে মুসলমান পুরুষ কর্তৃক হিন্দু নারীর প্রতি অত্যাচারকে ‘ হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতি’তে আঘাত দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্টোটাও যে সম্ভব, সেই বিষয়ে কাব্যকার কোন মতামত প্রদান করেননি। এখন দেখা প্রয়োজন সাদ্যা হাসন-হুসেনকে মনসার রূপের বর্ণনা কিভাবে প্রদান করেছেনঃ-

“করি জোড়করঃ রাজার গোচরঃ সাদিয়া গোহারি করে।
মুখ শশধরঃ কামিনী সুন্দরঃ কচুয়াদহের তীরে।।
অপ্সরী কিন্নরীঃ কিবা বিদ্যাধরীঃ কোন দেবতার বহু।
***********************************
শুনিঞা বাজনাঃ পাঠাইল সেনাঃ যাই কচুয়ার তটে।
রথের উপরঃ কামিনী সুন্দরঃ কি জানি কাহার বটে।।
পূর্ণ শশধরঃ না দেখি সোসরঃ তাহার মুখের আগে।

যদি কর মনঃ হাসন হুসনঃ আনিতে কি ধন লাগে।।"[51]

কবি কেতকাদাস হিন্দু নারীর সৌন্দর্যের উপর মুসলমানদের লালসার কথা এই উক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। কবির ধারণা অনুযায়ী হিন্দু নারীর প্রতি একদিকে দৈহিক আকর্ষণ, এবং অন্যদিকে জাতি নাশ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম পুরুষেরা তাদের সম্ভোগ করেন। তবে, কবি তার কাব্যের কোন ক্ষেত্রেই হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহের উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে বিষ্ণুপালও মুসলমান পুরুষ কর্তৃক হিন্দু নারীর শারীরিক নিগৃহের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন। বক্তব্যটি এইরূপঃ-

"চলিলা হর রহাত্যে পার্বতী
যবন মূরতি সির্জিলা পশুপতি।
নীল ধড়ি পরে কিবা দোস্তাগ মাথায়।।
খাঁড়া ছুরি নিলা যৌবন অবতার।
চিড়া সন্দেশ নিলা বোচকা বান্দিয়া।
পার্বতীর আগে পথে রহিলা ডাড়ায়া।।
বিশ্বকর্মা বল্যে প্রভু কৈলা সঙরণ।
মহারুদ্রের কাছে যায়া দিলা দরশন।
ধর্স্বর্স্বাছা রে বাটার পান খাঁ।
মায়া-মণ্ডপ একটি গড়্যে দিয়া যা।।
***************************
মেঘমালা বল্যা প্রভু কৈল্যা সঙরণ।
****************************
চারি মেঘে আস্যে প্রভুর বন্দিলা চরণ।
ধর ধর বাছা রে বাটার পান খা।
কার্তিক লম্বোদরের কাছে বিষ্টি হও গা।।
************************************
তিতিয়া ভিজিয়া দুর্গা জাড়ে কেন মর।
তেতা বস্ত্র ছাড়িয়া সুখান বস্ত্র পর।।
অঙ্গট হানিছে তোর কলার বাহুড়ি।
ভুজলতা বেড়িয়া থাকিব কোলাকুলি।।
*********************************
ছুটিল মদনবাণ ঘুচিল-----জ্ঞান।

---

[51] *তদেব,* ১১০।

রতির আঙায় দ্রোহে ঘামে টলবল।
************************************
আধখানা চন্দ্র প্রভুর ভূমিতে পড়িল।
হাসেন হোসেন দুই ভাই তাহাতে জন্মিল।।”[52]

কাহিনী অনুসারে, দুর্গা শিবের অবৈধ সন্তান মনসার পরিচয় সম্বন্ধে অবগত হলে, দুঃখে সে তার দুই পুত্রসন্তানকে নিয়ে পিতৃগৃহের দিকে যাত্রা করেন। শিব তাকে পিতৃগৃহে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে অসমর্থ হলে, সে কৌশলে যবন বেশ ধারণ করে দুর্গার সতীত্ব হরণ করেন। কাব্যে লক্ষ্য করার বিষয় ‘হাসেন-হোসেন’ এর জন্ম এর ফলেই সম্ভব হয়। এই উক্তিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, কবি শিবকে ‘যবনরূপী’ বেশ কেন প্রদান করলেন? পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর আজ্ঞাই স্ত্রীর কাছে শিরোধার্য। অতএব, দুর্গাকে বাধা দেওয়ার জন্য ‘ যবন’ রূপ অনর্থক। কিন্তু তার যবন রূপ ধারণের কারণ কি? উত্তরে বলা যায়, কবি ‘ যবনরূপী’ শিবের বেশ তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতে নির্বাচন করেছেন। সমাজে মুসলমানদের অবস্থান হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে কতটা বিপজ্জনক, তা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তিনি শিবকে ‘ যবন’ রূপ প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রশ্নও হল, দুর্গার সঙ্গে সম্ভোগের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবিকে মুসলমান পুরুষ চরিত্রের সৃষ্টি করলেন না কেন? উত্তরে বলা যায়, দুর্গা হিন্দুদের শক্তির প্রতীক। আর শক্তি কেবল শিবের সঙ্গী। তিনি দুর্জন সংহারকারিনী। কাব্যের অংশে তাকে যদি প্রকৃত মুসলমান পুরুষ সম্ভোগ করত তাহলে দেবীর গরিমা খণ্ডণ হত। কবির উদ্দেশ্য অবশ্যই সেটা নয়। তৃতীয় প্রশ্ন হল, কবি কেন ‘ হাসেন-হোসেন’কে যবনরূপী শিবের ঔরসজাত সন্তান হিসেবে বর্ণনা করলেন? উত্তরে বলা যায়, শিব সমস্ত জাতি ও বর্ণের উর্দ্ধে, এ বিষয়ে বর্তমান গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত। বিষ্ণুপালের কাব্যে হাসেন হোসেনের শিবের সঙ্গে সংযুক্তি মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। হাসেন হোসেন উভয়েই ইসলামের প্রতীক। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিতে তাদেরকে শিবের সাথে যুক্ত করে কবি ‘আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের’

[52] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ সন), ৩০৭।

পরিণামকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। আবার হতে পারে, কবি হয়তো সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণকে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে দুই যবনকে শিবের পুত্র হিসাবে গণ্য করেন। অর্থাৎ, হিন্দু হোক বা মুসলমান, সবাই ‘শিবের’ই সন্তান। সর্বশেষ প্রশ্ন হল, হাসেন-হোসেনকে যদি সাংস্কৃতায়ণের দরুণ শিবের সন্তান হিসাবেই গণ্য করতে হয়, তাহলে কবি কেন তাদের জন্মের নিরিখে হিংসার আশ্রয় নিলেন? উত্তরে বলা যায়, ‘আন্তঃধর্মীয়’ বা ‘আন্তঃসাম্প্রদায়িক’ বিবাহকে ব্রাহ্মণ্যধর্মী হিন্দু সমাজ কখনোই সুনজরে দেখেনি। তার নজির আমরা যেমন কাব্যে পাই, তেমনি আবার ইতিহাসেও বর্তমান। দুর্গাকে কবি এখানে গ্রামবাংলার সাধারণ রমণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর শিবকে বর্ণনা করেছেন যবনরূপে। কবির মতে, হিন্দু রমণীর সাথে কোন যবনের শারীরিক সম্পর্কের ফল কখনোই সুখকর হতে পারেনা। যবনের সাথে সম্পর্ক তথা ‘বিবাহের মাধ্যমে ধর্মপরিবর্তনকে’ সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই তিনি ‘হোসেন-হাসেন’ পর্বের উল্লেখ করেন।

এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গলের মতো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়? ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে, ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়কে সহজেই অনুমান করা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও তার পরিবার ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে দামিন্যা ত্যাগ করে আরড়া (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত) গমন করেন। এর পূর্বে তারা সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দীর তালুকে বাস করতেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শের খান গৌড়ের সুলতান মামুদশাহকে পরাজিত করে শেরশাহ নাম ধরে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।[53] অতএব, দিল্লির নতুন রাজার সময়কালে পুরনো জমিদারের অসুবিধা হওয়া প্রত্যাশিত। এই অসুবিধার প্রভাব মুকুন্দের পরিবারের উপর পড়তে শুরু করলে সংসারে আর্থিক সঙ্গতির আশায় তারা আরড়া গমন করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসাবে মুসলমান আক্রমণে সামাজিক টানাপড়েনকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে

[53] *তদেব*, ২৭।

উপলব্ধি করেন। তবে, তার পিতা গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্ এর কাছ থেকে ‘গুণিরাজ-মিশ্র’ উপাধি লাভ করেন।[54] সুকুমার সেনের মতে, কালকেতুর গুজরাট নগরকে মুকুন্দ গৌড়ের নগরের আদলে উল্লেখ করেছিলেন।[55] অতএব, গৌড়ের নগরের মতো মুকুন্দ বিরচিত কালকেতুর গুজরাট নগরেও ইসলাম অবস্থান বর্ণিত হবে তা অনুমান করা যেতে পারে। মনসামঙ্গলের কবিরা তাদের কাব্যে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেছেন, একথা পূর্বেই বর্ণিত। এখন প্রশ্ন হল, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের কাব্যে মুসলমানদের অবস্থান কিরূপ? কারণ ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের কারণে পূর্বেই তাকে দামিন্যা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তার কাব্যে তাই অহিন্দু বিজেতা শাসকদের অবস্থান কিরকম তা জানা আবশ্যক। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতু গুজরাট নগরের পত্তন করে তার নগরের পশ্চিমদিক মুসলমানদের জন্য দান করেন। সেখানে ইসলাম ধর্মের ব্যক্তিদের জন্য পৃথক হাট বসিয়ে তাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মনসামঙ্গলকাব্যে হিন্দু-ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক অবস্থান দ্বন্দ্বমূলক হলেও, সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে তার সহাবস্থানে পরিণত হয়। কালকেতুর গুজরাট নগরের ব্যাখ্যায় মুকুন্দরাম এই বিষয়টিকে উল্লেখ করেন। কাব্যের বিবরণ অনুযায়ী,

“বীরের পাইয়া পান        বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তাঁরে।
আইসে চড়িয়া তাজি        সৈয়দ মোলনা কাজী
খইরত দেয় বীর বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পাটী        বলায় হাসনহাটী
এক-মুদনিয়া ঘর-বাড়ি।”[56]

কালকেতুর নগরে ইসলামের পৃথক অবস্থানকে উল্লেখিত উক্তি অনুযায়ী অনুমান করা যায়। গুজরাট নগরের পশ্চিমদিকে তাদের অবস্থান। পশ্চিমদিক প্রধানত ইসলামে ‘মদিনার’ দিক। ‘মদিনা’

---

[54] *তদেব*।
[55] *তদেব*।
[56] *তদেব*, ৭৭।

তাদের পবিত্র ধর্মস্থল। অতএব, ধর্মভিত্তিক কারণে নগরের পশ্চিমপাটে তাদের অবস্থান। হিন্দু রাজার নগরে মুসলমান অবস্থানের উল্লেখ করে কবি একদিকে যেমন উভয় ধর্মের সহাবস্থানকে আলোকপাত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি চাতুর্যের সঙ্গে সমাজে ইসলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও আশঙ্কা প্রদান করছেন। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের উল্লেখ করলেও কবি কাব্যের একটি অংশে বর্ণনা করেছেন,

"না ছাড়ে আপন পথ        সদাই টুপী দেই মাথে
ইজার পরয়ে দড় নাড়ি
জার দেখে খালি মাথা        তা সনে না কহে কথা
সারিয়া দণ্ডের মারে বাড়ি।
**********************************
মোললা পড়াইয়া নিকা        দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া।"[57]

কাব্যের এই অংশের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ্বেরও বিবরণ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম উক্তিটির দ্বারা ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের সাথে কোনোরকম সামাজিক সম্পর্কও রাখতে নারাজ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মের প্রতীক স্বরূপ সাদা টুপি ব্যবহার করে। আর যারা সাদা টুপি পরিধান করেনা, অর্থাৎ হিন্দুদের সাথে তারা দূরত্ব বজায় রাখে। কবির এই উক্তি অবিলম্বে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণবাদকে সমর্থন করে। কাব্যের অপর একটি অংশে কবি নিম্নবৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষদের ধর্ম পরিবর্তন করার বিষয়কে চিহ্নিত করেন। এছাড়া হিন্দু ধর্মের নিম্নবর্ণের মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে পেশা অনুযায়ী কি নামে পরিচিত হচ্ছে, তাও কবি এই উক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেন। উক্তিটি হলঃ

"রোজা নামাজ না জানিঞা বোলাইল গোলা

---

[57] *তদেব্।*

তাসন করিয়া কেহো নামও ধরে জোলা।
বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুরগি
পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল পিঠাহারি।
মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
হিন্দু হইয়া মুসলমান হয় গরসাল
কাঁন হইয়া মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর
জীবন উপায় তায় পায়্যা তাঁতিঘর।
পট লৈয়া ফিরে কেহো নগরে নগরে
তিরকর হইয়া কেহো নিরমায় শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম বলায় কাগতি
কলন্তর হইয়া কেহো ফিরে দিবারাতি।
নানাবৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান।”[58]

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পেশা, এবং ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে বৃত্তির নাম পরিবর্তনের বিষয়েও দৃষ্টান্ত উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তি থেকে পাওয়া যায়। কবির বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে ‘জোলা’, ‘কাবাড়ি’, ‘পিঠাহারি’, ‘সানাকার’ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। তবে, উক্তিটির শেষ দুটি বাক্য থেকে ইসলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি কবির উদ্বেগ স্পষ্ট। সমাজে মুসলমান বৃদ্ধি যে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের ফলেই সম্ভব হয়েছে, মুকুন্দরাম সেই সচেতনতার বার্তা হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছেন। মনসামঙ্গলকাব্যের কবিরা ইসলামে ধর্মান্তরীকরণের ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের প্রতি হিন্দু বিদ্বেষকে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরাম ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের ক্ষেত্রে কোনরূপ হিংসার প্রসঙ্গের উত্থাপন না ঘটালেও, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকে তিনি সুনজরে দেখেননি, সেই বিষয়টি স্পষ্ট।

[58] *তদেব্।*

সমাজে ইসলামিক অবস্থান নিয়ে সচেতনার উল্লেখ আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে[59] রচিত মাণিকদত্তের ‘ চণ্ডীমঙ্গলে’ও স্পষ্ট। মাণিকদত্তের কাব্যে একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা প্রয়োজনঃ

“প্রথমে মোশলমানকে করিল মোশলমান।
হাড়ি কারি বসিল মীর পাঠান।।
তৈলঙ্গা রহিলা বৈসে কেশরীর সন্তান।
******************************
গাও দশ খোজা বৈসে এ মরা নগরে।
কাজী মোল্বা জত সব বসিল থরে থরে।।
সেখ ফকির বৈসে গেল শানকি বোঝা।
এক সাথে বৈসে গেল আশি হাজার খোজা।।
পক্ষ বেচা বসিল সব থরে থর।
এক দিগে বসি গেল মনের বাজার।।”[60]

মাণিকদত্তের কাব্যের এই উক্তিটির প্রথম বাক্যে কবি মোশলমান দ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কবির কাব্যে ‘ মোশলমান’কে ‘ মোশলমান’ বানানোর উল্লেখ, সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। কারণ ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিরা উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কিভাবে নিজেদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করবে? সুনীল কুমার ওঝা তার গবেষণায়, মানিকদত্তের কাব্যের ‘জন্মভিত্তিক’, ‘কর্মভিত্তিক’ এবং ‘জন্ম ও কর্ম’ উভয় ভিত্তিক নানান শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।[61] ‘ মোশলমান’ বা ‘ মুসলমান’দের তিনি প্রধানতঃ বৃত্তি বা কর্মভিত্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন।[62] কর্মভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে ‘ মুসলমান’, ‘ মীর’, ‘ কাজী’, ‘ মোল্লা’, ‘ সেক’ ও

---

[59] মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুনীল কুমার ওঝা (সং), পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৪৪।
[60] *তদেব,* ১১২।
[61] *তদেব,* ৪৪।
[62] *তদেব।*

‘ফকিরের’ অবস্থান রয়েছে। আবার তেলী, গোপ, নাপিত, গোয়ালা, মালী, কুমার, জালিয়া, তাঁতি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষদের উপস্থিতিও বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[63] এখন প্রশ্ন হল, মাণিকদত্ত ‘কর্মভিত্তিক অব্রাহ্মণ’ ও ‘মুসলমানদের’ কি একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? তিনি যে ‘মোশলমান’ কর্তৃক ধর্মপরিবর্তনের কথা বলেছেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘মোশলমান’ কর্তৃক ‘মোশলমান’দের ধর্মপরিবর্তনের কথা বলে তিনি হয়তো অব্রাহ্মণদের হিন্দু ধর্মের তালিকা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এর সাথে তিনি ‘হাড়ি’, ‘পাঠান’ প্রভৃতি জন্মভিত্তিক শ্রেণীরও উল্লেখ করেছেন। ‘হাড়ি’ নিম্নবর্নীয় হিন্দুদের অন্তর্গত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ‘হাড়ি’ অসৎশূদ্রের মধ্যেও অন্ত্যজ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির উল্লেখ মাণিকদত্তের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, মাগধ, গোপ, নাপিত, কর্মকার, তৈলিক, তাম্বুলী, মালাকার প্রভৃতি জাতির উল্লেখ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ[64] ও মাণিকদত্তের কাব্যেও বর্ণিত। কিন্তু মাণিকদত্তে উল্লেখিত ‘হাড়ি’, ‘কাড়ি’ প্রভৃতি জাতির ব্যাখ্যা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায়না। সুনীল কুমার ওঝা মাণিকদত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ সম্পর্কিত তার গবেষণার ‘কাব্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র’ নামক পর্বে, ‘হাড়ি’, ‘কাড়ি’ প্রভৃতি জাতিকে বাংলার অধিবাসী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[65] সমগ্র বাংলার না হলেও এরা যে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে বসবাসকারী, তা তিনি বর্ণনা করেন।[66] আবার ‘পাঠান’ ইসলামের অন্তর্গত। অর্থাৎ অনুমান করা যেতে পারে, মাণিকদত্ত অব্রাহ্মণ ও মুসলমানদের একই পর্যায়ভুক্ত করেন। অথবা তিনি ‘নিম্নবর্ণীয় হিন্দু’ ও ‘মুসলমানদের’ সহাবস্থানের প্রসঙ্গে তাদেরকে একই শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন।

---

[63] *তদেব্।*

[64] শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, ১৩১৪ সাল), ৩৩৭-৩৪১।

[65] মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুনীল কুমার ওঝা (সং), পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৪৫।

[66] *তদেব্।*

মাণিকদত্তের কাব্যে বর্ণিত ‘তৈলঙ্গাদের’ প্রসঙ্গে সুনীল কুমার ওঝা তার গবেষণায় বর্ণনা করেছেন। মাণিকদত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে স্থানের নাম অনুযায়ী যে জাতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল বাঙ্গালী, উড়িয়া, তৈলঙ্গা ও রোহিলা।[67] ব্যবসা বাণিজ্য তথা যুদ্ধবিদ্যায় অংশগ্রহণকারী তেলেঙ্গনার অধিবাসীদের উড়িষ্যার পথে বাংলায় আগমন ঘটে।[68] এছাড়া ১২০২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময় থেকে, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ পুরুষোত্তমদেবের সময় পর্যন্ত তেলেঙ্গনার বহু অংশ কেশরী উপাধিধারী ওড়িয়া রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল।[69] আর উড়িষ্যার কেশরী রাজারা দীর্ঘকাল তাদের রাজত্ব করেছিলেন। কাব্যাংশের প্রথম চারটি বাক্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাণিকদত্ত কালকেতুর যে গুজরাট নগরের বর্ণনা করেছিলেন, তার একটি অংশে মুসলমানদের সাথে হাড়ি, কাড়ি, পাঠান ও তৈলঙ্গারাও বসবাস করে। অর্থাৎ কবি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের একই সমাজের অন্তর্গত করেন। এছাড়া কবির কাব্যে নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি তার বিরূপ মনোভাবও স্পষ্ট। এরপর পঙ্‌ক্তির শেষ ছয়টি বাক্য অনুসরণ করলে গুজরাট নগরের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে ইসলামের অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। ইসলাম জনসংখ্যার মধ্যে ‘কাজী, ‘মোল্লা’, ‘ফকির’ প্রমুখ ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যার আধিক্য, কবির কাছে সংশয়ের অন্যতম কারণ।

অনুরূপভাবে, দ্বিজ মাধব তার ১৫০১ শকাব্দে[70] (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) রচিত ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ নামক কাব্যে সমাজে মুসলিম অবস্থানের চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কালকেতুর গুজরাট নগরে হিন্দু ও মুসলমানদের সহাবস্থান দ্বিজ মাধবের কাব্যেও পাওয়া যায়। তার কাব্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন

---

[67] সুনীল কুমার ওঝা, তার ‘মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল’ সম্পর্কিত পি.এইচ.ডি এর গবেষণার ‘কাব্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র’ নামক অধ্যায়ে ‘তৈলঙ্গা’দের বর্ণনা করেছেন। মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুনীল কুমার ওঝা (সং), পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৪৪।

[68] *তদেব্।*

[69] *তদেব্।*

[70] দ্বিজ মাধব, ‘ভূমিকা’, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫), ১-১০।

নিম্নবৃত্তি অবলম্বনকারীদের সাথে ইসলাম সহাবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয়,

"নগরে বৈসে কর্ম্মকার খাঁড়া গঠে চোক ধার
গজ হেন গঠে একুধারা।
সন্দেশ সজ্জা করে নানা বিধি প্রকারে
বহু লোক বসিল মহেরা।।
বৈসয়ে তাতি জাতি হইয়া হরষিত মতি
নাবিত বৈসয়ে তার সঙ্গে।
দেবানন্দী যথ জন হইয়া হরষিত মন
বাদ্য বাজায়ে নানা রঙ্গে।।
বৈসে সাহ সজ্জন হইয়া হরষিত মন
পসার করয়ে চিত্ত দিয়া।
চণ্ডাল তামলী আর ধীবর বৈসে থরে থরে
ঘাটেতে পাটনী দেহি খেয়া।।
মলঙ্গী ত্রিপুরী যথ তারা বৈসে শত শত
আপনা জানিয়া করে বাড়ি।
মুচি বৈসে থরে থর গোচর্ম্মে পূর্ণিত ঘর
স্থানান্তর বসিল ভূমালী।।
বৈসয়ে মুসলমান পঢ়ে কিতাব কোরান
নামায়জ পঢ়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার।।"[71]

মুকুন্দরামের কাব্যে মুসলমানদের পৃথক বসতির যেরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, দ্বিজ মাধবের বর্ণনা তার সমতুল্য নয়। দ্বিজ মাধব সমাজে নিম্নবৃত্তি অবলম্বনকারীদের সাথেই মুসলমাদের সহাবস্থানের উল্লেখ করেছেন। উক্তি অনুযায়ী, কালকেতুর গুজরাট নগরে মুসলমানদের অবস্থান কর্মকার, ময়রা, তাঁতি, চণ্ডাল, ধীবর, মুচি প্রভৃতি বৃত্তিজীবীদের সাথে। অর্থাৎ অনুমান করা যায়, দ্বিজ মাধব গুজরাট নগরীতে হিন্দু-মুসলমানদের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেলেও, সেখানে ব্রাহ্মণদের সাথে সহাবস্থানের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না।

[71] *তদেব*, ৭৪।

দ্বিজ কমললোচনের ‘চণ্ডিকা বিজয়’ নামক গ্রন্থ ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার গ্রন্থ রচনাকালের কিছু সময় পূর্ব্বে শাহজাহানসুত শাহসুজা বাংলার সুবেদারী গ্রহণ করেন।[72] তার সময়কাল ছিল ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ।[73] অর্থাৎ বলা যেতে পারে, শাহসুজার সমসাময়িক দ্বিজকমললোচন এর কাব্যে মুসলমান শাসক কর্তৃক বাংলা শাসনের সচেতনতা স্পষ্ট। এছাড়া মুসলমান শাসকের অধীনে থেকে ব্রাহ্মণ জাতির সম্মান কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাও তিনি আলোচনা করেন। কাব্যের একটি অংশ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়ঃ

“ঘোড়াঘাট সরকার,     আন্ধুয়া পরগণা তার,
দিল্লিশ্বর সূতের জাগির।
চতুর্দ্ধারী মুসলমান,     পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর।।
চড়কাবাড়ীতে ঘর,     যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে,     চণ্ডিকা বিজয় ভাবে,
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ।।”[74]

কাব্যের অংশটির মাধ্যমে দ্বিজ কমললোচন ‘দিল্লিশ্বর সূতের জাগির’ অর্থাৎ শাহসুজার সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দুরাবস্থাকে চিহ্নিত করেন। আন্ধুয়া পরগণা বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুরে জেলায় অবস্থিত। অর্থাৎ কবি কোন ভৌগলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে ইসলাম সংখ্যাধিক্যতার কথা বলছেন তা স্পষ্ট। উক্তিটির তৃতীয় বাক্যে কবি মুসলমান রাজার রাজত্বকালে হিন্দুদের অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করেন। ‘পুরাণের নাহি মান’ বাক্যটির দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট। পুরাণ হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ। আর শাহসুজার সময়কালে রচিত কাব্যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সম্মান ‘ক্ষুণ্ণ’ হওয়ার বিষয়টি মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির অন্তর্গত। এর মাধ্যমে কবি সরাসরি ব্রাহ্মণদের সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে হিন্দু সমাজের অব্রাহ্মণের জাত নাশের ব্যাপারে

---

[72] *তদেব্।*

[73] *তদেব্।*

[74] *তদেব্।*

কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। অতএব বলা যায়, কবির সচেতন মনোভাব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যেই নিহিত।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ইসলাম আক্রমণের চিত্র কতটা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত, তা উপরিউক্ত আলোচনার থেকে স্পষ্ট। সমাজে মুসলমান আক্রমণ ও তাদের ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া সবকিছুই কবিদের কাছে সমালোচনার বিষয়। এমনকি যেসব হিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদেরকেও কবিরা সুনজরে দেখেননি। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে রচিত ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য প্রাথমিকভাবে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বকে রক্ষা রাখার অন্তরালে কবিরা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতেই সচেষ্ট হয়েছেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের উদারমনস্ক মনোভাবে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হলে, ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মের বোঝা কাদের ওপর আরোপ করবেন? অতএব, তারা ইসলাম ধর্মের বিকল্প হিসাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ কাল্টের উত্থান ঘটান। এরা উভয়েই নিম্নবর্ণের দেবী হিসাবে পূর্বপরিচিত। তাহলে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিরা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণের দুই দেবীকে কেন আশ্রয় করলেন? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পূর্বেই ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্যত হয়। এরপর হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের প্রতীকরা যদি পুনরায় উচ্চবর্ণীয় হিন্দু দেবতাদের জয়গান করেন, তাহলে তাদের পক্ষে হিন্দু ধর্মের অব্রাহ্মণদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবেনা। অর্থাৎ বলা যায়, হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরা ‘মনসা’ ও ‘ চণ্ডী’কে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় নিমজ্জিত করে এমন এক ধরণের বর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন, যার মধ্যে সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষেরাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশেষত, মনসা কাল্ট হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের দ্বারা পূজিত। এমনকি এর ব্যাখ্যা ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মাপুরাণ’ এর ‘হাসেন-হোসেন’ পর্বেও দেখা যায়। কারণ অন্যান্য বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে পূজা

পাওয়ার সাথে, মনসা হাসন-হুসেনের কাছ থেকে পূজা পেতে উদ্যত হয়েছেন। এমনকি মনসার সাথে তাদের বিবাদ রাজনৈতিক অপেক্ষা অনেক বেশী ধর্মভিত্তিক। একে ‘ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ’ও বলা যেতে পারে। কারণ ‘হাসন-হুসেন’ পর্বে হাসান এর সাথে মনসার যুদ্ধ, অনেকাংশে কারবালার ‘হাসন-হুসেন’ এর যুদ্ধের বর্ণনার সমতুল্য। বিশেষতঃ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণুপালের কাব্যে তা স্পষ্ট। কিন্তু পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে কবিরা কেন কারবালার যুদ্ধে ‘হাসান-হুসেন’ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রদান করলেন? ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে মনসামঙ্গল কাব্য ও কারবালার ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও ব্যাপক। হাসান-হুসেন প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের দুই পবিত্র নবী। ইসলাম ধর্মের প্রতীকও। সমাজে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণে ক্ষুব্ধ কবিরা তাদের কাব্যে হাসান-হুসেনকে দিয়ে মনসার কাছে নতি স্বীকার করিয়েছেন। আর তাতে কারবালার সংযোজন প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের কাছে ইসলাম ধর্মের নতি স্বীকারের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। হাসন কর্তৃক মনসার আরাধনা হিন্দু ধর্মের উদার মনোভাব প্রচারের উদ্দেশ্যেই গৃহীত। কিন্তু কবিরা হাসনকে দিয়ে মনসার আরাধনা করালেও, তার গৃহে মনসা পূজা হয়েছে মূলতঃ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই। অর্থাৎ এর মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির প্রকৃত স্বার্থ উপলব্ধি করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে আবার ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের সমালোচনাও স্পষ্ট। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা কোন ইসলাম পৃষ্ঠপোষককে দিয়ে হিন্দু দেবী চণ্ডীর আরাধনা করাননি। তার পরিবর্তে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবীর সাথে বিভিন্ন অসুরের যুদ্ধ বর্ণনার যে চিত্র প্রদান করেছেন, তা অনেকক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক যুদ্ধের সমতুল্য। মুসলমান শাসকের সময়কালে রচিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিরা যে, তাদের কাব্যে ইসলাম শাসনে হিন্দু ধর্মের অরাজকতার চিত্রের প্রতিফলন ঘটাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ইসলাম ধর্মের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যে দেবী চণ্ডীর উত্থান, তা কাব্যগুলিতে বর্ণিত চণ্ডী ও অসুরদের যুদ্ধের মাধ্যমেই প্রতিফলিত। চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা মনসামঙ্গলের কবিদের মতো সরাসরি

ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তবে, তাদের কাব্যে সমাজে মুসলমান অবস্থানের সচেতনা ও সংশয়ের বার্তা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় পুষ্ট কবিদের প্রকৃত মনোভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

৪.২ <u>মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির বাস্তবায়ণ</u>

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কাব্যে শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিনির্ভর বর্ণের অবস্থান কিরকম? আর ব্রাহ্মণ্য রাজনীতিতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাব্যে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে? তবে, এর পূর্বে মধ্যযুগের বাংলার সমাজজীবনে বর্ণ ও জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন। আনুমানিক ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এ বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের বর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়।[75] নীহাররঞ্জন রায় তার ‘ বাঙালীর ইতিহাস’ ( আদিপর্ব) এ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে আধার করে ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগকে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর সকল বর্ণই সংকর এবং তারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত।[76] ব্রাহ্মণেরা আবার এই শূদ্র সংকর উপবর্ণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেন।[77] নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুযায়ী, বর্ণ ও বৃত্তির নিরিখে বাংলাদেশে জাতসংখ্যা প্রায় ৩৬ টি।[78] তবে, এই

---

[75] সাগ্নিক দাশগুপ্ত, *নির্বাচিত মনসামঙ্গল কাব্যসূত্রে মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানঃ একটি পর্যালোচনা,* বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত, বাংলা বিভাগ, ( শান্তিনিকেতনঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১৬), ৭০।

[76] নীহাররঞ্জন রায়, ‘বর্ণবিন্যাস’, *বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব),* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৩৫৬), ২৪৫।

[77] *তদেব্।*

[78] *তদেব্।*

৩৬টি জাতের সঙ্গে আরও ৫টি উপবর্ণ নিযুক্ত হওয়ায় এর সংখ্যা ৪১ টি।[79] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বর্ণ ও বৃত্তিসমূহের বিবরণ প্রদানকালে এই সংকর জাতিগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়।[80] নীহাররঞ্জন রায়, এই তিনটি পর্যায়ের সংকর বর্ণগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তালিকা প্রদান করেন। সেখানে তিনি উত্তম-সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ, মধ্যম-সংকর পর্যায়ের ১২টি উপবর্ণ এবং অধম বা অন্ত্যজ সংকর পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণের উল্লেখ করেছেন।[81] উত্তম-সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণের অন্তর্গত হল ‘করণ বা লেখক’, ‘অম্বষ্ঠ বা চিকিৎসক’, ‘উগ্র বা ক্ষত্রিয়’, ‘মাগধ বা সংবাদবাহী’, ‘তন্তুবায় বা তাঁতী’, ‘গন্ধবণিক’, ‘নাপিত’, ‘গোপ’, ‘কর্মকার’, ‘তৈলিক বা গুবাক ব্যবসায়ী’, ‘ কুম্ভকার’, ‘ কাংসকার বা কাঁসারী’, ‘ শঙ্খকার’, ‘ দাস’, ‘ বারজীবী বা বারুই’, ‘মোদক বা ময়রা’, ‘মালাকার’, ‘সুত’, ‘রাজপুত্র’ এবং ‘তাম্বলী বা পানবিক্রেতা’।[82] মধ্যম সংকরের ১২টি উপবর্ণের অন্তর্গত হল ‘তক্ষণ বা খোদাইকর’, ‘রজক বা ধোপা’, ‘স্বর্ণকার’, ‘সুবর্ণবণিক বা সোনা ব্যবসায়ী’, ‘আভীর বা গোয়ালা’, ‘তৈলকার’, ‘ধীবর’, ‘শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি’, ‘নট বা নৃত্যশিল্পী’, ‘শাবাক’, ‘শেখর’ ও ‘জালিক বা জেলে’।[83] এছাড়া অধম বা অন্ত্যজ সংকরের ৯টি উপবর্ণের অন্তর্গত হল ‘ মলেগ্রাহী’, ‘ কুড়ব’, ‘ চণ্ডাল’, ‘ বরুড়’, ‘ তক্ষ’, ‘ চর্মকার’, ‘ ঘট্টজীবি বা খেয়াঘাটের রক্ষক’, ‘ডোলাবাহী বা দুলিয়া’, ‘মল্ল’।[84]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আবার সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎশূদ্র এবং অসৎশূদ্র এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[85] সৎশূদ্রের অন্তর্গত উপবর্ণগুলি হল ‘করণ’, ‘অম্বষ্ঠ’, ‘বৈদ্য’, ‘গোপ’, ‘নাপিত’,

---

[79] শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, ১৩১৪ সাল), ৩৩৭-৩৪১।

[80] নীহাররঞ্জন রায়, ‘বর্ণবিন্যাস’, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৩৫৬), ২৪৫।

[81] *তদেব*, ২৪৬।

[82] *তদেব*।

[83] *তদেব*, ২৪৭।

[84] *তদেব*।

[85] *তদেব*, ২৪৮।

‘ভিল্ল’, ‘মোদক’, ‘তাম্বুলী’, ‘মালাকার’, ‘কর্মকার’, ‘শঙ্খকার’, ‘কুবিন্দক বা তন্তুবায়’, ‘কুম্ভকার’, ‘কাংসকার’, ‘সূত্রধার’, ‘চিত্রকার’, ‘স্বর্ণকার’।[86] এদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ‘স্বর্ণকার’, ‘সূত্রধার’ এবং ‘চিত্রকার’ অসৎশূদ্র পর্যায়ে পতিত হয়েছিল।[87] অসৎশূদ্রের অন্তর্গত উপবর্ণগুলি হল ‘স্বর্ণকার’, ‘সূত্রধার’, ‘চিত্রকার’, ‘অট্টালিকাকার’, ‘কোটক’, ‘তীবর’, ‘তৈলকার’, ‘মল্ল’, ‘চর্মকার’, ‘শুঁড়ি’, ‘পৌণ্ড্রক’, ‘মাংসচ্ছেদ বা কসাই’, ‘কৈবর্ত’, ‘রজক’, প্রভৃতি।[88] অসৎশূদ্রের মধ্যেও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ের উপবর্ণগুলি হল ‘ব্যাধ’, ‘কাপালী’, ‘কোল’, ‘কোঞ্চ’, ‘হড্ডি বা হাড়ি’, ‘ডোম’, ‘জোলা’, ‘বাগ্‌দী’, ‘চণ্ডাল’ ইত্যাদি।[89]

বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী এই সংকর জাতিগুলির উৎপত্তি হয়েছে অনাচারের মাধ্যমে।[90] এক্ষেত্রে ব্যাস অধর্মশালী বেণ রাজার কর্তৃক চর্তুবর্ণের মধ্যে আন্তঃবিবাহ সম্পাদনের বিষয়ে উল্লেখ করেন।[91] অর্থাৎ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুযায়ী, চর্তুবর্ণের মধ্যে বিবাহভিত্তিক মিশ্রণের ফলেই বর্ণসংকরের উৎপত্তি ঘটে। এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত সংকর বা মিশ্রবর্ণ জাতিগুলিকে তাদের কাব্যে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? কারণ ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয়েই নিম্নবর্ণের দেবী। উচ্চবর্ণের কবিরা নিম্নবর্ণের দুই দেবীকে গ্রহণ করলেও তাদের উপাসকদেরকেও কি সমভাবে গ্রহণ করেছেন? এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য রচিত ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা।

---

86 *তদেব্।*

87 *তদেব্।*

88 *তদেব্*, ২৪৯।

89 তদেব্।

90 শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, ১৩১৪ সাল), ৩৩৮।

91 *তদেব্*, ৩৩৯।

'মনসামঙ্গল' বা ' পদ্মাপুরাণ' এর বিভিন্ন সংস্করণগুলি বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশানির্ভর সংকর বর্ণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এমনকি সমস্ত বর্ণের মধ্যে পূজা লাভ করার উদ্দেশ্যে দেবী নিজেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন। কখনো তিনি গোয়ালিনীর বেশ ধারণ করেছেন, কখনো মালিনী, আবার কখনো বা ব্রাহ্মণী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন অব্রাহ্মণ বর্ণগুলির উৎপত্তি ঘটেছে 'অভিশাপের' কারণে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বণিকশ্রেষ্ঠ চন্দ্র বণিকের পুত্র ও পুত্রবধূর মর্ত্যলোকে জন্মের কারণকে উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয়ই শিবের অভিশাপের কারণে স্বর্গলোক থেকে সরাসরি মর্ত্যে বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।[92] আবার ধীবরকূলের ভ্রাতৃদ্বয় 'জালু' ও 'মালু' এর জালিকরূপে জন্ম হল মনসার অভিশাপের কারণে। এরা পূর্বে ইন্দ্রের পুত্র পুরবর ও মালাধর হিসাবে স্বর্গলোকে বসবাস করত। এই প্রসঙ্গকে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে একটি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

"সখীর বচনে দেবী হইলা বিস্তিম। পূর্ব্বকথা মনে তার পড়ে আচম্বিত।।
পিতা মহেশ্বর মোরে দিন হেন বর। করিব তোমার পূজা দেব ঋষি নর।।
আজি আমি নেহারিব অমরার পুরী। কেমতে দেবতাগণ পূজে বিষহরি।।
তথায় ছলিব ইন্দ্রের কোঙর। দুইভাই পাঠাইব মর্ত্যের ভিতর।।
জন্মিব ধীবর-কুলে দুইভাই তারা। জালেতে উঠিব তার মনসার বারা।।
হেনকালে ইন্দ্রদেব পূজে সুরালয়। মনসার মন্ত্র জপে ভাবিয়া হৃদয়।।
বিচিত্র অমরাবতী তাহে সুররাজা। ষোড় উপচারে করে মনসার পূজা।।
********************************************
মালাধর পুরবর দুই ইন্দ্রসুত। পুষ্প তুলিবারে তাঁরে বলে পুরহুত।।
********************************************
বাপের আদেশ পায়্যা তারা দুইভাই। মালাধর পুরবর মালঞ্চতে যাই।।
ইন্দ্রের নন্দন-বন গন্ধে আমোদিত। পারিজাত পুষ্প আদি তাহে বিকশিত।।
প্রতিদিন ফোটে পুষ্প, প্রতিদিন তোলে। মনসার মায়া হৈল সেই ত ছাওয়ালে।।
সেদিন না পায় পুষ্প সন্ধান করিয়া সন্ধান। একে একে চাহে সব কুসুম উদ্যান।।
********************************************
পুরবর বলে শুন মালাধর ভাই। স্বর্গে পুষ্প নাই , চল পৃথিবীতে যাই।।
********************************************
দেবীর মায়া হেতু না পাইল ফুল। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সমুদ্রের কুল।।
জলধির কুলে মালাধর পুরবর। জাল লয়্যা মৎস্য ধরে যতেক ধীবর।।

[92] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ লেখাপড়া,১৩৮৪), ২২০।

নানা মৎস্য ধরে জালে পেলি ঘন পাকে। ইন্দ্রের নন্দন দুই দাণ্ডাইয়া দেখে।।
বিষাদ ভাবিয়া মনে করে অনুমান। এই যে ধীবর সব বড় ভাগ্যবান।
মৎস্য ধরি অন্ন খায় তারা বড় সুখে। ইন্দ্রপুত্র হয়্যা মোরা বুলি নানা দুখে।।
*******************************************
হেনকালে মনসা সাধিতে নিজ কাজ। কহিল ইন্দ্রের তরে শুন দেবরাজ।।
ইবে সুরপতি তুমি হৈলে অহঙ্কারী। অনাদরে পূজা কর মনসাকুমারী।।
*********************************************
মৎস্যধরা দেখ গিয়া সমুদ্রের কূলে। আমি উপবাসী আছি নাহি আন ফুলে।।
কুমারী দেবতা দেখি কর উপহাস। ধীবরে পাতিল ধরে তাহে অভিলাষ।।
*********************************************
মোর দাস হয়্যা তোরা জন্ম ভূমণ্ডলে। ধীবর হইয়া আজি মৎস্য ধর জলে।।”[93]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের অংশ অনুযায়ী, শিবের বরপ্রাপ্ত হয়ে মনসা সকল দেবতাদের কাছ থেকে পূজা লাভ করার অনুমতি পায়। এই সূত্রে দেবরাজ ইন্দ্র মনসার আরাধনায় ব্রতী হন। মনসার পূজা উপলক্ষ্যে নিজের পুত্রদ্বয়কে পুষ্প আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু মনসার অছিলায় ইন্দ্রের নন্দন কাননে তারা পুষ্প আহরণে ব্যর্থ হলে, তারা পৃথিবীলোকে গমন করেন। সেখানে সমুদ্রের উপকূলে ধীবরদের মৎস্য ধরার কৌশল দেখে, তারাও নিজ মনে ধীবর জীবনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। মনসাও এই অছিলায় তাদের পৃথিবীতে ধীবর কূলে জন্ম নেওয়ার অভিসম্পাত দেন। অর্থাৎ মালাধর ও পুরবরের ধীবর সম্প্রদায়ে জন্ম হওয়ার বিষয়ে দেবীর ‘অভিশাপ’ই দায়ী। কেবলমাত্র মালাধর ও পুরবর নয়, ‘মনসা’ ও ‘নেতা’র মতো শিব পুত্রীদ্বয়েরও দুরাবস্থার জন্যও ‘ব্রহ্মশাপ’ দায়ী। এই বিষয়ে একটি পঙক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

“একদিন পদ্মাবতী ঋতু স্নান কাজে।
গঙ্গাজলে স্নান করে সখীর সমাজে।।
হেনকালে এক মুনি উগ্রতপা নামে।
পদ্মারে দেখিয়া বলে ব্যাকুলিত কামে।।
*********************
সখিগণ মধ্যে পদ্মা আসিলেক লাজে।
শিব শিব জপি গেল সখীর সমাজে।।
ভূমিতে বসিল পদ্মা কেশ না সম্বরি।

[93] *তদেব*, ১৩২-১৩৪।

পড়য়ে চক্ষুর জল কান্দে বিষহরি।।
নেতা বলে মোর বাক্য শুন চন্দ্রমুখী।
তোমার স্বরূপ গুণে আন এক সখি।।
আপনার অলঙ্কারে সাজাইয়া তাঁরে।
মুনিকে সন্তুষ্ট করি চলি যাহ ঘরে।।
*********************
ইহা শুনি হাসিয়া বলয়ে বিষহরী।
আমার সদৃশ হও তুমি লো সুন্দরী।।
তোমা বিনা রূপে গুণে কেবা আছে আর।
এবার সঙ্কটে ভগ্নী করহ নিস্তার।।
************************
মুনির সঙ্গমে নেতা ঋতুমতী হৈল।
ভক্তিতে মুনির সেবা অনেক করিল।।
************************
হেনকালে দৈবযোগে বিপাকে পড়িল।
কহি শুন ব্রহ্মশাপ পদ্মা যে পাইল।।
*************************
স্বামী গর্ব্ব কর তুমি কপট চরিত।
স্বামী তোর ছাড়িয়া যাউক আচম্বিত।।
নেতারে বলয়ে মুনি কোপ করি মনে।
*************************
অষ্টাবক্র মুনি শাপে ভগিনীর দাসী।।”[94]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একদা ঋতুমতী মনসাকে দেখে উগ্রতপা মুনি নিজ কাম চরিতার্থে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। মনসা মুনিকে বাঁধা প্রদানে ব্যর্থ হলে নেতার পরামর্শে তিনি তাকে মুনিকে সন্তুষ্ট করার কাজে প্রেরণ করেন। উগ্রতপা মুনি পরবর্তীকালে সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে মনসাকে স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার অভিশাপ দেন। অন্যদিকে অষ্টাবক্র মুনি নেতাকে অভিশাপ দেন ভগিনীর দাসীবৃত্তি করার। মঙ্গলকাব্যের কবিরা ‘ব্রহ্মশাপ’ অথবা ঈশ্বরের প্রদত্ত ‘অভিসম্পাত’কে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে, উগ্রতপা এবং অষ্টাবক্র মুনির অন্যায় আচরণকে আধ্যাত্মিক মোড়কে আবৃত করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুর ব্যাধ রূপে জন্মের পিছনেও মহামায়ার

[94] বংশীদাস রায়, *পদ্মাপুরাণ*, রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮ সন), ১৫২-১৫৩।

অভিশাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের পূজা পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিব ও দুর্গা উভয়ে দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়লে, দুর্গা পিতৃলোকে গমনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। শিবও দুর্গাকে বাঁধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ ঘাম থেকে দুই ব্যাধের সৃষ্টি করেন। উভয় ব্যাধকে তাদের নিজ কর্ম হেতু মহামায়া মর্ত্যলোকে জন্ম নেওয়ার অভিশাপ দেন।[95] অনুরূপভাবে নীলাম্বরের কালকেতু রূপে জন্ম হওয়ার পিছনে দৈব অভিশাপই দায়ী। মাণিক দত্ত তার কাব্যে এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

"শিব বলে নীলাম্বর দোষ নাই করে।
বিনি দোষে কিরূপে পাঠাব মর্থপুরে।।
দুর্গা বলে নীলাম্বরের দোষ করাইব আমি।
সেই দোষে নীলাম্বরকে শাপ দিহ তুমি।।
************************
দুর্গা সন্তুষ্ট করি শিব গেল ঘরে।
নীলাম্বরে ছলিবার দূর্গা মায়া করে।।
দুইজন ব্যাধ পশু মারে জেইখানে।
নীলাম্বর পুষ্প তুলে সেই বীজুবনে।।
নীলাম্বর ছলিবার দূর্গা ভাবে মনে।
হরিণীর রূপে দুর্গা গেল ব্যাধস্থানে।।
**********************
ব্যাধকে দেখিয়া নীলাম্বর ভাবে মনে।
বৃথাই ইন্দ্রের পুত্র হৈলাও অকারণে।।
খুধা এ দুঃখ পাইঞা অরণ্যে বেড়াই।
শিব পূজা না করিলে খাত্যে নাই পাই।।
নীলাম্বর বলে বৃথা ফুল তুলি ফিরি।
ব্যাধ জন্ম হোইলে আমি খাত্যাত পশু মারি।।
****************************
শিব বলে নিলাম্বর তোর আছে সাধ।
মোর পূজা ছাড়ি তুমি হৈতে চাহ ব্যাধ।।
ব্যাধ কুলে জন্মিতে সাধ ব্যাধ হঅ তুমি।
ব্যাধ ঘরে জন্নম তুমি শাপ দিলাও য়ামি।।"[96]

---

95 মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুনীল কুমার ওঝা (সং), পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৫০।

96 *তদেব*, ৫০-৫২।

মাণিক দত্ত প্রদত্ত কাব্যাংশের প্রথম ভাগে দেবী দুর্গা মর্ত্যলোকে নিজের প্রজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শিবের কাছে ইন্দ্রপুত্রকে অভিশাপ প্রদানের আর্জি করেন। কিন্তু শিব নীলাম্বরের ক্রুটি ভিন্ন তাকে অভিসম্পাত প্রদানে অস্বীকৃত হলে, দেবী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ছলনা বলে নীলাম্বরের মনে ব্যাধ রূপে জন্ম হওয়ায় অভিলাষ জাগ্রত করে। এর ফলপ্রসূ, দেবাদিদেব শিব তাকে ব্যাধ রূপে জন্ম দেওয়ার অভিশাপ দেন। অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অব্রাহ্মণ যেকোন জাতির উৎপত্তি ক্ষেত্রে অভিশাপকে মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এখন দেখা প্রয়োজন, মনসামঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জাতিগুলির বৈশিষ্ট্য কবিরা কিভাবে প্রদান করেছেন? ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মাপুরাণ’ এর প্রারম্ভে ‘মনসা’র জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসার জন্মের পিছনে যে ঘটনার বিবরণ বর্তমান, সেই কাহিনী অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, চণ্ডী ‘পাটনী’[97] সেজে শিবকে ছলনা করে। এর ফলপ্রসূ শিবের ঔরসজাত কন্যা মনসার জন্ম হয়। মনসামঙ্গলের অন্যান্য সংস্করণে চণ্ডী ‘পাটনী’র পরিবর্তে ‘ডুমনীর’[98] ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন। চণ্ডী কর্তৃক অন্ত্যজ শ্রেণীর ছদ্মবেশ গ্রহণের মাধ্যমে কবিরা ব্রাহ্মণেতর বর্ণগুলিকে গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা করেছেন, এই বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যায় যে, তারা প্রতি ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণের মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাব্যের ছলে বর্ণনা করতে আগ্রহী। ‘ডোমিনী’ বা ‘পাটনীর’ পেশা অবলম্বনকারী নারীরা সমাজে বিভিন্ন পুরুষের লালসার শিকার। অনেক ক্ষেত্রে কাব্যে তাদের বহুপুরুষগামীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। তার একমাত্র কারণ নারী হয়ে তারা গৃহের বাহিরে জীবিকা গ্রহণ করে। আর নিম্নবর্ণের সমাজ তা স্বীকৃতিও দেয়। কিন্তু কাব্য রচনাকারী কবিদের কাছে তা প্রবলভাবে সমালোচনার বিষয়। কাব্যের বিভিন্ন অংশে নিম্নবর্ণের নারীকে সমালোচনার মাধ্যমে কবিরা প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্ণের সমাজকে সমালোচনা করে।

---

[97] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল*, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪), ১৫।

[98] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭), ৫-১২।

মনসার নিজের জন্মও সর্পকূলের মধ্যেই নিহিত। সর্পকূলের রমণী মনসা, যার জন্মের সাথে অবৈধ তক্‌মা সংযুক্ত। এর মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায়, কবিরা সর্পের সাথে যুক্ত বৃত্তিনির্ভর জাতিকে কিভাবে উল্লেখ করছেন। এছাড়া সর্পকূলের রমণীর প্রতি শিবের লালসা মাধ্যমে তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রজক কূলের রমণী নেতার জন্মের ক্ষেত্রেও একইরকম শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতি বর্তমান। শিবের ঘর্ম থেকে নেতার জন্ম। মনসামঙ্গলের কোন কোন সংস্করণে তার জন্ম শিবের চোখের জল থেকে। 'ঘর্ম' ও 'শ্রম' উভয়েই শ্রমরত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে যুক্ত। আর এই দুইয়ের সমন্বয়ে 'নেতার' জন্ম মূলতঃ বর্ণভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত। নেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক নিগৃহের শিকার। বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় নেতা অষ্টাবক্র মুণি কর্তৃক নিগৃহীত।[99] আর উগ্রতপা মুণির সংসর্গ পাওয়া সত্ত্বেও রজকিনীর পেশা তার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। অতএব অনুমান করা যায়, শিবকন্যা হওয়া সত্ত্বেও নেতা তার পেশার সাথেই যুক্ত। ব্রাহ্মণীয় রাজনীতি রজক শ্রেণীর সাথে শিবের সম্পর্ক স্থাপন করলেও, তাদের সামাজিক মার্যাদা কিন্তু বৃদ্ধি করেনি।

নিম্নবর্ণের দেবী মনসা এরপর পূজালাভের মাধ্যম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলে উচ্চবর্ণীয় সমাজ তাকে বাঁধা প্রদান করেন। চন্দ্র বণিক এখানে উচ্চবর্ণীয় সমাজের প্রতিনিধি। আর মনসাকে সম্পূর্ণ মর্ত্যলোকে তার পূজা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চন্দ্র বণিকের নিকট থেকে অর্ঘ্য লাভ করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে দেবী রূপে প্রচার লাভের জন্য 'মনসা' ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব মূলতঃ শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের অন্তর্গত। মনসা চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়া জন্য বিভিন্ন বেশ ধারণ করেন। মনসা প্রথমে চম্পক নগরে পদার্পণ করে ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে ধীবর কুলের দুই ভাই জালু ও মালুকে সহায়তা করার উপলক্ষ্যে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এ জালিক বা ধীবর জাতির বিবরণ পাওয়া যায়।

[99] বংশীদাস রায়, *পদ্মাপুরাণ*, রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮ সন), ১৫০।

প্রকৃতপক্ষে মাগধের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে তাদের উৎপত্তি।[100] এরা মধ্যম সংকর জাতির অন্তর্গত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তার কাব্যে, 'জালু' ও 'মালু' এর দৈহিক বর্ণনা প্রদান করেছেন।

"জাতিতে জালিয়াঃ বরণ কালিয়াঃ যেন জলধর-ছটা।।"[101]

কাব্যের এই অংশের মাধ্যমে কবি ধীবর জাতির শারীরিক গঠনকে বর্ণনা করেছেন। ধীবর জাতি, যাদের গায়ের রঙ কালো। অর্থাৎ ধীবর কূলের পেশার সাথে দৈহিক রঙয়ের সংযোগ সাধন করে, কবি বর্ণভিত্তিক রাজনীতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। ধীবর জাতির অন্তর্গত এই দুই ভাই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। মৎস্য ধরেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। চাঁদ সওদাগরের নগরে তারা 'জলকর' দিতে অসমর্থ হওয়ায়, বিনা পয়সায় বণিককে মৎস্য সরবরাহ করে।[102] চন্দ্রধর বণিকের নগরে তারা নির্যাতিত। আর তাদের পরিত্রাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মনসার ব্রাহ্মণী বেশে আগমন। কিন্তু মনসা বরাবরই নিম্নবর্ণের দেবী। ধীবর জাতিকে বর প্রদান করার জন্য তিনি ব্রাহ্মণী বেশ কেন ধারণ করলেন?

মনসার 'ব্রাহ্মণী' বেশে ধীবর জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির অন্তর্গত। জালু-মালুর কাছে নিম্নবর্ণের দেবী মনসা তার নিজ রূপে প্রকট হলে, জালু মালু তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এই সূত্রেই মনসা ব্রাহ্মণীর বেশে ধারণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমাজে ব্রাহ্মণেরা সর্বেসর্বা হওয়ায় মনসা 'ব্রাহ্মণী'র ছদ্মবেশকেই ধীরবদ্বয়ের কাছে পূজা লাভ করার মূল অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ধীবরদ্বয়ের আর্থিক প্রতিপত্তির মাধ্যমে তিনি সমগ্র ধীবর কূলের মধ্যেই তার পূজা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ধীবরের ঘরের প্রতিপত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে

---

[100] শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্,* পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, ১৩১৪ সাল), ৩৪০।

[101] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪), ১৩৫।

[102] *তদেব,* ১৩৭-১৪১।

বণিক রমণী সনকাও তার গৃহে মনসা পূজার আয়োজন করেন। এর মাধ্যমে বণিক শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সম্পদশালী ব্যক্তির আরও অর্থবান হওয়ার আকাঙ্খা এখানে প্রতিফলিত। ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ভূমিষ্ঠ বণিক কূলের চারিত্রিক ব্যাখ্যা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিরা বর্ণনা করেন। উভয় কাব্যেই তারা শঠ হিসাবে পরিচিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু পর্বে, দেবী চণ্ডীর কৃপায় অঙ্গুরি লাভ করে কালকেতু বণিক মুরারি শীলের নিকট তা বিক্রির মনোবাঞ্ছা পূরণে অগ্রসর হলে, বণিক তাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করেন।

"বান্যা বড় দুঃশীল    নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করা টাকা-কড়ি
পাইয়া বীরের সাড়া    প্রবেশে ভিতর বাড়া
মাংসের ধারী ডেড়    বুড়ি।
*************************
বীর দেয় অঙ্গুরি    বান্যা প্রণাম করি
জোঁখে বান্যা চড়াইয়া পড়্যান
কাঁচি দিয়া কৈল মান    সোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।
*************************
রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর
দুই ধানের কড়ি তাহে পাঁচ গণ্ডা কর।
অষ্ট পণ পাঁচ অঙ্গুরির কড়ি
মাংসের পিছিলা কড়ি ধাড়ি দেড় বুড়ি।
একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি
চালু ডাল কিছু লহ কছু লহ কড়ি।
অঙ্গুরির মূল্য শুন্যা ব্যাধের নন্দন
অঙ্গুরি সকল মিথ্যা সপ্ত ঘড়া ধন।
*********************
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহী পাই
জে জন অঙ্গুরি দিল দিব তাঁর ঠাঞি।
ব্যান্যা বলে দরে বাড়া হইল পঞ্চবট
মোর সনে সদা করি না পাবে কপট।
***********************
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া
অঙ্গুরি লইয়া জাব অন্য বণিকের পাড়া।"[103]

[103] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ সন), ৬৫-৬৬।

কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখিত কাব্যাংশের প্রথম ভাগে কবি মুরারি শীল নামক বণিককে 'দুঃশীল' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অনুমান করা যায়, কবি তার কাব্যের মাধ্যমে সমগ্র বণিক শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে বণিক অঙ্গুরি বা আঙটির সঠিক মূল্য নির্ধারন না করে সেটাকে মূল্যহীন বলে উল্লেখ করেন। তবে, কালকেতু বণিকের শঠ মানসিকতাকে অনুধাবন করে অন্য বণিকের শরণাপন্ন হওয়ায় উদ্যোগী হলে, মুরারি শীল সেই সময় আঙটির সঠিক মূল্য কালকেতুকে প্রদান করে। শুধুমাত্র তাই নয়, সিংহলে বর্হিবানিজ্যের ক্ষেত্রেও বণিকরা কিরকম শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন তার ব্যাখ্যাও মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে উল্লেখিত।

চন্দ্রধর বণিকের পরম বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝা ও তার শিষ্যদের হত্যা করার জন্য মনসা প্রথমে 'মালিনী' ও পরে ' গোয়ালিনী' বেশ ধারণ করেন। কিন্তু ধন্বন্তরি ওঝাকে হত্যা করার কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে মনসা ও ধন্বন্তরি একই সমাজের অন্তর্গত। এরা উভয়েই সর্প সম্পর্কিত বিদ্যায় পারদর্শী। ধন্বন্তরিকে হত্যা না করলে তাই চন্দ্রধর বণিককে অবনত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্যে মনসা 'মালিনী' রূপ ধারণ করে পুষ্প বিক্রি করার অছিলায় ধন্বন্তরির শিষ্যদের হত্যা করে।[104] কিন্তু ধন্বন্তরি তাদেরকে জীবিত করলে মনসা পুনরায় 'গোয়ালিনির' ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[105] মনসার 'মালিনী' ও 'গোয়ালিনী' এর ছদ্মবেশ গ্রহণ করার কারণও তাই। তিনি প্রয়োজনে ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করতে পারতেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করেই ধীবর জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন। তবে, হত্যার সময় কেন নিম্নবর্ণের মানুষের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন? মনসার এই বেশ ধারণ অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির মস্তিষ্কপ্রসূত। মনসার মাধ্যমে কবিরা নিম্নবর্ণের বৃত্তিনির্ভর

---

[104] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪), ১৭৫।
[105] *তদেব,* ১৭৬।

জাতিকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কর্মকার জাতির চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য কবিরা, মনসার নির্দেশে বেহুলার বাসরঘরে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ছোট্ট ছিদ্র করায়, যাতে সহজেই সর্প প্রবেশ করে লক্ষ্মীন্দরকে হত্যা করতে পারে।

চন্দ্রধর বণিকের সপ্তডিঙা ও মধুকর মনসার দ্বারা কালিদহে নিমজ্জিত হওয়ার পর মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কবিরা নানাভাবে তার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদরত ব্যক্তি কিভাবে সমাজের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় তা বর্ণনা করেন। গন্ধবণিক চন্দ্রধর জাহাজডুবির পর বিভিন্ন বৃত্তিনির্ভর জাতির কাছে চরম হেনস্তার শিকার হয়। প্রথমে সে ব্যাধেদের কাছে চরম অপমানিত হয়।[106] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী ব্যাধ মূলতঃ অসৎ শূদ্রের মধ্যেও অস্পৃশ্য। অতএব, ব্যাধেদের হাতে বণিকের দুর্ভোগ অবশ্যই ঈশ্বরিক বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যেই গৃহীত। এরপর চন্দ্রধর বণিক জীবন নির্বাহের জন্য নিম্নবর্ণের বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেন। প্রথমে সে কাঠুরে, পরে ধীবর এবং অবশেষে সে কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করে।[107] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিতে প্রভাবিত কাব্যগুলিতে চন্দ্রধর বণিকের এই দুর্দ্দশা অবশ্যই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত। চন্দ্রধর বণিকও অবশেষে মনসাকে পূজো দিতে বাধ্য হয়। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিতে পরিপুষ্ট কাব্যে কবিদের কাছে আধ্যাত্মিকতার স্থান মানবিকতার থেকে সর্বাগ্রে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষদের পেশার নিরিখে বিচার করে তাদের চারিত্রিক স্খলন ঘটায়। এখন দেখা প্রয়োজন চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যকাররা কি একইভাবে নিম্নবর্ণের চারিত্রিক বিশ্লেষণ ঘটিয়েছেন? চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য কোন উচ্চবর্ণের পূজা পাওয়ার প্রয়োজন ছিলনা। কারণ শিবের পত্নী হওয়ার সুবাদে সে প্রথম থেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তার যাত্রা কেবলমাত্র ছিল সমাজে স্বামী ভিন্ন নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে

[106] *তদেব*, ২৩৩।

[107] *তদেব*, ২৩৭-২৪০।

তোলার। এর ফলপ্রসূ, তিনি সর্বপ্রথম ব্যাধকে রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাধের উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাধ রাজা কালকেতুর নগরে ছত্রিশ জাতির অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ টোলা বসিল নগর মাঝারে।
কত জাতি ব্রাহ্মণ বৈসে লেখা নাহি তারে।।
কাএস্ত বসিয়া গেল বৈদ্য আশি ঘর।
পশ্চিমে বাণিয়া বৈসে লএ কৈতর।।
কৈবর্ত্ত্য বসি গেল নগর মাঝারে।
গুড়ি গুড়ি কুড়ি বসিল থরে।।
তেলি মালী বসি গেল কুমার কামার।
ছত্রিশ জাতি প্রজা বৈসে বীরের বাজার।।"[108]

উপরিউক্ত উক্তিতে দেখা যায়, কালকেতুর নগরে ব্রাহ্মণের অবস্থান নগরের ঠিক মাঝে। কারণ সমাজে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর কায়স্থ ও বৈদ্যের অবস্থান। নগরের পশ্চিমে বণিকের বসবাসের সাথে, নগরে কৈবর্ত্ত্যের অবস্থানও লক্ষ্যণীয়। এরপর তেলি, মালী, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতির অবস্থানের কথা চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা উল্লেখ করেছেন। কালকেতুর গুজরাট নগরে ছত্রিশ জাতির অবস্থানের সাথে তাদের বিভিন্ন বৃত্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কৈবর্ত্ত্য যুক্ত কৃষিকার্যের সঙ্গে, বারুই যুক্ত পানের ব্যবসার সাথে, বাণিয়া যুক্ত বানিজ্যের সাথে, গোয়ালা যুক্ত দুধের ব্যবসার সঙ্গে, মোদক যুক্ত মিষ্টান্ন ব্যবসার সঙ্গে, চাঁড়াল ও মাছুয়া যুক্ত মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে প্রভৃতি।[109] কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এই ছত্রিশ জাতির কোন জাতিকেই কবিরা চারিত্রিক স্খলনের ভিত্তিতে বিচার করেননি। কেবলমাত্র ভাড়ু দত্ত ব্যতীত। কিন্তু একক ব্যক্তির ব্যাখ্যা নিরিখে চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা সমগ্র জাতিকে বিশ্লেষণ করেননি। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি পর্বেও কোন জাতির

---

[108] মাণিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুনীল কুমার ওঝা (সং), পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ১১৩।

[109] *তদেব।*

চারিত্রিক স্খলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব বলা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য এ কবিরা বর্ণভিত্তিক চর্চাকে ব্রাহ্মণীবাদী রাজনীতির আওতাভুক্ত করে শ্রেণী ও ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কিন্তু সেরূপ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়না।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিম্নবর্ণের দেবী মনসাকে কবিরা সার্বিকভাবে গ্রহণ করলেও, নিম্নবর্ণের মানুষদের তারা গ্রহণ করেননি। কারণ মনসার বিভিন্ন শঠ অভিসন্ধির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষের বৃত্তি অবলম্বন করা, মূলতঃ সেই শ্রেণিগুলিকে বদনাম করার উদ্দেশ্যেই আলোচিত। কবিরা কাব্যের ছলে যদিও আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করে তার বর্ণনা করার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির ষড়যন্ত্রই প্রতিফলিত হয়। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কিন্তু এরকম কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। তবে বলা প্রয়োজন, কালকেতু নগরের বর্ণনা এবং সেখানে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণীয় জাতির পৃথক অবস্থান অন্য এক শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের বিবরণ প্রদান করে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা তথা যেকোন সময়কালীন সমাজে, 'লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান'কে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা 'নারীর সামাজিক অবদমন' প্রসঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হয়ে পড়ি। মঙ্গলকাব্যের নারীদের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত পূর্বের এবং সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত গবেষণাগুলিতেও, উল্লেখিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। জয়া সেনগুপ্তের রচনাতে বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুরাবস্থার[1] এবং স্বল্প ক্ষেত্রে নারীর সচেতনতার চিত্র পাওয়া যায়। আবার মনসামঙ্গলের নিরিখে বিশ্লেষিত গবেষণাগুলিতেও নারীর সামাজিক অবহেলার রূপ পর্যালোচিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক অবদমন সর্বকালেই বিদ্যমান। বর্তমান আলোচনায়, লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র 'নারীকেন্দ্রিক' ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, 'নারী-পুরুষ' এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া 'যৌনতাকে' আলোচনার মূল অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে তার অন্তর্জালের আবরণে 'নারী' ও 'পুরুষ' উভয়কে বেষ্ঠন করে 'লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে' কায়েম করেছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজনীয়।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আধ্যাত্মিকতার পর্দার বিমোচন ঘটালে মানবজীবনের গূঢ়সত্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষশাসিত সমাজ তথা পরিবারে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। তবে, উভয় মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত 'নারীর সংগ্রাম' কেবলমাত্র সমাজের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাহীন নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্তর্নিহিত ক্ষমতাসম্পন্ন নারী তথা দেবীরাও উক্ত পরিসরের অন্তর্গত। উদাহরণ হিসেবে, 'মনসামঙ্গল' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'মনসা ও চণ্ডীর' সামাজিক অবস্থানকে অনুমান করা যায়। 'নারী' হিসেবে মনসা স্বয়ং পিতা ও পতি

---

[1] জয়া সেনগুপ্ত, *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী,* (কলকাতাঃ ক্যাম্প,২০০১), ২২৭-২৪৫।

কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় বিভিন্ন সামাজিক বঞ্চনার শিকার। চণ্ডীও কেবলমাত্র ‘নারী’ হওয়ার সুবাদে, সমাজে তার দেবীসত্তা প্রতিষ্ঠার পথও সুগম নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক অবদমন ব্যতীত এমন কিছু বিষয় রয়েছে, ( যেমনঃ ‘ নারীদের শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা’, ‘ তাদের ভয়’, ‘চক্রান্ত’, ‘ ঈর্ষা’, ‘ যৌনতা’ প্রভৃতি) যা পিতৃতন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ পুরুষ দ্বারা রচিত কাব্যে নারীর ‘ হীনমন্যতা’কে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশ্লেষণ করে, ‘ লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান’কে নির্ণয় করা বর্তমান আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু।

## ৫.১ সন্তান প্রজননে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান

‘পরিবার’ প্রধানত সমাজের মুখমণ্ডল। অতএব, সমাজে নারীদের অবস্থানকে অনুধাবন করার পূর্বে প্রয়োজন পরিবারে নারীদের স্থানকে চিহ্নিত করা। প্রাচীন ভারতে নারীরা স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ন হলেও, মনুসংহিতার সময় থেকে তাদের সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপর নারীদের জীবনের প্রধান তিনটি পর্ব, যথাঃ কন্যা, জায়া ও জননী ক্রমশ পুরুষের অধীনস্ত হয়।

“বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।।”[2]

মনুসংহিতা থেকে গৃহীত উক্তি অনুযায়ী, নারীর জীবনের ‘ পরিসর’ প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার, বিবাহের পর পতির এবং বৃদ্ধাকালে পুত্রের অধীনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী, উক্ত ‘ পরিসর’ বর্হিভূত নারী মূলত সমাজ পরিত্যক্ত। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ এবং মঙ্গলকাব্যের দেবীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ‘ মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের ‘ নারীকেন্দ্রিক’ বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করলে, আলোচ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। সামাজিক রসদকে অবলম্বন করে রচিত কাব্যগুলিতে

---

[2] *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতাঃ সদেশ, ২০১১), ৫।

বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের প্রতিফলন ঘটবে, তা স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হল, পিতৃতান্ত্রিক কাব্যগুলির মাধ্যমে পরিবারে নারীদের অবস্থার কিরকম প্রতিফলন দেখা যায়?

মধ্যযুগীয় সমাজে পুত্রসন্তানই একান্তভাবে কাম্য। রমণী নিজেও সর্বদা পুত্রসন্তানের কামনা করে। পরিবারে পুত্রসন্তানের জন্ম ও তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের আচার অনুষ্ঠান কি সমভাবে কন্যা সন্তানের জন্যও প্রতিপালিত হয়? মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের নিরিখে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের’ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতার পর পুত্রই মূলতঃ পরিবারের মাথা। পুত্রসন্তান কূল বা বংশ রক্ষা করে। আবার বিভিন্ন বিপদ থেকেও পরিবারকে রক্ষা করে। অপরদিকে যোগ্য পুত্রসন্তানের প্রসব ব্যতীত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার তথা সমাজে নারীর অন্যান্য ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়না। মঙ্গলকাব্যে কন্যা সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রে কোনরকম বৈরী মনোভাব প্রদর্শিত না হলেও, তাদের প্রতি সামাজিক কাম্যতার কোন উল্লেখ নেই। বংশীদাস কর্তৃক রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী নিজে নারী হয়েও পুত্রসন্তানের কামনা করে।

“শিবের ঔরসে পুত্র না হইল আর।
কার্ত্তিক গনেশ তানা অংশ দেবতার।।”[3]

উপরিউক্ত উক্তিতে দেবী চণ্ডীর পুত্রসন্তানের কামনা পরোক্ষভাবে পিতৃতান্ত্রিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ। অনুরূপভাবে, জরৎকারু মুণি কর্তৃক মনসাকে পরিত্যাগের সময়ে তার পুত্রসন্তানের কামনা, উল্লেখিত ধারণার প্রেক্ষিতে অপর একটি উদাহরণ বহন করে। জরুৎকারুর মনসাকে ‘পুত্র সন্তানের’ আশীর্বাদ প্রদানের বিষয়টি মনসামঙ্গলের কবিরা বিভিন্ন সংস্করণে ব্যাখ্যা করেছেন। আনুমানিক ১৪০৬, মতান্তরে ১৪০৭[4] শকাব্দে রচিত বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল’ এ

---

[3] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮), ১০৫।

[4] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৪।

মনসার পুত্র সন্তানের কামনা, প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের’ ধারণাকে সুদৃঢ় করে। বিজয়গুপ্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী,

“চারিভিতে বহে ঝড়,        দেখি প্রাণে লাগে ডর,
কেমনে বঞ্চিব স্বামী বিনে।**********
*************************
পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয়।
হাসিয়া মুনিবর পূর্ব্ব কথা কয়।।
তোমার দোষ নাহি কিছু আছে দৈব হেতু।
আজু হইতে তোমার গর্ভে রহিবেক ঋতু।।
অষ্ট জন পুত্র হবে তোমার সম্পূর্ণ সময়।”[5]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহিত একাকী রমণীর একমাত্র ভরসা পুত্রসন্তান। পুত্রসন্তান তাকে ও তার পরিবারকে সামাজিকভাবে সুরক্ষা প্রদান করবে। কিন্তু কন্যাসন্তানের জন্ম হলে তার রক্ষা করবে কে? জরুৎকারু এই উদ্দেশ্যে এক নয় ‘আটজন’ পুত্রের বরপ্রদান করেন। ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ বা ১৪৯৬[6] সালে রচিত, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসা-বিজয়’ এ আবার মনসার ‘পুত্র ও কন্যা’ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সন্তানের কামনা থাকলেও, তার পতি তাকে পুত্রসন্তানের আশিস প্রদান করেন। উক্তিটি ঠিক এইরূপ যে,

“বলন্তি বিষহরি        আমি যে একেশ্বরী
সংহতি নাহি পুত্র-সুতা******* ।
*********************
শুনিয়া মুনিবর        পদ্মা-গর্ভে কর
বুলায় সুসন্তান উৎপত্তি
আস্তিক নাম তার        হইব সুকুমার
করিব ইন্দ্রের উদ্ধার।”[7]

---

[5] *তদেব*, ৩০।

[6] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮), iv-v।

[7] *তদেব*, ৪৫।

অতএব বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের সন্তান ধারণের আশীর্বাদ একমাত্র পুত্রসন্তান জন্মানোর উদ্দেশ্যেই গৃহীত। কন্যা সন্তান জন্মানোর উপলক্ষে কোনোরকম আশীর্বাদ প্রদানের রীতি লক্ষ্য করা যায়না।

কূল বা বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে পুত্রসন্তানের প্রয়োজনীয়তা মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাপুত্র আস্তিকের জন্মের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত। এর ব্যাখ্যা প্রধানত ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' ও জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' এ পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই 'পিতৃকূল' ও 'মাতৃকূলে'র উদ্ধারের ক্ষেত্রে, আস্তিক জন্মের প্রেক্ষাপট মূলতঃ তৎকালীন সমাজের লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতিকে বর্ণনা করে। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে উদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী জরৎকারুর পিতৃলোককে উদ্ধারের কল্পে পদ্মার গর্ভে আস্তিকের জন্মের বিবরণ পাওয়া যায়।

"পদ্মার বাক্যে মুনির হইল স্মরণ।
পিতৃলোকে যা কহিল পুত্রের কারণ।।
হৃদয়ে ভাবিয়া মুনি লাগে বলিবার।
আছয়ে উত্তম পুত্র উদরে তোমার।।"[৪]

উল্লেখিত কাব্যের অংশ অনুযায়ী পুত্র কর্তৃক পিতৃলোক উদ্ধার না হলে তার অবস্থান হয় নরকে। বংশ রক্ষার তাগিদে তাই পুত্রসন্তান প্রয়োজনীয়। এর ফলপ্রসূ সমাজে নারীর ভূমিকা অথবা তাদের জন্মের তাগিদ, কেবলমাত্র পরবর্তী পুত্রসন্তানকে জন্ম দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র পিতৃলোক নয়, মাতৃলোকে রক্ষার জন্যেও জগজ্জীবন তার কাব্যে আস্তিক মুণির জন্মের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন,

"জরৎকারু মুনিরে বিভা দেহ মহেশ্বরে
মুনিতেজে জন্মিবে নন্দন।

[৪] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮), ১৫৭।

আস্তিক হইবে নাম          নানা গুণে অনুপাম
নাগ রক্ষা করিবে সে জন।।"[9]

উল্লেখিত উক্তির মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, নাগকূল অর্থাৎ মাতৃকূল রক্ষার জন্যই আস্তিকের জন্ম। মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের কবিরা পরবর্তীকালে আস্তিকের 'নাগকূল' রক্ষার বিষয়টিকে মহাভারতের 'জন্মজেয়' পর্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'বংশরক্ষার' বিষয়কে আধার করে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি সমাজে 'পুরুষ' ও 'নারীর' মধ্যে ব্যবধান নির্মাণ করে, সমাজে পুরুষের প্রাধান্যকে উপস্থাপন করেছে। বংশরক্ষার তাগিদ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে এতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে, যেখানে পুত্রবিয়োগের শোকও সেখানে সীমিত হয়ে পড়ে। চন্দ্র বণিকের সাত পুত্রের মৃত্যুর পর তার কাছে পুত্রশোক অপেক্ষা বংশরক্ষার তাগিদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

"নিষ্ঠুর পদ্মার নাগ পুত্র মোর দংশে।
তর্পন করিতে মোর না থুইল বংশে।"[10]

পুত্র সন্তানের কামনা যে প্রধানত তর্পনের মাধ্যমে পিতৃকুলকে জল প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত, উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ স্বয়ং 'পুত্র সন্তান'কেও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত করে। সেই কারণে পুত্র বিয়োগ ঘটলে, তার শোক ভুলে পুনরায় 'পুত্র সন্তান' জন্ম দেওয়ার আদেশ পুত্র বিয়োগী নারীর ওপর বর্তায়। আর সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ধারণার বাহক হিসেবে চাঁদ সওদাগরও তার পত্নীকে সেই নির্দেশ প্রদান করেন। চাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী, সনকাকে পুত্রশোক পরিত্যাগ করে পুনরায় 'পুত্র সন্তান' প্রসবের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলা হয়।[11] চাঁদের এই নির্দেশ পিতৃতান্ত্রিক আদেশের প্রতিফলিত রূপ। তবে, কন্যা সন্তানের

---

[9] জগজ্জীবন ঘোষাল, *মনসামঙ্গল,* শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৬০), ১০১।
[10] বিপ্রদাস পিপিলাই, *মনসাবিজয়,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশনার সময়কাল অনুপস্থিত), ২০৮।
[11] *তদেব,* ১৩২।

জন্ম কেবলমাত্র পুত্র প্রসবের কারণের জন্য হলেও, পুত্রসন্তানের জন্মও প্রকৃতপক্ষে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই বর্ণিত। সমাজে এখানে প্রাধান্য অপেক্ষা ‘প্রয়োজনে’র গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রয়োজনের তাগিদে ‘ পুত্র’ ও ‘ কন্যা’ উভয়েই ‘ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির’ অন্তর্গত হয়ে পড়ে। পুত্রসন্তানের প্রয়োজনের বিষয়টি চণ্ডীমঙ্গলের ‘খুল্লনার’ ক্ষেত্রে অন্যরূপ। পারিবারিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে খুল্লনা দেবী চণ্ডীর কাছে পুত্রসন্তানের অভিলাষ প্রকাশ করে, এবং দেবী চণ্ডীও সেই আকাঙ্খা পূরণ করে।

“দেবী বোলে শুন বাক্য খুলনা যুবতী।
এই বর দিলাম তোরে আইসক নিজ পতি।।
স্বামীর সুভার্য্যা হইয়া জিনিবা সতিনী।
এই গর্ভে পুত্র ধর শুন সুবদনী।।”[12]

খুল্লনার ব্রতফল অনুযায়ী সে তখনই সুভার্য্যা ও পতি প্রেয়সী হয়ে উঠবে, যখন সে পুত্রসন্তানের জননী হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খুল্লনার ‘বর’ বা ‘ব্রতফল’ মূলতঃ দেবী চণ্ডীর কণ্ঠ প্রসূত হয়ে পিতৃতন্ত্রেরই বাণীই ধ্বনিত করে। কারণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী লহনা সন্তানহীন। সন্তানহীন রমণী প্রকৃতপক্ষে সমাজের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। পরিবারে সন্তানহীন সতীনের অধিকার খর্ব করার জন্য খুল্লনা এই ব্রত উজ্জ্বাপন করে। পরিবারে পুত্র সন্তানের প্রয়োজনীয়তা এর মাধ্যমে ‘ নারীর’ পারিবারিক তথা সামাজিক অবস্থার উন্নতির একমাত্র কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলপ্রসূ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্র সন্তানের স্বতন্ত্র গুরুত্বও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্মের পর সমাজে তাদের অধিকার নিয়েও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি বর্তমান। লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি অনুযায়ী চন্দ্রধর বণিক ও ধনপতি বণিকের পুত্ররা যেখানে গুরুগৃহে শিক্ষার সুযোগ পায়, সেখানে

[12] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ১৫৩।

বেহুলা তথা অন্যান্য রমণীদের গৃহস্থালির কর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ তাকে লক্ষ্মীমন্ত গৃহিণী হতে হবে। এখানেই মূলতঃ তাদের লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে চিহ্নিত করা যায়।

## ৫.২ <u>বিবাহের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি</u>

পিতৃতন্ত্র বিবাহভিত্তিক বিষয়টিকেও কিভাবে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত করে এই প্রসঙ্গে তার আলোচনা করা প্রয়োজন। বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিবাহের 'পাত্র' ও 'পাত্রীর' যোগ্যতা বিচার করা। পাত্রের যোগ্যতা তার বংশ ও সম্পদের নিরিখে হয়। আবার কন্যার যোগ্যতা বিচার হয় তার 'বয়স' ও 'কর্ম নিপুণতার' নিরিখে। বিবাহের যোগ্যতা পরীক্ষা নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব, উভয়েই পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি অন্তর্গত। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর যেরকম বৈবাহিক বয়সের নির্ণায়ক রয়েছে, সমাজে সেইরকম নিয়ন্ত্রণ কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়না। কারণ কুলীন প্রথার চক্রান্তে নির্মিত বহুবিবাহভিত্তিক সমাজে যদি পুরুষের বিবাহের সময়ও নির্ধারন করা হয়, তাহলে কুলীন প্রথার উদ্দেশ্যের বিলুপ্তিকরণ ঘটবে। অতএব, 'সোনার আঙটি বাঁকা' প্রবাদের মতোই পুরুষের বিবাহের কোন বয়স হয়না। বিবাহে শিবের সাথে পার্বতীর বয়সের ব্যবধান এই মতবাদের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করে।

"বুড়ার বেশ হঞা শিব হাসি ২ পড়ে।
কথা কহিতে শিবের দন্ত গোলা নড়ে।।"[13]

মাণিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও আধ্যাত্মিকতার মোড়কে শিবের বৃদ্ধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক মোড়কের বিমোচন ঘটলে কুলীন প্রথার আওতাভুক্ত বহুবিবাহভিত্তিক সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বহুবিবাহকেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর বিবাহের বয়স বারো বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেও, উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী পাত্র বৃদ্ধ হলেও সে বিবাহের যোগ্য। কিন্তু

---

[13]শ্রী সুনীল কুমার ওঝা, *মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল,* কলাবিভাগে পি.এইচ.ডি ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, ( উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৮১), ১৩।

নারীর বিবাহ অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে বা তার পূর্বে করা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক যুগে নারীর বিবাহের বয়সকে কেন্দ্র করে সমাজ সংস্কারক এবং গোঁড়া হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। প্রধানত ফুলমনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রমণীদের বিবাহের বয়স বারো বছরে নির্ধারন করা হয়। এই প্রসঙ্গে গোঁড়া হিন্দু সমাজ মনে করে, নারীর বিবাহের বয়স বারো বছর নির্ধারিত হলে হিন্দু শাস্ত্র দ্বারা নির্মিত 'গর্ভধান'[14] চক্রের খণ্ডন হবে। এই চক্র অনুযায়ী, নারীর প্রথম রজঃস্বলার ষোলদিনের মধ্যেই তাকে স্বামীর সাথে সহবাসের নির্দেশ হিন্দু শাস্ত্র প্রদান করে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী প্রকৃত হিন্দুরা অবশ্যই এই নির্দেশ পালন করবে।[15] তারা আরও বলেন যে, ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী যদি হিন্দুরা তাদের কন্যাদের বারো বছর বয়সে বিবাহ দেন, তাহলে তারা নরকগামী হবে। কারণ রজঃস্বলার পর নারীদের গর্ভাশয় দূষিত হয়ে পড়ে।[16] তাই কোন নারীর যদি বিবাহের পূর্বে রজঃস্বলা হয় তাহলে তার সন্তান এবং পরিবার ধর্মচ্যুত হবে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ঔপনিবেশিক সরকারের এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমনকি তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[17] ঔপনিবেশিক আমলে বিবাহ নির্ণায়ক আইনকে কেন্দ্র করে নারীর শরীর রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

নারীর বিবাহের বয়সকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার উক্তি অনুযায়ী কন্যা যদি বারো বৎসর বয়স অবধি পিতৃগৃহে থাকে তাহলে পিতা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা করলে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হবেঃ

"সপ্ত বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী

---

[14] Tanika Sarkar, A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal, *Feminist Studies*, Vol. 26, No. 3, (Autumn, 2000): 601.

[15] *তদেব*, ৬০১।

[16] *তদেব*, ৬০৩।

[17] *তদেব*, ৬০৪-৬২২।

পণ বিনে করিব সমর্পন।
নবম বৎসরে যদি           বর পাই যথাবিধি
তনয়া করিয়ে সম্প্রদান
তার পুত্র দিলে জল         সুরলোকে পাই স্থল
পিতৃলোকে হয় বহুমান।
না বুঝায় কেহ তোমা        গত হইল দশ সমা
তথাপি না হৈল কন্যাদান
পরবেশে একাদশে             হৃদয়ে মদন বৈসে
নবরস হয় এক স্থান।
না করি সে কর্ম ভাল          এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়
দ্বাদশ বৎসর বেলা            রজস্বলা হয় বালা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়।”[18]

‘রজঃস্বলার’ বিষয়টিকে স্মরণে রেখে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর বিবাহের ‘ সঠিক’ সময় নির্ধারন করে। কারণ রজঃস্বলার পর থেকে নারীর শারীরিক গঠনের সাথে মানসিকতাও পরিপূর্ণ হতে থাকে। নারী তার ‘ শরীর’ সম্বন্ধে জানতে শুরু করে। এরফলে তার বুদ্ধি ও মানসিকতারও বিকাশ ঘটতে থাকে। আর ক্রম বিকাশপ্রাপ্ত মানসিকতা সম্পন্ন নারীকে অবদমন করা সম্ভব নয়। পিতার বংশরক্ষার অন্তরালে নারীর বিবাহের বয়সের পর্যায়ক্রম নির্ণয় করে। এই পর্যায়ক্রম অনুযায়ী ‘কন্যার যদি সাত বছর বয়সে বিবাহ হয় তাহলে তার পুত্র কুলের রক্ষাকর্তা হয়। কোন নারীর যদি নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয় তাহলে তার পুত্রের তর্পনে পিতৃলোক স্বর্গারোহন করে’। পিতৃতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী প্রধানত ‘ দশ বৎসর বয়স থেকেই নারীর চরিত্রের অধঃপতন ঘটতে শুরু করে। একাদশ বৎসরে তার মধ্যে ‘ নবরসের’ সৃষ্টি হয়। আর দ্বাদশ বৎসরে সে আর শুদ্ধমতি থাকেনা’। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারণা অনুযায়ী দ্বাদশ বৎসর বয়সে নারীর শারীরিক গঠনগত পরিবর্তনের জন্য ‘ কাম’, ‘ প্রেম’ প্রভৃতি শারীরিক চাহিদাগুলির সৃষ্টি হয়। নারীর তাই শারীরিক বোধ জাগরণের পূর্বেই তাকে গোত্রান্তর করে দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যায় যে, নারীকে সম্পূর্ণরূপে

[18] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১১৩।

নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সমাজ বিবাহ নামক পন্থা গ্রহণ করে। মনসামঙ্গলের বেহুলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বেহুলার দ্বাদশ বৎসরেও বিবাহ না হওয়ার জন্য চন্দ্র বণিক কর্তৃক সাহ বণিকের প্রতি ভ্রূকুটি জ্ঞাপন, এই মতের সপক্ষে দৃষ্টান্ত জ্ঞাপন করে।[19] এছাড়া সাহ বণিকেরও কন্যাকে বিবাহ না দেওয়ার জন্য লজ্জিত হওয়া, এবং চন্দ্র বণিকের  সাথে মনসার বিবাদের বিষয় অবগত হয়েও নিজ পুত্রীকে দ্রুত গোত্রান্তর করে দেওয়া, এই বিষয়ের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। এর মাধ্যমে বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার সামাজিক অবস্থানকে অনুমান করা যায়।

কুলীনপ্রথার প্রভাবে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা অনেকসময় যৌতুক বা পণ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, সাত বৎসরের কন্যার বিবাহ হলে পণ বা যৌতুক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবে, পুত্রপণ থাকলেও কন্যাপণও ছিল। মুকুন্দরাম কর্তৃক বিরচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এ এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ধনপতি কর্তৃক প্রেরিত, দনাই পণ্ডিতের লক্ষপতি বণিককে কন্যা বয়সের নিরিখে পরামর্শ দেওয়ার বিষয়টি এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

“আমার বচন শুন          যদি নাহী নেহ পণ
তবে কন্যা করাব মুকতি।”[20]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার ওপর কন্যার ‘বয়সের’ ভার আরোপ করে ‘কন্যাপণের’ বিষয়টিকে উহ্য করে দেয়। অতএব, কন্যাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করার কারণে ‘কন্যাপণের’ বিষয়টি ক্রমে অদৃশ্য হয়ে, তা ‘যৌতুক’ বা ‘পণপ্রথায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতে ‘স্ত্রীধন’ বা ‘যৌতুক’ এর বিষয়কে কেন্দ্র করে শাস্ত্রভিত্তিক বিতর্ক বর্তমান। বর্তমান সময়ে আমরা Dowry বলতে যেটা বোঝায়, তা মূলতঃ ঔপনিবেশিক শব্দচয়নের প্রতিরূপ।

---

[19] ক্ষেমানন্দ দাস, *মনসামঙ্গল,* (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন্‌ প্রেস,১৩১৬), ১৪।
[20] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১১৩।

প্রকৃতপক্ষে ‘ স্ত্রীধনের’ সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ ভারতীয় বিবাহের মধ্যে কেবলমাত্র ‘অসুর’ বিবাহে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করে।[21] একে শুল্ক অপেক্ষা ‘পণ’ বলাই শ্রেয়। স্ত্রীধন মূলতঃ কন্যার পিতামাতা বা তার পরিবারবর্গের তাকে প্রদেয় উপহার, যা নিয়ে নারীরা শ্বশুরবাড়িতে গমন করে। তবে, উপহারের উপর সেই স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারোর কোন অধিকার বর্তায় না। যৌতুক আবার স্ত্রীধনের অন্তবর্তী একটি বিষয়। সুকুমারী ভট্টাচার্য তার প্রবন্ধে স্ত্রীধনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। তার ধারণা অনুযায়ী ‘স্ত্রীধন’ মূলতঃ নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, যা তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। প্রথম, ‘পণ’, যা নারীর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, ‘যৌতুক’ বা নারীর বিবাহের সময় প্রদেয় উপহার। তৃতীয়ত, ‘ সৌদায়িক’ বা বিবাহের সময় ‘ পাত্র-পাত্রী’কে উভয়ের পরিবার ও পরিজন কর্তৃক প্রদত্ত উপহার।[22] এর বাইরে পণপ্রথার বিষয়টি মনু সংহিতা শুরু করে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে একেবারেই নিষিদ্ধ।[23] যৌতুক আবার অনেকক্ষেত্রে নারীরা বিবাহের পর আশীর্বাদস্বরূপ শ্বশুর বা শাশুড়ির থেকে লাভ করে, যা পিতৃদত্ত হিসেবেও পরিচিত।[24] কিন্তু মধ্যযুগীয় কাব্যগুলিতে কন্যাপক্ষ কর্তৃক পাত্রপক্ষকে যৌতুক দেওয়ার যে রীতি রয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রে পণপ্রথার বাস্তব রূপ।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ‘ মনসামঙ্গল’ ও ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলি পর্যালোচনা করলে, এই বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল)’ থেকে ‘বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের বিবাহে’ যে যৌতুক প্রদানের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মূলতঃ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ‘পণপ্রথার’ বিষয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ দেবের রচনা থেকে শুধুমাত্র যৌতুক প্রদানের বিষয়ে ধারণা

---

[21] Sukumari Bhattacharji, “Economic Rights of Ancient Indian Women”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 26, No. 9/10 (Mar. 2-9, 1991): 507.

[22] *তদেব*, ৫০৮।

[23] *তদেব*।

[24] Anil Kumar Choudhary, "Stridhana" as depicted in "Vibhagasara" of Vidyapati”, *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 58 (1997): 329

করা যায় তা নয়, যৌতুককে কেন্দ্র করে শ্বশুরকূলের অসন্তোষও দৃশ্যমান। কাব্যের অংশটি ব্যাখ্যা করলে উপরিউক্ত মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। কাব্যের উদ্ধৃতি অনুযায়ী কন্যার পিতা নিজ কন্যাদানের সাথে নিজের সারা জীবনের পুঁজিও পাত্রপক্ষকে প্রদান করছে। পঙ্‌ক্তিটি এইরূপ যে,

"সাহে রাজা আইল কন্যা করিবারে দান।।
আপনার গোত্রাবলি নাম উচ্চারিয়া।
পঞ্চ হরিতকি দিয়া উহসিয়া।।
পালে ২ রাজহংস করিলেক দান।
সোনা রূপার দোলা দিল একসত খান।।
কর্পূর সহিতে বাটা দিল এর বিদ্যমান।
পালকি আনিয়া দিল করিতে দেওয়ান।।
বানির্জ্য করিতে দিল ডিঙ্গা সাতখান।
দুলিচা গালিচা দিল করিতে বিছান।।
দাস দাসি দান করিল বিস্তর।
অনেক আনিয়া দিল চুনিয়া পাথর।।"[25]

উক্তি অনুযায়ী বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের যৌতুকের পরিমাণ অনুমান করা যায়। কাব্যে পাঁচটি হরিতকি দিয়ে কন্যাদানের সাথে সাহে বণিক চন্দ্রধর বণিকের পুত্রকে একশত সোনা রূপার দোলা, বাণিজ্য করার উপলক্ষে সাতটি ডিঙ্গা, চুনির মতো মূল্যবান পাথর এবং দাসদাসী প্রদান করছে। বরপক্ষকে প্রদত্ত সম্পত্তি তার সারা জীবনের উপার্জিত সম্পদ। এই প্রেক্ষাপটকে যদি বেহুলার পিতা তথা সাহে বণিকের আবরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির শিকার কন্যার পিতা নিজেও সেই বিষয়ে ধারণা করা যায়। 'পুরুষ' হওয়া সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিকট থেকে তিনি রেহাই পাননি। এখন প্রশ্ন হল এই বিপুল পরিমাণ যৌতুক দেওয়ার পরও কি পাত্রপক্ষ সন্তুষ্ট? প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

"চান্দো দান ফেলায় সিচিয়া।

[25] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ৪৫।

আমার রার্য্যের লোকে    উপহাস্য করিবেক লোকে
দানের মহিমা সুনিঞা।।”[26]

সাহে বণিক কর্তৃক প্রদত্ত যৌতুক চন্দ্রধর বণিকের কাছে যে উপহাসের পাত্র উক্তিতে তা স্পষ্ট। কন্যাকে যৌতুক প্রদানের বিষয়টি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যেখানে ছিল উপহার তুল্য, সেখানে মধ্যযুগে যৌতুকে পাত্রপক্ষের অসন্তুষ্টির বিষয় সংযুক্ত হয়ে তা ‘পণপ্রথাতে’ই পরিবর্তিত হয়েছিল। অতএব, কন্যার শ্বশুরকূলকে সন্তুষ্ট করতে আরও যৌতুক প্রদান করতে হবে। পাত্রপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে সাহে বণিকও আরও যৌতুক প্রদান করে। নারায়ণ দেবের রচনাতেও তার আভাষ পাওয়া যায়।

“ভর্চ্ছিতে লাগিল সুমিত্রা সাউধালি-------
দানের লাহি পাইল অপমান।
সাত পাঁচ নাহে মোর    বিপুলা ঝি মোর
তাহারে করিলা কোন দান।।
সোনা রূপার জে থাকে    দেও নিয়া জামাতাকে
সুন্য দেও লিখিতে অপার।
ভালো চাইয়া একখান    তালুক দেও তুমি
থাকে জেন একসত খামার।।
জামাই না যায় জেন দেসান্তর    না হয় জেন সওদাগর
না করে জেন বানির্য্যেতে মন।
জাবত জিয়ে মোর    বেউলা লক্ষিন্দর
তাবত বসিয়া জেন খায়।।”[27]

পিতামাতা দ্বারা কন্যাকে যৌতুক প্রদানের প্রথম উদ্দেশ্য শ্বশুরবাড়িতে পাত্রী এবং পাত্রী পক্ষের বজায় রাখা। উপরিউক্ত উক্তিতেও সেই বিষয়টি স্পষ্ট। আর কন্যার মর্যাদা বজায় রাখার প্রধান অস্ত্র হল পাত্রপক্ষকে পণ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা। বেহুলার মা’ও তাই নিজের স্বামীকে একশত খামার সমেত একটা তালুক লিখে দেওয়ার কথা বলে, যাতে তার কন্যা ও জামাই নির্বিঘ্নে সারাজীবন

---

[26] *তদেব,* ৪৬।
[27] *তদেব।*

আমোদপ্রমোদে কাটাতে পারে। কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘খুল্লনার’ বিবাহের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম দামী যৌতুক প্রদানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সাহে বণিক বা লক্ষপতি বণিকের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার নিরুপায় অবস্থা প্রতিফলিত হয়। আর এই প্রেক্ষাপট মধ্যযুগে যৌতুক কেন্দ্রিক ‘লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতিকে’ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। তবে, চণ্ডীমঙ্গলে নিম্নশ্রেণীর বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদানের বিষয়টি অন্যরকম। সেখানে কন্যাকে বিভিন্ন যৌতুক প্রদান করে পুত্রের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। ফুল্লরা ও কালকেতুর বিবাহের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ছিল উল্লেখযোগ্য। কালকেতুর পিতা ধর্ম্মকেতু ‘নয় বুড়ী’[28] কড়ির বিনিময়ে ফুল্লরার পিতা পুষ্পকেতুর কাছ থেকে তাকে ক্রয় করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিও সমভাবে অপমানজনক। অতএব বলা যায়, ‘কন্যাপণ’ হোক বা ‘বরপণ’ বিবাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ‘পণপ্রথার’ বিষয়টি ‘নারী’ ও ‘পুরুষ’ উভয়কেই সামগ্রীতে রূপান্তর করে। তবে, উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান পুরুষের অনুপাতে অনেক বেশী অপমানজনক।

## ৫.৩ <u>সৌন্দর্যের নিরিখে নারীর ‘পয়মন্তে’র বিবেচনা</u>

বিবাহের ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ‘বিবাহে মঙ্গল কার্য সম্পাদন’। বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর উদ্দেশ্যে মঙ্গলকার্য সম্পাদন করে সাধারণত এয়ো বা সধবা স্ত্রীরা। বিধবা রমণীদের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। সমাজে পতির মৃত্যুর পর তারা সবরকম সামাজিক আনন্দ উপভোগ করার অধিকার হারান। বিধবা রমণীদের সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি পরে উল্লেখিত হবে। এর পূর্বে ‘মঙ্গলকার্য’ সম্পাদনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি কিভাবে নারীদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে মঙ্গলকার্য সম্পাদনের জন্য সুন্দরী ও লক্ষ্মীমন্ত সধবা স্ত্রীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘মঙ্গলকার্য’ সম্পাদনের জন্য তাদের কয়েকটি সামাজিক রীতিকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। প্রথমত, তাদের সধবা হতে হবে,

[28] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ৩৮।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে সৌভাগ্যবতী হতে হবে, তৃতীয়ত, তাদের সুন্দরী হতে হবে, আর চতুর্থত, তাদের পতিদের অবশ্যই সম্পদশালী ও সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। মঙ্গলকাব্যগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘মঙ্গলকার্য্যে’ কর্মরতা নারীদের ‘নামের’ ব্যাখ্যা প্রদান করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী ‘ বৈবাহিক মঙ্গলকার্য্যে’ ব্রতী রমণীদের নাম ‘দেবীদের’ নামের অনুরূপ। সুভদ্রা, সুশীলা, অরুন্ধতী, বিজয়া, রুক্মিণী, রতি, সতী, সত্যভামা, পার্বতী, তুলসী, যশোদা, যমুনা, গঙ্গা[29] ইত্যাদি নামের উল্লেখ মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। এরা মূলতঃ সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের গৃহবধূ। এদের নামের মধ্যে ‘দৈবীসত্তার’ প্রভাব মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির মস্তিষ্কপ্রসূত। এর প্রভাবে সমাজ ‘সৌন্দর্যকে’ বস্তুবাদী ধারণার অন্তর্গত করে। এর ফলপ্রসূ গুণ অপেক্ষা রূপের ভিত্তিতে নারীদের বিচার করা হয়। ‘ সৌন্দর্যকে’ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নারীদের মধ্যে ব্যবধানের বীজ বপন করে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলিতে ‘কুশ্রী’ বা ‘অসুন্দর’ এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত না হলেও, নারায়ণ দেব তার সৃষ্টিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। তার রচনায় তিনি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রমণীদের দিয়েই বিবাহে মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন।

“বিপুলার হইব বিহা    বিলমু না কর রয়া
সাহের বাড়ি চলি যাও ঝাটি।।
ব্রাহ্মণ খত্রের নারি    খেত্রি বস্যের কুমারি
জার আছে যতেক সুন্দরী।”[30]

---

[29] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ২৫০।

[30] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ২৮।

‘বিপুলা’ বা বেহুলার বিবাহের ক্ষেত্রে উল্লেখিত এই উক্তির মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, সমাজ ‘ সুন্দরী’ ও ‘ সধবা’ নারীদের মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি করেছে। তবে, নারায়ণ দেবের রচনায় কুমারী নারীরাও মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য তা সৌন্দর্যের নিরিখে। তার কাব্যে একদিকে যেমন ‘সুন্দরী’ রমণীর বর্ণনা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ‘অসৌন্দর্য’ এর প্রেক্ষিতেও বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রধানতঃ ‘ সুন্দর’ ও ‘ অসুন্দর’ এর ভেদাভেদ নারায়ণ দেবের কাব্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করা যায়। তার কাব্যের একটি অংশ ব্যাখ্যা করলে এ বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব হবে।

“ভাল আইয়া রতি করিল গমন।
আর আইয় না নিল কুরূপ কারণ।।
কুরূপের প্রধান আইওয় নাম তার ইছি।
দুই হাত পাও গোধ হইয়াছে বিচি।।
তাঁরে পাছে আইওয় চলে নাম তার ভালা।
গলায়ে গলগণ্ড তার দুই চক্ষু ঢেলা।।
তার পাছে আইওয় চলে নাম তার সুয়া।
পরপুরূস লইয়া করে ঘর সওয়ামী আচাভূয়া।।
তার পাছে আইওয় চলে নাম তার উলি।
স্বামীর হাতের কিল খাইয়া ফিরে বুলি।।”[31]

সৌন্দর্যহীন বা কুরূপের ভিত্তিতে সমাজ ‘ সতী’ ও ‘ অসতী’ রমণীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। সতী নারীর নামের উপর দৈবীসত্তার প্রভাব তার ‘ সুগৃহিনী’ হওয়ার বিষয়কে চিহ্নিত করে। অপরদিকে ‘ কুরূপে’র ব্যাখ্যা অনুযায়ী নারীদের নামের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যেও দৈবীসত্তার অভাব সুস্পষ্ট। সৌন্দর্যহীন নারীদের নামের ব্যাখ্যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে দিয়েছে তা হল, ‘ ইছি’, ‘ ভালা’, ‘ সুয়া’, ‘ উলি’, ‘ উসি’, ‘ আলি’, ‘ ঢালি’, ‘ কালি’, ‘ কপালি’ ইত্যাদি। উল্লেখিত নামগুলিকে পূর্বের সধবা নারীদের নামের সাথে তুলনামূলকভাবে বর্ণনা করলে, নামের মধ্যে

---

[31] *তদেব*, ৩০।

দৈবীসত্তার অভাবকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ উল্লেখিত নামের নারীদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে কটাক্ষ করে তাদের সমাজ বর্হিভূত করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই উক্ত রমণীদের কুরূপ তাদের দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে। এদের মধ্যে কেউ ‘ গোধ’, আবার ‘ গলগণ্ড’ রোগের শিকার। তবে, যে সব রমণীরা গৃহে নির্যাতনের শিকার বা একাধিক পুরুষ সঙ্গে যাদের অবস্থান, তাদেরকেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ‘ অসৌন্দর্যের’ আওতাভুক্ত করেছে। অতএব বলা যায়, ‘সৌন্দর্যকে’ কেন্দ্র করে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি ‘পয়মন্ত’ এবং ‘অপয়মন্তের’ নারীর ধারণাকে নির্ধারন করে।

বিবাহের ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই সুন্দর সাজসজ্জা প্রয়োজন। বিশেষত, নারীদের ক্ষেত্রে সজ্জার বাহার মঙ্গলকাব্যগুলি যেভাবে প্রদান করেছে, তার মাধ্যমে ‘male gaze’ বা পাত্রীর রূপের মাধ্যমে পাত্রকে বিমোহিত করার বিষয়কে অনুমান করা যায়। এই ধরণের লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে পাত্র ও পাত্রী উভয়েই যুক্ত হয়। তবে, সৌন্দর্যের মাধ্যমে পাত্র তথা পাত্রপক্ষকে বিমোহিত করার দায়ভার কন্যার ওপর আরোপিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, ‘male gaze’ কি?, এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে নারীর সৌন্দর্যকে এই ধারণার অন্তর্গত করে? মিশেল ফুকোর ধারণা অনুযায়ী ‘gaze’ হল এক ধরণের ‘ক্ষমতা’, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে ‘নজরাধীনে’ রাখা সম্ভব। ‘male gaze’ পুরুষের ক্ষমতায়ণ ঘটায়, যার ফলাফল হিসেবে নারী ক্রমে ‘বস্তু’তে পরিণত হয়।[32]

Edward Snow তার প্রবন্ধে ‘male gaze’ কে নারীবাদী ধারণার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী ‘male gaze’ হল এমন এক ধরণের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, যার মধ্যে নারীর সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা পুরুষের মনোরঞ্জনের উপাদান হয়ে ওঠে।[33] কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের উপাদান

[32] Patrica E. Johnson, “The Gendered Politics of the Gaze: Henry James and George Eliot”, *An Interdisciplinary Critical Journal*, Vol. 30, No. 1 (March 1997): 39.
[33] Edward Snow, “Theorizing the Male Gaze: Some Problems”, *Representations*, No. 25 (Winter, 1989): 30.

নয়, এই ধরণের পিতৃতান্ত্রিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যও ক্রমে 'পর্নগ্রাফিক'[34] বা ' অশ্লীল' উপকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। Elizabeth Skomp আবার চলচিত্র জগতে নারীবাদী সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'male gaze' এর বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন। তিনি Laura Mulvey এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বাখ্যা প্রদান করেছেন। তার মতে 'male gaze' এমন এক ধরণের 'চশমা' বা 'লেন্স', যার মাধ্যমে নারীর শরীরকে 'অশ্লীল' প্রেক্ষিতে 'বস্তুবাদী'[35] ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Abigail Lynn Coykendall আবার 'male gaze' কে 'শরীরকেন্দ্রিক রাজনীতির'[36] একটি অংশ বলে গণ্য করেছেন। আর নারীরা মূলতঃ এই রাজনীতির শিকার। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নারীকে সুসজ্জিত করার পিছনে পুরুষের যৌন আকাঙ্খা সংযুক্ত।

মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মনসা, চণ্ডী, বেহুলা এবং খুল্লনার বিবাহের ক্ষেত্রে প্রদত্ত 'সাজসজ্জার' বিবরণের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়কে অনুধাবন করা যায়। কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহের পাত্রীকে অবশ্যই মোহময়ী হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তার সাজসজ্জার সরঞ্জামও বিভিন্ন রকমের। সাজসজ্জার সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও আবার শ্রেণীভিত্তিক ব্যবধান রয়েছে। বেহুলার সজ্জার সরঞ্জাম হিসেবে নয় লক্ষের হাড়, হাতে সুবর্নের বাউটি, নাকে রত্ন গজমতি, পায়ে নূপুর, চোখে সুরমা বা কাজলের[37] বর্ণনা পাওয়া। অর্থাৎ নারীকে উল্লেখিত আভরণ সংযোগে এবং বিভিন্ন রকমভাবে কেশসজ্জার মাধ্যমে সর্বাঙ্গ সুন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় বিয়ের সাজে তাকে এমনভাবে মোহময়ী করে তুলতে হবে, যাতে সে স্বামীর মন জয় করতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে বহুবিবাহভিত্তিক সমাজে স্বামীর 'মন' জয় করা, নারীর বিশেষ কর্তৃব্যের অন্তর্গত। আর

---

[34] *তদেব*, ৩৩।

[35] Elizabeth Skomp, Misogyny, "the Male Gaze, and Fantasies of Female Death: "Eto ia, Edichka and Russkaia krasavitsa", *New Zealand Slavonic Journal*, Slavonic Journeys Across Two Hemispheres: Festschrift in honour of Arnold McMillin (2003): 137

[36] Abigail Lynn Coykendall, Bodies Cinematic, Bodies Politic: "The "Male" Gaze and the "Female" Gothic in De Palma's Carrie", *Journal of Narrative Theory*, Vol. 30, No. 3, Cinema & Narrative (Fall, 2000): 332-363।

[37] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ৪২।

এই কর্তৃব্য প্রতিপালনের মাধ্যমে নারী ক্রমে মনোরঞ্জনের সামগ্রীতে পরিণত হয়। বেহুলা ও খুল্লনার সজ্জার উপকরণে বিলাসিতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও, ফুল্লরার সাজসজ্জা প্রকৃতপক্ষে বিলাসিতাহীন। নারীদের সাজসজ্জার বিবরণ প্রধানত অর্থনৈতিক বিভাজনকে নির্দেশ করে। উল্লেখিত কারণে বণিক কন্যার আভরণ যেখানে লক্ষ টাকার গহনা, সেখানে ব্যাধকন্যার একমাত্র আভরণ 'মেটে সিঁদুর'।[38] 'মেটে সিঁদুর' তার বিবাহের চিহ্ন বহন করে। অতএব বলা যায়, উচ্চবিত্ত হোক বা নিম্নবিত্ত, স্বামীর মনকে মোহিত করার উদ্দেশ্যে পিতৃতান্ত্রিক নারীর শারীরিক সৌন্দর্যকে অনেক বেশী প্রাধান্য প্রদান করে।

শারীরিক সৌন্দর্যের নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবিরা বিভিন্ন সংস্করণে দেবীদের রূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। David Curley তার গ্রন্থে 'কামনা'র পরিপ্রেক্ষিতে দেবীদের নারীসত্তার কমনীয়তাকে উল্লেখ করেছেন।[39] বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল' এর স্বপ্ন অধ্যায়ের পালায় 'মনসা' নারীসত্তার বিবরণ পাওয়া যায়। কাব্য অনুযায়ী,

"শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহরে রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী।।
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন
হেনকালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন।।
গৌরবর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্রধারী।।
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি।।
চাঁচর মাথার কেশ জিনিয়া চামর।
সর্ব্বাঙ্গেতে বেড়িয়াছে সর্প অজগর।।"[40]

---

[38] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ৩৮।

[39] David Curley, 'Tribute Exchange and the Liminality of Foreign Merchants in Mukunda's Candimangal', *Poetry and History: Bengali Mangal Kavya and Social Change in Pre-colonial Bengal*, (New Delhi: Chronicle Books, 2008), 30.

[40] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৩

বিজয়গুপ্তের কাব্য থেকে 'মনসা'র সৌন্দর্যের কামোত্তেজক বর্ণনা পাওয়া যায়। সৌন্দর্যের নিরিখে যেহেতু নারীকে নির্বাচন করা হয়, তাই কবির স্বপ্নে দেবী অবশ্যই গৌরবর্ণা। উপরিউক্ত কাব্যাংশ কেবলমাত্র লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি নয়, বর্ণভিত্তিক রাজনীতিরও অন্তর্গত। কাব্যাংশের পঞ্চম বাক্যে মনসাকে 'ব্রাহ্মণ' কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ গৌরবর্ণা নারী অবশ্যই ব্রাহ্মণ কন্যা এবং রত্ন দ্বারা ভূষিতা। কবির স্বপ্নাদেশে কাঞ্চন বর্ণা মনসা দেবী কামের প্রতীক। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের স্বপ্নাধ্যায়ে 'মনসা' প্রকট হন 'মুচিনী' রূপে।[41] ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় 'মনসা' নিম্নবর্ণের দেবী। বিচিত্র পোশাকে বিরাজমান দেবী 'মনসা'র মনোরম সৌন্দর্যের উল্লেখ কবি করেননি। তবে, তার স্বপ্নাদেশে শ্রেণীভিত্তিক ব্যবধানের পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও 'স্বপ্নের' মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম, মাণিক দত্ত এবং রামানন্দ যতির কাব্যে ধনপতি এবং শ্রীমন্ত উভয়েই স্বপ্নে 'কমলেকামিনী' রূপ প্রত্যক্ষ করেন। 'কমলেকামিনী' প্রতীককে বিশ্লেষণ করলে 'কমলে' অর্থাৎ পদ্মফুলের মতো সুন্দর, এবং 'কামিনী' বা যার সৌন্দর্যে কামের উদ্রেগ ঘটে, এমন লিঙ্গভিত্তিক ধারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের কাব্যের উক্তি অনুসারে,

"অপরূপ দেখি আর শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার
ধরি রামা বামা করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার।
কনককমল-রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনা সুন্দরী কলাবতী
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী।
রাজহংসবর জিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
দশনখে দশ চাঁন্দ ভাসে
কোকনদ-দর্পহর রঞ্জিত তাহার কর

---

[41] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ৭।

অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে।
অধর বিম্বুক বন্ধু     বদন সরদ-ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।”[42]

কাব্যাংশ অনুসারে, ধনপতি পদ্মাসনে অধিষ্ঠাত্রী নারীকে প্রথমেই ‘কামিনী’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ ‘চণ্ডী’র দৈহিক সৌন্দর্যকে ‘লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির’ অন্তর্গত করা হয়েছে। এরপর বণিক তাকে ইন্দ্র পত্নী শচী, মদন দেব পত্নী কলাবতী, সরস্বতী, সত্যভামা, অরুন্ধতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার পদযুগল ও নখসমষ্টিকে ধনপতি রাজহংস এবং চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি কর্তৃক ‘কমলেকামিনী’র সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির অন্তর্গত। এর মাধ্যমে নারীর এমন এক রূপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের মনোরঞ্জন করা।

### ৫.৪ বহুবিবাহ ও পিতৃতন্ত্র

কুলীনপ্রথার আওতাভুক্ত বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর স্থান মূলত অনিশ্চিত। পরিবারে কোন একটি স্বতন্ত্র নারীর স্থান এক মুহুর্তেই অন্য নারীর দ্বারা স্থানান্তরিত হতে পারে। আর পরিবারে নিজের স্থান হারানোর ‘ভয়’ নারীর সবসময়ের, যা প্রকৃতপক্ষে পিতৃতন্ত্রেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তৎকালীন বহুবিবাহভিত্তিক সমাজে নারীর প্রধান ভয় মূলতঃ অপর একটি ‘নারী’ অথবা ‘সতীনের’। সতীন প্রধানত কাঁটার মতো। আর এই কাঁটাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য নারীদের বিভিন্ন ব্রত উৎযাপনের উল্লেখও পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে, আমরা ‘জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত’[43] এর কথা উল্লেখ করতে পারি। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত সংসারের মঙ্গল যেমন সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, তেমনি তা সতীনের

[42] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ২১৮।

[43] শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, “জয় মঙ্গলচণ্ডী (শ্রীমন্ত সদাগর)”, *মেয়েলি ব্রত ও কথা,* (কলিকাতাঃ বেঙ্গল মেডিকাল ল্যাইবেরী, ১৯০৮), ৮-২৩।

অত্যাচার থেকেও পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ও ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ এ খুল্লনার চণ্ডী ব্রত এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সংসারে সতীনের অধিকার খর্ব করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে অনুমান করার জন্য পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

“বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুলনা বাণ্যানী।
জয়ধ্বনি দিয়া পদ্মা পূজে নারায়ণী।।
********************
যেইখানে দূর্গাপূজা করয়ে যুবতী।
সেইখানে খুলনা হইল উপনীতি।।
খুলনা দেখিয়া পুছে পঞ্চকন্যাগণ।
ধীরে ধীরে খুলনারে করে জিজ্ঞাসন।।
********************
খুলনায়ে বোলে শুন পঞ্চ-কন্যাগণ।
অভাগী খুলনার দুঃখ করো নিবেদন।।
********************
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহো খণ্ডাইতে নারে।
অভাগী খুলনার বিহা সতিনীর ঘরে।।”[44]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, ‘মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত’ খুল্লনার পূর্বে অন্যান্য নারীদের মধ্যেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, সতীনের যন্ত্রণা খুল্লনার একার নয় অন্যান্য নারীদেরও। এরপর চণ্ডীকে প্রসন্ন করে খুল্লনা যে ব্রতফল লাভ করে তা হল,

“দেবী বোলে শুন বাক্য খুলনা যুবতী।
এই বর দিলাম তোরে আইসক নিজ পতি।।
স্বামীর সুভার্য্যা হইয়া জিনিবা সতিনী।
এই গর্ব্বে পুত্র ধর শুন সুবদনী।।”[45]

এখন প্রশ্ন হল, ‘সতীন বিদ্বেষ’ তথা নারীদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবের কারণ কী? তাদের সংকীর্ণ মনোভাবের পিছনে কী পিতৃতন্ত্রের কোনোরকম দায়বদ্ধতা কার্যকর নয়? এর

---

[44] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ১৫০-১৫১।

[45] *তদেব,* ১৫৩।

পিছনে কি পিতৃতন্ত্রের লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির আভাষ পাওয়া যাওয়া না? তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহের প্রাচুর্য নারীদের ‘ সতীন বিদ্বেষী’ মনোভাবের জন্য একান্তভাবে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে সতীনদের আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের ছবির প্রতিফলন ঘটিয়ে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পরিবারের রমণীদের কিভাবে থাকা উচিৎ তা নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। এরফলে তাদের উপর থেকে বহুবিবাহের দায় অনেকটা কমে যায়। আর ধর্মীয় কাব্যগুলি প্রধানত উক্ত ধারণার প্রাণকেন্দ্র। এখন পিতৃতন্ত্র সৃষ্ট উল্লেখিত ‘ধারণার’ প্রতিফলন কাব্য কিভাবে প্রদান করেছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা পরিবারে পুরুষই নারীর একমাত্র অবলম্বন। আর বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে স্বামী তার একান্ত আশ্রয়। তার আশ্রয় হারানোর ভয় সর্বদার। শুধুমাত্র সাধারণ নারী নয়, ‘দেবীদের’ ক্ষেত্রেও এই ভয় প্রযোজ্য। কারণ স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলে সমাজ সেই নারীর ভাগ্যকেই দায়ী করবে। দেবী চণ্ডীর মধ্যেও স্বামীর চরিত্র নিয়ে নিরাপত্তাহীন মানসিকতার আভাষ পাওয়া যায়। এই মানসিকতার কারণে সে ছদ্মবেশে শিবের চরিত্র পরীক্ষা করে। কারণ মনসামঙ্গল কাব্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চণ্ডী ব্যতীত শিবের অপর একটি পত্নী, ‘গঙ্গা’ বিদ্যমান। এরপর যদি আরও একজন সতীন যুক্ত হয়, তাহলে তাদের দুরাবস্থা বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে চণ্ডী সর্বদাই শিবকে নিজের কাছে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা করে। একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করলে এই বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব হবে।

“অনেক কহিলুঁ শিবে চরনতে ধরি।
আমা ছাড়ি না যাইও প্রভু ত্রিপুরারী।।
প্রথম প্রহর গেল হাস্য পরিহাসে।
দ্বিতীয় প্রহর গেল কেলি কলা রসে।।
নিদ্রায় প্রবেশ কৈল তৃতীয় প্রহরে।
শিবের জটা খুলিয়া দিলাম শিয়রে।।
অর্দ্ধেক শাড়ীর পাটে কাঁকালী বেড়িয়া।
নয়নে নয়ন যুড়ি উরে উর দিয়া।।
এতেক প্রবন্ধ করি করিলুঁ শয়ন।

তথাচ না পাইলু কাল পুরুষের মন।।”[46]

পঙ্‌ক্তিটিতে চণ্ডীর মহাদেবকে নিজের বন্ধনে বেঁধে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, প্রকৃতপক্ষে স্বামীর কাছে স্ত্রীর গুরুত্বহীন অবস্থানকে উল্লেখ করে। ‘ মঙ্গলচণ্ডীর গীতে’ লহনার ক্ষেত্রেও স্বামীর মন পাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে হবু সতীনের প্রতি তার বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

“পুরুষ হয়ে দারুণ  কভো নহে আপন
আজু সে জানিলু নিশ্চয়।।
.............................................
এ ভর যৌবন কালে  সতা দেহি মোর তরে
বড়হি নিষ্ঠুর মোর স্বামী।।”[47]

স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি তার আসক্তি, নারীর কাছে দুঃখ অপেক্ষা অপমানের। অপমান কেবলমাত্র স্বামীর পুনরায় বিবাহের কারণে নয়। তার অপমান স্বামীর কাছে নিজের মূল্য হারানোর জন্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর ‘রূপ’ ও ‘যৌবন’কে কেন্দ্র করে ‘লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির’ অবতারণা করেছে। পিতৃতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী নারীর রূপ ও যৌবন যতক্ষণ বর্তমান, ততক্ষণ স্বামীর ভালোবাসা তার প্রাপ্য। কিন্তু তার সৌন্দর্য বিনষ্ট হলে স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে।

“লহনা লহনা বলি ডাকে সওদাগর
অভিমানে সাধে রামা না দেই উত্তর।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।”[48]

---

[46] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্‌, বৈশাখ ১৩১৮), ১৩০।

[47] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ১২২।

[48] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১১৬-১১৭।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লহনার অভিমান ভাঙানোর অছিলায় ধনপতি তার সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ার বিষয়কে চিহ্নিত করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে স্বয়ং ধনপতি লহনার অসুন্দর হয়ে যাওয়াকে তার অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই উক্তি প্রধানত বাস্তবিক সমাজের প্রতিফলন। অর্থাৎ পুরুষের চারিত্রিক দোষকে কোনভাবেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ উল্লেখ করেনা। অধিকন্তু পুরুষের চারিত্রিক স্খলনের জন্য তারা নারীদের শারীরিক অক্ষমতাকে দোষারোপ করে।

**৫.৫ <u>সতীনের অনিষ্টের ষড়যন্ত্র</u>**

রূপকে কেন্দ্র করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সতীনদের মধ্যে হিংষা এবং ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে। সৌন্দর্যের প্রতি 'হিংসা' ও 'ভয়'কে ভিত্তি করে এক নারী কিভাবে অপর নারীর রূপ বিনাশের চেষ্টা করে, তার প্রতিফলন পুরুষ কর্তৃক রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। মনসার সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষা হেতু চণ্ডী তার চোখ নষ্ট করে দেয়। 'চোখ' মানব শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুখমণ্ডলের প্রতি চোখের অবস্থান প্রধান আকর্ষণের কারণ। তাই চোখ যদি নষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে সম্পূর্ণ মুখের সৌন্দর্যই নষ্ট হবে। চণ্ডীর এই প্রয়াস সেই কারণে। মনসা চণ্ডীর সতীন না হলেও, সতীনের মেয়ে। সতীনের উপস্থিতি না থাকায় 'ভয়', 'রাগ' ও দুঃখের সম্মিলিত কারণে চণ্ডী তার চোখ নষ্ট করে দেয়। অপরদিকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে লহনা কর্তৃক খুল্লনার রূপ বিনাশের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে পিতৃতন্ত্রের ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এক নারীকে অপর নারীর শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, যাতে তাদের বহুবিবাহের প্রসঙ্গকে নারীরা প্রশ্ন করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে একটি উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

"খুল্লনার রূপ নাশ চিন্তেন উপায়
উপভোগ দূর হইলে রূপ নাশ জায়।
দুই জনে একত্রে বস্যা করেন জুগতি

কপট প্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।"[49]

উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে এই বিষয়টি স্বচ্ছ যে, স্বামীর কাছ থেকে সতীনকে চিরতরে দূর করে দেওয়ার জন্যই লহনার এই ষড়যন্ত্র। কারণ লহনার তার স্বামীকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই। মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী বিয়ের পর স্বামীই তার একমাত্র আশ্রয়। নারীর আশ্রয় হারানোর ভয় সর্বদাই। তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে সতীন খুল্লনাকে বলপূর্বক জঙ্গলে ছাগল চড়ানোর জন্য পাঠিয়ে তার রূপ ক্ষয় এবং সামাজিক কলঙ্ক রটানোর ষড়যন্ত্র করেন। কারণ রূপ ক্ষয় না হলেও, সামাজিক কলঙ্ক হলে স্বামী অবশ্যই তাকে পরিত্যাগ করবে।

সতীনকে কলঙ্কিত করে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস 'চণ্ডী' ও 'গঙ্গা'র কলহের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শিবকে কেন্দ্র করে তার দুই স্ত্রীর কোন্দল লৌকিক পরিবারের প্রতিফলিত রূপ। এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়।

"চণ্ডী বলে নির্লজ্জ লো তার লাজ না।
শিব তোরে বিবাহ করিল কোন ঠাঁই।।
তোর মতো নহি আমি পথিক ঢেমনি।
পর্বত রাজার কন্যা আমি সে ভবানী।।
...............................................
গঙ্গা বলে আলো চণ্ডী তুই বড় সতী।
মহিষাসুর চাহিল ভুঞ্জবারে রতি।।
সতত অসুর লইয়া ফিরহ পাগলি।
তাতে তুই বড় সতী সোহাগে আগলী।।
হাতে ধরি শুম্ভাসুর লইল গগনে।
একেশ্বর ছিলা পরপুরুষের সনে।।"[50]

---

[49] *তদেব*, ১৩৩।

[50] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮), ১৩২।

‘গঙ্গা’ ও ‘ চণ্ডীর’ একে অপরকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ‘ সতীন বিদ্বেষী’ মনোভাবের বাস্তবিক রূপ। উক্তিতে উভয় নারী একে অপরকে ‘অসতী’ প্রমাণে আগ্রহী। কারণ সতীন ‘অসতী’ প্রমাণিত হলে সে গৃহ তথা সমাজচ্যুত হবে। আর স্বামীর কাছে সে হবে সর্বেসর্বা। ‘গঙ্গা’ ও ‘চণ্ডীর’ বিবাদের অনুরূপ দ্বন্দ্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘ ধনপতি’ পর্বের দুই নারী চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী লহনার ষড়যন্ত্রের কারণে খুল্লনাকে ‘ সতীত্বের’ পরীক্ষা দিতে হয়।[51] পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সতীত্বের প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন রকমের জীবননাশী পরীক্ষা গ্রহণ করে। এর অন্তর্গত হলঃ

১. খড়গ পরীক্ষাঃ- এই পরীক্ষা অনুযায়ী সমাজ কর্তৃক অসতী চিহ্নিত নারীকে ধারালো খর্গের উপর পা দিতে হবে। তাতে যদি তার পা অক্ষত থাকে, তাহলে সে অবশ্যই ‘সতী’।

২. জল পরীক্ষাঃ- রমণীকে পুষ্পের সাজিতে করে জল নিয়ে আসতে হবে। জল যদি এক ফোঁটাও মাটিতে না পড়ে তাহলে সে সতী।

৩. সর্প ঘটের পরীক্ষাঃ- নারীকে সর্প ভর্তি ঘট মাথায় নিতে হবে। তার মধ্যে থেকে সর্প বেরিয়ে এসে তাঁকে যদি দংশন না করে, তাহলে সে সতী।

৪. ঘৃত-কাঞ্চনঃ- আগুনের মধ্যে ঘি মাখানো আংটি ফেলে দেওয়া হবে। রমণী যদি হাত দিয়ে সেই আংটি তুলে আনতে পারে, তাহলে সে সতী।

৫. জতু-গৃহঃ- এই পরীক্ষা সর্বাধিক কঠিন। পরীক্ষা অনুযায়ী জতুগৃহ নির্মান করে নারীকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। সে যদি বেঁচে ফেরে তাহলে সে অবশ্যই সতী।[52]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ‘অগ্নি পরীক্ষার’ বিষয়টি সর্বাধিক প্রাণঘাতী। কারণ অগ্নির প্রকোপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেকোন মানুষের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। অতএব, খুল্লনাকে কেবলমাত্র গৃহছাড়া নয়, তার প্রাণ বিনাশের জন্য লহনা এই ষড়যন্ত্র করে।  মঙ্গলকাব্যের পরিবারগুলিকে যদি আধ্যাত্মিক

---

[51] দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), ১৮৮-১৯১।

[52] *তদেব্।*

মোড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহু বিবাহের ফলে নারীর দুরাবস্থার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাবে। স্বামীর স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য থাকা, বা না থাকা সবকিছুর দায়ভার পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর ওপরই অর্পন করে। প্রকৃতপক্ষে এটি সমাজে নারীকে অবদমন করার প্রধান অস্ত্র। আর স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে পিতৃতন্ত্রের এই অস্ত্র প্রয়োগ মূলতঃ তাদের প্রতিবাদ স্পৃহাকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত।

## ৫.৬ <u>পুরুষের যৌনস্পৃহা বনাম নারীর যৌনস্পৃহা এবং লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি</u>

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান নির্মাণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল 'যৌনস্পৃহা'। যৌন আকাঙ্কা হল এমন এক ধরনের ধারণা, যাকে কেন্দ্র করে নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের কাঠামো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। Michel Foucault তার গ্রন্থে 'যৌনস্পৃহা' বা 'সেক্সুয়ালিটি' কে একটি ডিসকোর্স[53] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। Foucault এর ধারণা অনুযায়ী এই 'ডিসকোর্সের' মধ্যে 'ক্ষমতা, জ্ঞান ও উপভোগের' বিষয়গুলি সংযুক্ত হয়। তিনি আবার এই ডিসকোর্সকে 'রিপ্রেসিভ হাইপোথিসিস'[54] এর প্রেক্ষিতে বিচার করে 'উৎপাদন' বা প্রজননের বিষয়কে এর মাধ্যমে নির্ধারন করেন। বর্তমান আলোচনায় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'যৌনস্পৃহা'কে বিচার করা প্রয়োজন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'যৌন' আকাঙ্খাকে ভিত্তি করে প্রধানতঃ 'লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের' সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে পুরুষেরাই সর্বেসর্বা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর 'যৌন' চাহিদা উপেক্ষিত। তাদের 'যৌন' আকাঙ্খাকে পিতৃতন্ত্র প্রাধান্য প্রদান করেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের কামস্পৃহার ক্ষেত্রে উদারমনস্ক হলেও, নারীদের কামনাকে তারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষ তার কামনার দরুন বহুবিবাহের পরও 'নটী' বা বারবনিতাদের উপর আসক্তি রাখে। পুরুষের আকাঙ্খার বিষয়টি কোন

---

[53] Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol I, (New York: Pantheon Books, 1978), 10.
[54] *তদেব্।*

কোন ক্ষেত্রে আবার শ্লীলতাহানির পর্যায়ে চলে যায়। মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন 'ক্লাস' বা শ্রেণীর নারীদের উপর পুরুষের অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। এমনকি দেবীরাও তার থেকে অব্যাহতি পায়নি। উপরন্তু নারীরা পরিবারেও সুরক্ষিত নয়। বিবাহিত রমণীরা পরিবারে স্বামী কর্তৃক 'বলপূর্বক যৌন সংসর্গের' শিকার। এর উদাহরণ, আমরা বিষ্ণুপালের 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যে পেয়ে থাকি। কাব্যে দুর্গাকে পুনরায় গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য শিব 'যবন' সেজে তাকে নিগ্রহ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলাম আক্রমণের পর সমাজে নারীর দুরাবস্থাকে চিহ্নিত করার জন্য বিষ্ণুপাল কর্তৃক এই পর্বের উত্থাপন। নারীর সতীত্ব নিয়ে চিন্তান্বিত হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, ইসলাম আক্রমণের পর হিন্দু নারীর উপর মুসলমান পুরুষের নিগ্রহের বিষয়টিকে চিহ্নিত করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মুসলমান যোদ্ধারা বাংলা আক্রমণের সময় স্বাভাবিকভাবে নারী সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি। তাই শারীরিক চাহিদা হেতু তারা বাংলার হিন্দু রমণীদের বিবাহ করে।[55] বিষ্ণুপাল এই বিষয়কে কাব্যের মাধ্যমে উত্থাপন করার চেষ্টা করেন। তার কাব্যে, 'যবনরূপী' শিব এর মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম আক্রমণের পর, নারীর (পার্বতীর) নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, বক্তব্যটি থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র শিবের নাম ও দৈবীসত্তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে তার মাধ্যমে 'বিবাহভিত্তিক ধর্ষণ' বা 'বলপূর্বক যৌনসংসর্গের' বিষয়কে অনুমান করা যায়। একটি উক্তির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়,

"চলিলা হর রহাত্যে পার্বতী
যবন মূরতি সির্জিলা পশুপতি।
নল ধড়ি পরে কিবা দোস্তাগ মাথায়।
খাঁড়া ছুরি নিলা যৌবন অবতার।"[56]

---

[55] জগদীশনারায়ণ সরকার, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮), ৪৬-৪৭।

[56] Visnu Pala, *Manasa-Mangala*, Sukumar Sen (ed.), (Kolkata: The Asiatic Society, 1968), 13.

শিব কর্তৃক ‘যবন’ অবতার অবশ্যই তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে নির্মিত। এখন প্রশ্ন হল, বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে শিবের যবন রূপের প্রয়োজন কী ছিল? মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী শিবের একাধিক নারীর প্রতি আসক্তি থাকার কারণে চণ্ডী তাকে পরিত্যাগ করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী ‘স্ত্রী’ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে পুরুষের পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হবে, যাতে অন্যান্য নারীদের আর দমন করা সম্ভব হবেনা। কাব্য অনুযায়ী তাই যবন সেজে শিবের তার রমণীকে অবদমন করার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন শিবের উপর ধর্ষণের দায়ভার পড়বেনা, অন্যদিকে আবার পার্বতীর উদাহরণের মাধ্যমে সমগ্র স্ত্রী সমাজকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। সমাজে নারীদের পরিসীমা গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্য পিতৃতন্ত্রের এই চক্রান্ত। অপরদিকে দেবী হয়ে মনসাও কিন্তু পুরুষের লালসার শিকার। প্রথমে সে তার পিতা কর্তৃক অপমানিত, পরে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষদের কর্তৃক। উদাহরণ হিসেবে, ‘মনসামঙ্গলে’, বাছাই কৃষক কর্তৃক মনসাকে কামনা এই বিষয়ের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করে।

“বৃদ্ধের সহিত দেখি পরমা সুন্দরী।
শিব হেন না জানিয়া উপহাস করি।।
...............................................
কন্যার পায়্যাছি লাগ নিবাম কাড়িয়া।
এই কন্যা দেহ মোরে করিবারে বিয়া।।
না হইলে বলে ছলে রাখিবাম কাড়ি।
নিশ্চয় জানিও আমি নাহি দিব ছাড়ি।।”[57]

উল্লেখিত উক্তিতে বাছাই কর্তৃক মনসাকে আকাঙ্খা এককথায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে নির্ণয় করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী মূলতঃ ‘ভোগ্যপণ্য’ হিসাবে পরিগণিত। অতএব, গৃহের বাহিরে নারী পা রাখলে সে পুরুষ কর্তৃক নিগৃহীত হবে। আর সমাজ পুরুষকে নয়, নারীকেই দায়ী করবে। পুরুষের নারীর প্রতি ‘লোভ’ এক ধরণের ‘পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো’। নারীকে গৃহে আবদ্ধ

---

[57] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্‌, বৈশাখ ১৩১৮), ১২১।

রাখার পন্থা। এমনকি নারী হিসেবে ‘মনসা’র সমাজে ক্ষমতায়নের সময়ও, পিতৃতান্ত্রিক কাব্যগুলি অনেকক্ষেত্রে তাকে ‘নটী’ হিসেবে গণ্য করেছে। কারণ মনসার ‘নটী’ সেজে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের[58] পর্ব এই বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করে। মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণের সংস্করণগুলি ‘মনসার’ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত, এই বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মহিমা প্রচারের অন্তরালে কবিরা অনেকক্ষেত্রে মনসাকে ‘নটী’ বা ‘বেশ্যা’ রূপেও উপস্থাপন করেন। আর কাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরুষকে বিমোহিত করার দায়ভার তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সমাজ পুরুষের অন্য নারী তথা ‘নটীর’ প্রতি আসক্তিকে সুকৌশলে পরিত্যাগ করেন। “পতিব্রতা সতীর উপাখ্যানে” রোগগ্রস্থ স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য সতীসাধ্বী স্ত্রী তাকে ‘নটীর’ গৃহে নিয়ে যায়।[59] এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পতিব্রতা নারীর কর্তৃব্য নির্ধারণ করে। সম্পদশালী চন্দ্র বণিকও নৌকাডুবিতে নিজের সমস্ত সম্পদ হারানোর পরও নটী বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেননি।

“হরসিত হইল সাধু মৎস্য বেচিয়া।
কানা পিতা জত কড়ি লইল বাছিয়া।।
চান্দো বোলে অৰ্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অৰ্দ্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইব।।”[60]

উদ্ধৃতিটিতে ‘সাধু’ অর্থাৎ চন্দ্রধর বণিক সপ্তডিঙা ও মধুকর হারিয়ে মৎস্য বিক্রয়ের কার্যে বাধ্য হলেও, উক্ত কার্য থেকে তিনি যে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন, তাও ‘নটী’র বাড়ির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা ভাবেন। এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ‘যৌনস্পৃহা’ বা ‘কামনা’ এর

---

[58] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৯৩।

[59] *তদেব,* ৮০।

[60] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ২১০।

প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র নটীরা কেন, কুলবধূরাও তাদের কামনার আগুন থেকে অব্যাহতি পায়নি। মনসার ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার বিবাহের পর সে উগ্রতপা মুনির লোভের শিকার।

“একদিন পদ্মাবতী ঋতু স্নান কাজে।
গঙ্গাজলে স্নান করে সখীর সমাজে।।
হেনকালে এক মুনি উগ্রতপা নামে।
পদ্মারে দেখিয়া বলে ব্যাকুলিত কামে।।”[61]

জরুৎকারু মুনির সাথে বিবাহের পর মনসার স্থান হয় ‘কূলবধু’ হিসেবে। তার প্রতি উগ্রতপা মুনির কামভাব, প্রকৃতপক্ষে নারীর গৃহের বাহিরের জগতের নিরাপত্তাহীন অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে। নারীর প্রতি পুরুষের মানসিক বিদ্বেষ থেকে শারীরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এর ফলপ্রসূ ধর্ষণের প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়। মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উগ্রতপা মুনির মনসার প্রতি কামনা শুধুমাত্র যৌনস্পৃহা নিবৃত্তিকরণের উদ্দেশ্যে নয়, একাকিনী রমণীকে গৃহের বাহিরে দেখে তার সাহসিকতাকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যও প্রতিফলিত হয়। একা নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা পুরুষের লালসা ‘বেহুলার’ ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পতির শবকে নিয়ে স্বর্গারোহনের সময় বিভিন্ন বাঁকে যথাঃ গোদা বাঁক, ধনা মনার বাঁক, জুয়ার বাঁক, টেটনের বাঁক এ, বেহুলার সতীত্ব হরণের চেষ্টা এ বিষয়ের উদাহরণ বহন করে। ষষ্ঠীবর এর মনসামঙ্গলে ধনপতির বেহুলার রূপে মোহান্বিত হয়ে তাকে বলপূর্বক হরণের চেষ্টা করে।

“দেখিয়া বেহুলার রূপ ধনাই সত্বরে।
ত্বরিতে উঠিলা নায়ে ভেরুয়ার উপরে।।
ভেরুয়া ভাঙ্গিয়া, কন্যা, কর খান্ খান্।
সুন্দরী ধরিয়া আন আমার বিদ্যমান।।”[62]

---

[61] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ,* শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮), ১৫০।

[62] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,* (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), ১৪১।

এর মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, সমাজে নারী সমস্ত শ্রেণীর পুরুষের কাছে ভোগ্যবস্তু তুল্য। সেই কারণে বাছাই এর মতো কৃষক থেক শুরু করে মুনি ঋষি, এমনকি মহাদেবও এই লালসার কাঠামোর অন্তর্গত। লহনার অত্যাচারে খুল্লনা বনের মধ্যে ছাগল চড়াতে যেতে বাধ্য হয়, তখন সেও পুরুষের কামনা চক্ষুর শিকার হয়। প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে গৃহের বাহিরের জগৎ যে নারীদের ক্ষেত্রে প্রতিকূল তা বর্ণনা করেছেন। কারণ এর মাধ্যমে নারীকে গৃহে বন্দী রাখা সম্ভব।

এখন উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর ‘ কামনা’ কে কিভাবে বর্ণনা করছে? প্রথমত, সমাজে নারীর কামনা সর্বদাই উপেক্ষিত। তারপর যদি কোন নারী নিজ স্বামীর প্রতি শারীরিক চাহিদার আগ্রহ জানায়, তাহলে তাকেও নানারকম সমালোচনার শিকার হতে হয়। ‘চণ্ডী’ ও ‘মনসার’ উভয়ের কামনাকে দুই মহান পুরুষ ‘ শিব’ ও ‘ জরুৎকারু’ মেনে নেয়নি। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনে দুই নারীর মাধ্যমে শারীরিক চাহিদা পূরণ করেছে। কাব্যগুলিতে যদিও এই বিষয়কে ‘দাম্পত্য প্রেম’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ‘ দাম্পত্য প্রেম’ থেকে যখন নারীর চাহিদা বা আকাঙ্খা জন্ম নেয়, তখন পিতৃতন্ত্র তার প্রতি বিভিন্ন রকমের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়।

নারীর শারীরিক চাহিদা অথবা অন্য পুরুষের দৈহিক কাঠামোর প্রতি তাদের কামনার বিষয়টি মঙ্গলকাব্যেও বর্ণিত। প্রথমে শিব ও সতীর বিবাহে শিবের দৈহিক কাঠামোর নিরিখে অন্যান্য বিবাহিত নারীরা নিজেদের ভাগ্যকে কিভাবে দায়ী করেছে, তা বর্ণনা করা প্রয়োজন। মুকুন্দরাম কর্তৃক রচিত ‘কবিকঙ্কন-চণ্ডী’তে নারী কর্তৃক তার ‘ পতিভাগ্য’কে দায়ী করার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখিত যুবতীদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিজ নিজ স্বামী কর্তৃক

নির্যাতিত। কেউ শারীরিক নিপীড়নের শিকার, আবার কেউ যৌন চাহিদা পূর্ণ না হওয়ার জ্বালায় জর্জরিত।[63] নারীদের স্বামী সম্পর্কে আক্ষেপ সূচি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত। কাব্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী,

"সভে বলে গৌরী বর অয়াইয়াছে ভাল
মদনমোহন রূপে ঘর করিয়েছে আল।
এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।
ভাদ্রমাসে পাঁকই বড় দুর্বার
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকার।
এক আইয় বলে স্বামী বর্জিতদশন
শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।
যে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি
মারএ পিড়ার বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।
...................................
আর যুবতি বলে মোর স্বামী বড় কালা
আনের সংসার ভাল মোর হইল জ্বালা।
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি নিদ্রা জাই যেন পশুর শয়নে।"[64]

উল্লেখিত উক্তিতে নারীদের নিজ মনোবাঞ্ছা তুল্য পতি না পাওয়ায় অসন্তোষ স্পষ্ট। তাদের মধ্যে  কারোর পতি গৃহে ফিরে তাকে শারীরিক নির্যাতন করে। আবার কারোর পতি অসুস্থ হওয়ায়, সে তার কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে অসমর্থ। আবার কারোর পতির খর্বাকার যৌনাঙ্গের জন্য কামনা নিবৃত্তি হয়না। অন্য একজন রমণীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তার স্বামীর যৌন সম্পর্কের ধরন আবার পশুসুলভ। এতে স্বামী সুখ পেলেও, তার সুখ হয়না। এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর কামনাভিত্তিক অসন্তুষ্টির ধারণা পাওয়া যায়। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর কামনা শুধুমাত্র স্বামীর পরিপূর্ণ করার বিধান আছে। অন্য পুরুষের নয়। অতএব বলা যায়, নারীর কামনার প্রতি পিতৃতান্ত্রিক

---

[63] *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বসু ( সম্পা.), প্রথম ভাগ, ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সিনেট হাউস, ১৯২৪), ৭৪-৭৫।

[64] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা.), (নেয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ২১।

অবদমন বাস্তবিক অর্থে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্গত। গৌরী ভাগ্যবতী, যে প্রকৃত ‘পুরুষকে’ বা সুসংগঠিত শারীরিক কাঠামোযুক্ত পুরুষ লাভ করেছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক চাহিদা যদি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ পূর্ণ করে, তাহলে সে আর ‘সতী’ থাকেনা। বেহুলার মাধ্যমে পুরুষতাত্ত্বিক চিন্তাচেতনা সমগ্র নারী সমাজের কাছে এই বার্তাই প্রদান করে। নারায়ণ দেব কর্তৃক রচিত ‘পদ্মাপুরাণ’, এ ‘জমদানির বাঁকের’ পর্বে বেহুলার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। সদ্য পতি হারানো ও বৈধব্যকে অস্বীকার করা বেহুলা স্বামীর শবদেহ নিয়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার যাত্রাপথে মধ্যে ‘জমদানির বাঁক’ পড়ে, যে রমণী পতি মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে। সমাজে সে অবশ্যই ‘অসতী’ হিসেবে চিহ্নিৎ। এরপর সেই রমণী যখন বেউলা বা বেহুলাকেও স্বামী ছাড়ার পরামর্শ দেয়, তখন বেহুলা তাকে সতীত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে। উক্তিটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়,

“জমদানির স্ত্রী আমি সর্ব্ব লোকে জানে।
আমার সমান পতিব্রতা নাহি ত্রিভুবনে।।
..........................................
প্রথম বিহারে স্বামি মরিছে আমার।
বাছিয়া সুন্দর বর ধরিছি আববার।
মরা স্বামির দুঃখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
তান জর্ম্ম বিফল আমার কাল জায়।।”[65]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টান্তের মধ্যে একদিকে যেমন বেহুলার উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ‘জমদানির’ স্ত্রীও আছে। উভয় নারীকে ‘সতী ও অসতীর’ কাঠামোয় বন্দী করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর কর্তৃব্য নির্ধারন করে। বেহুলা ‘সতী’, তাই সে মৃত স্বামীর প্রতি অনুগত। আবার জমদানির স্ত্রী ‘অসতী’ হিসেবে চিহ্নিত, কারণ সে স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করেছে। এই উভয় নারীর চারিত্রিক বর্ণনা করে, পিতৃতন্ত্র সমগ্র নারী সমাজকে সতীত্বের কাঠামোয় আবদ্ধ

[65] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ৯৭।

করেছে। অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হলে অথবা মৃত্যুর পূর্বেই স্বামী একাধিক বিবাহ করতে পারলেও, স্ত্রীর বিবাহের অনুমতি নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে হয় স্বামীর সাথে চিতায় আত্মাহুতি দিতে হবে, নাহলে বৈধব্য গ্রহণ করতে হবে।

### ৫.৭ <u>বৈধব্য ও পিতৃতন্ত্র</u>

সমাজে বিধবা নারীদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরণের আচার পালনের বিধান রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিধবা হয়ে যাওয়ার পর চন্দ্র বনিকে গৃহে তার ছয় পুত্রবধূর স্থান হয়েছে মূলত রাঁধুনি হিসেবে।

> "ছয় বধূ বহু মোর হইআ রাঁধনী। আর কি করিব মোর চেঙ্গমুড়ি কানি।।"[66]

চন্দ্র বণিকের এই উক্তি সমাজে বিধবাদের অবস্থানকে উল্লেখ করে। উক্তি থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, পতির জীবিত অবস্থায় সংসারের মধ্যমণি হয়ে থাকা নারীরা, বিধবা হওয়ার পরই সংসারে এককোণে ঠাঁই পেয়েছে। তারা স্বামীর সাথে সহমরণে গেলে, তাদের জীবন এবং বৈধব্যের যন্ত্রণার নিষ্পত্তি ঘটত। সহমরণের ধারণা মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রমন্থনের কালকূট বিষ শিব পান করলে, স্বয়ং দেবী চণ্ডী সহমরণে যেতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এর ধারণা মনসামঙ্গলের বেশিরভাগ সংস্করণে উল্লেখিত। কিন্তু বৈধব্যের যন্ত্রণা সারা জীবনের। স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পরেই সমাজে তার সমস্ত আভরণ ছিনিয়ে নেয়, এমনকি তার সধবার চিহ্নও।[67] এছাড়াও তাদের খাওয়াদাওয়ার উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বেহুলার স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও, তাকে পূর্বের মতো সাধ পূরনের সুযোগ দিতে পারবে না তা আগেই জানিয়ে দেয়। বেহুলার দাদা নারায়ণ বণিক এর বক্তব্য আলোচনা করলে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

---

[66] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৮৮।

[67] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল,* শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (সং), (কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২), ৯৮।

"আজ্ঞা করো বুইন তুমি মরা পুড়িবারে।
আমার সনে য়াইস মাও লয়া জাই ঘরে।।
মৎস মাংস বিনে জতেক বস্তু উপহার।
সকলি য়ানিঞা দিব ভক্ষণ করিবার।।
সঙ্খ সিন্দুর সবে না পরিবা তুমি।
আর জত অলঙ্কার গড়াইয়া দিব য়ামি।।"[68]

নারায়ণ বণিকের এই উক্তি, সংসারে বিধবা রমণীদের পোশাক ও খাদ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাকে আলোকপাত করে। অর্থাৎ স্বামীহারা নারী সমাজে সকল বিধিনিষেধের অন্তর্জালে বন্দী। কিন্তু স্ত্রীহারা স্বামীর কোন সামাজিক বিধিনিষেধ নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'লিঙ্গভিত্তিক' অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। 'জেণ্ডার' বা 'লিঙ্গভিত্তিক' ধারণা কেবলমাত্র নারীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সমাজে পুরুষ ও নারী উভয়ের স্বতন্ত্র অবস্থানকে নির্ধারণ করে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি 'লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান'কে নির্মাণ করে। সমাজে পুরুষ হওয়ার সুবাদে শিব সহ মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য পুরুষ চরিত্ররা যেরকম সামাজিক স্বীকৃতি পায়। নারী চরিত্রদের কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অসুবিধা ভোগ করেও, 'সতী' নামক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। আর এই সতীত্বের গোলকধাঁধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় তাদের নেই। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদেরকে পুরুষের উপর এমনভাবে নির্ভর করে তুলেছে, যার বৃত্ত ভেদ করে তাদের নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে, পরিবারে সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে স্ত্রী ও পুরুষের নিমিত্তে যেসব সামাজিক কর্তৃব্য নির্ধারিত হয়, তাতে কেবলমাত্র নারীরা নয় পুরুষেরাও শোষিত। উদাহরণ হিসেবে, 'বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রের যোগ্যতা প্রমাণ', 'কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার অবস্থা', 'পুরুষের দুঃখ না প্রকাশ করতে পারার যন্ত্রণা' প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যে চন্দ্র বণিকের পুত্রের মৃত্যুশোকে জর্জরিত না হয়ে কঠিন থাকা, মূলতঃ পিতৃতন্ত্রের সংগঠিত রূপ। চন্দ্রধর বণিক নিজে নয়,

[68] নারায়ণ দেব, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (সম্পা.), (কেলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), ১০৯।

পিতৃতন্ত্র তাকে ‘ আবেগহীন’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তবে, পুরুষ সমাজের প্রতিবিম্ব হিসেবে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন পুরুষ চরিত্ররা নারীদের যেরকম বিধিনিষেধের জালে বন্দী করেছে, তাতে মূলতঃ বাস্তবিক সমাজের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

# অন্ত-মন্তব্য

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত, মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম দুই শাখা অর্থাৎ 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলি উক্ত গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়গুলির পর্যালোচনা অনুযায়ী, মঙ্গলকাব্যে মনসা ও চণ্ডীর উপস্থিতি থেকে শুরু করে আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলায় তাদের নৃতাত্ত্বিক অবস্থানকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। এর সাথে উভয় দেবী যেহেতু ' শিব' এর ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই শিবকে ভিত্তি করে উভয় দেবীর ' ত্রিকোণ সম্পর্কের' বিষয়টি উল্লেখিত গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পুনরায় শিবের ব্যক্তিত্বকে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিবেচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রধানত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়, সম্পূর্ণভাবে Richard Eton এর ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলিকে অনুসরণ করা যায়। তুর্কি আক্রমণের প্রভাবে সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মনাশের ভয়, উভয় কাব্যে আলোচিত। এই উদ্দেশ্যেই মূলতঃ 'একচ্ছত্র' দেবী হিসেবে মনসার আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ দেবী ' মনসা' হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের দ্বারা উপাসিত।

কেতকাদাস রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের ' হাসান-হুসেন' পর্বের প্রধানত এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে ইসলাম আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার তথাকথিত চিত্র পরিলক্ষিত না হলেও, সমাজে ' হিন্দু' ও ' মুসলমানের' সহাবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে উভয় কাব্যে শ্রেণীভিত্তিক বিষয়গুলিও দৃশ্যমান। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ধবীর, মালি,

নাপিত থেকে শুরু করে অন্যান্য নিম্নবর্ণের পেশা অবলম্বনকারী ব্যক্তিরা যেভাবে সমালোচিত হয়েছে, ‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে’ সমালোচনার ভঙ্গিতে তারা বিশ্লেষিত না হলেও, ‘ কালকেতু’র প্রতিষ্ঠিত গ্রামে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষদের থেকে তাদের পৃথক অবস্থান, তাদের প্রতি সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় বহন করে। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আবার লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজে নারীদের অবস্থান, নারীদের ‘সতীনবিদ্বেষ’, তাদের রূপের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলিতে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে, গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরিউক্ত আলোচনা ব্যতিরেকে, ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডীর’ মতো লৌকিক দেবী তথা ‘মঙ্গলকাব্যে’ বর্ণিত তাদের ‘দেবীমাহাত্ম্যের’ বিষয়গুলির বাণিজ্যিকীকরণ কিভাবে সম্ভব?

‘মনসামঙ্গল’ ও ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের উভয় দেবীর ‘ বাণিজ্যিকীকরণ’ প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, দুই লৌকিক দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন, দ্বিতীয়ত, লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় মঙ্গলকাব্যের উভয় দেবীর অবস্থান, তৃতীয়ত, ‘ মঙ্গলকাব্যের’ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ‘ পালাগান’র আয়োজন, চতুর্থত, সাম্প্রতিক টেলিভিশনের বিভিন্ন ধারাবাহিক এবং চলচ্চিত্রেও মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর বাণিজ্যিকীকরণ।

## ‘মনসা’ মেলা

গ্রামবাংলার দুই জনপ্রিয় লৌকিক দেবী ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডী’। ‘ ভয়’ ও ‘ ভক্তি’ উভয়কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা উপাসিত হন। মঙ্গলকাব্যের দেবী হিসেবে তাঁরা পরিচিত হলেও, গ্রামবাংলায় তাঁদের আঞ্চলিক রূপের তারতম্যকে লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উভয় দেবীর পৌরাণিক বেষ্টনী থাকলেও, ‘ মনসামঙ্গল’ ও ‘ চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে তাঁরা মূলতঃ লৌকিক দেবী। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আবার তাঁদের রূপের মধ্যে ‘ পৌরাণিক’ ও ‘লৌকিক’ সত্তার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ‘ দেবীমাহাত্ম্যে’র অন্তর্গত ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডী’র এই

‘সংমিশ্রিত’ রূপকে কেন্দ্র করেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মেলা আয়োজিত হয়। অশোক মিত্র তার ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মেলার কথা আলোচনা করেছিলেন। এর মধ্যে ‘মনসা’র উদ্দেশ্যে মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত সাদুল্লাপুরে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘দশহরার স্নান’ উপলক্ষে বহু প্রাচীন একটি মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[1] অনুসন্ধান থেকে বর্তমান সময়েও এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মেলায় একদিকে যেমন রকমারি জিনিসের দোকান বসে, তেমনি আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় মনসার গানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও উক্ত জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত আমলাহার গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে মনসা ‘বুড়ীর’ উপলক্ষে আয়োজিত মেলার কথা জানা যায়।[2] মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি দোকানের পাশাপাশি মনসামঙ্গল গানেরও আয়োজন করা হত। মালদহ জেলার তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভারেয়া গ্রামে ‘অষ্টনাগের’ মেলা[3], জলপাইগুড়ি থানার খারিজা বেরুবাড়ী গ্রামে চৈত্র মাসে ‘বিষহরি’র মেলা[4], ধুপগুড়ি থানার পূর্ব মল্লিকপুর গ্রামের বিখ্যাত মনসাপূজার মেলা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা যায় ।[5] তবে, ১৯৬১ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে মেলাকেন্দ্রিক কোনোরকম পরিসংখ্যান না হওয়ায়, অনেকাংশে পূর্ববর্তী রিপোর্টের উপরই নির্ভর করতে হয়। সর্বোপরি ২০১৯ সালের পর থেকে অতিমারীর কারণে মালদা অঞ্চলের বার্ষিক ধর্মীয় মেলাগুলি প্রায় স্থগিত। তবে, বর্তমানে স্যোশাল মিডিয়া এবং ইউটিউবের দৌলতে, মালদা জেলায় বেহুলা নদী তীরবর্তি অঞ্চলে ২০২১ সালের ২২ শে মার্চ ‘বেহুলার মেলা’র কথা জানা যায়।[6]

---

[1] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, প্রথম খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ১১।

[2] *তদেব*, ১২৭।

[3] *তদেব*, ১৬৬।

[4] *তদেব*, ২১৫।

[5] *তদেব*, ২২৮।

**[6]** “Behula Mela at Malda (west bengal) near behula river” Flimed March 22, 2021 in N.S.N. Passeenger, West-Bengal, 9:57. https://youtu.be/dlEZ1FoVdGE .

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে ভাদ্রমাসে ‘কালীয়াদমন উৎসবের’ মেলা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই জনপ্রিয়।[7] উল্লেখিত জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত চিৎরাঙ্গা গ্রামে, প্রতি বছর আশ্বিন মাসে ‘মনসাপূজা’ উপলক্ষে আয়োজিত বিখ্যাত মেলার কথা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায়।[8] এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মইশ্যা ও গোটগেড়্যাতে জকপুর নামক স্থানে, প্রতিবছর চৈত্র মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে জাগ্রত মনসা মন্দিরকে কেন্দ্র করে ‘মনসা মেলা’ বসে।[9] প্রায় ৭০ বছরের পুরনো এই ‘মনসা মেলা’কে ঘিরে বিভিন্ন লোকের সমাগম লোকদেবী ‘মনসা’র নৃতাত্ত্বিক রূপের বাণিজ্যিকীকরণের ধারণাকে দৃঢ় করে।[10] কারণ মেলায় রকমারি দোকান, মনিহারীর দোকান, খাবারের দোকান, শাঁখার দোকান, প্রভৃতি একশ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক চাহিদাকে পরিপূর্ণ করে।[11] বর্তমানে সময়কালে মহামারীর কারণে মেলার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা বিচ্যুত হলেও, স্থগিত হয়ে যায়নি। ২০২১ এর ৬ই এপ্রিল এই ‘মনসা মেলা’র পুনরায় আয়োজন করা হয়।[12]

মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুসড়ীপাড়া গ্রামে আশ্বিন মাসে ‘পদ্মাদেবী’র বিসর্জন উপলক্ষে আয়োজিত জেলায় সর্বসম্প্রদায়ের নরনারীর সমাগম ঘটে।[13] এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার অন্তর্গত ব্রহ্মোত্তর মানিক চক্ গ্রামে পৌষ মাসে সাতদিনব্যাপী বিখ্যাত

---

[7] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৪৩৫।

[8] *তদেব,* ৪৬০।

[9] Sushanta**.** “MANASA MELA /মনসা মেলা” Flimed September 24, 2018 in Shree Ganapati Star Entertainment, Madpur & Jokpur, West-Bengal, 29:05. https://youtu.be/U-tim91Va5M .

[10] *তদেব।*

[11] *তদেব।*

[12] Sushanta. “Aaj (06.04.21) Madpur o Jakpurer majhe "Manasa Mela 2021” Flimed Apr 6, 2021 in Shree Ganapati Star Entertainment, Madpur, West-Bengal, 5:41. https://youtu.be/J1kfRoY-VQ8 .

[13] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ১২।

একটি মেলার আয়োজন করা হয়।[14] বর্তমানে সময়েও এই মেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়। বরঞা থানার অন্তর্গত ঝিকরহাটী গ্রামের ভাদ্র মাসের ‘মনসাপূজার’ মেলাও যথেষ্ট বিখ্যাত।[15] নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রামে ‘দশহরার’ স্নান উপলক্ষে প্রাচীন একটি মেলা খুবই বিখ্যাত।[16] ‘দশহরার স্নানের’ মেলা বর্তমান সময়েও খুব জনপ্রিয়। নদীয়ার পলাশীপাড়া থানার অন্তর্গত তেহট্ট মহকুমার, উজিরপুর গ্রামে দশহরায় ‘গঙ্গাপূজা’ উপলক্ষে একটি মেলা বসে।[17] এই পূজায় গঙ্গা ও মনসা একত্রে উপাসিত হন।[18] মৌখিক সূত্র অনুসারে ‘গঙ্গা’ ও ‘মনসা’ উভয় দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়।[19] এছাড়া নদীয়ার নাকাসীপাড়া থানার ব্রহ্মাণীতলা গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ‘ব্রহ্মাণী মনসা’ পূজার মেলা[20] সংঘটিত হলেও, বর্তমান অতিমারীর সময়ে তা স্থগিত।

হুগলি জেলাতেও ‘মনসা’র নৃতাত্ত্বিক রূপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের মেলা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত শেয়াপুর থানার ‘মনসা মেলা’[21], পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ভোঁপুর গ্রামের ‘মনসাপূজার মেলা’[22], মগরা থানার অন্তর্গত হোয়েরা গ্রামে মনসার ঝাঁপান উপলক্ষে আয়োজিত ‘ঝাঁপান মেলা’[23], আরামবাগ থানার রসুলপুর গ্রামে আয়োজিত ‘জগতী

---

[14] *তদেব*, ৫৬।

[15] *তদেব*, ১৯২।

[16] *তদেব*, ২৪৩।

[17] কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস (গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সমীক্ষকের নাম শিল্পা মণ্ডল, পলাশীপাড়া থানা, উজিরপুর গ্রাম, নদীয়া জেলা, আগস্ট ২০, ২০২১, দুপুর ২ ঘটিকা।

[18] *তদেব।*

[19] *তদেব।*

[20] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ২৯২।

[21] *তদেব*, ৫৪০।

[22] *তদেব*, ৫৪৬।

[23] *তদেব*, ৫৮২।

মনসাপূজার'[24] মেলা প্রভৃতি। এছাড়াও হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত ইনচূড়াতে, প্রায় আঠাশটি গ্রামের উদ্যোগে প্রতিবছর শ্রাবণমাসে উদ্‌যাপিত হয় বিখ্যাত 'বিষহরি' মেলা।[25] 'বিষহরি' মেলা বর্তমান অতিমারীর সময়েও আয়োজিত হয়েছে।[26] কেবলমাত্র হুগলী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেই নয়, নদীয়া, বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থান হতে ভক্ত সমাগম ঘটে। পূজোর সময় ভক্তরা যে স্তুতি করেন তাকে 'লাচাড়ি' বলে।

মনসাপূজো উপলক্ষে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে 'সই পাতান', একে 'সয়লা' উৎসব বলে। দুটি শোলার মালা একে অপরের গলায় পড়িয়ে সই পাতান। ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হলে তাকে 'স্যাঙাত পাতান', মেয়েদের মধ্যে হলে তাকে 'সই' বলে। এরপর উভয়ের মধ্যে একে ওপরের নাম ধরে ডাকেনা। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে বাজনা সহযোগে নাচতে নাচতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। এর নামও 'ঝাঁপান উৎসব', সেইসঙ্গে আবির খেলাও হয়।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও 'মনসাপূজা'কে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ওন্দা থানার অন্তর্গত অমরপুর গ্রামে দশহরা তিথিতে প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন একটি মেলা বসে।[27] এই মেলায় বিভিন্ন দোকান ছাড়াও আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।[28] এছাড়াও গঙ্গাজালঘাটি থানার অন্তর্গত লালপুর বড় গ্রামের 'মনসাপূজা'র মেলা[29], খাতরা থানার অন্তর্গত ঝাপানডিহি গ্রামের মনসাপূজার উপলক্ষে 'শ্রাবণ' মাসের মেলা[30], ইঁদপুর থানার সাতামী

---

[24] *তদেব*, ৬৬১।

[25] Prashanta, "Inchura Bishohari Mela 2019" Flimed August 16, 2019 in Abeg Abahon, West-Bengal, 13:51. https://youtu.be/N38BZ_HjYGo .

[26] Prashanta, "Inchura Bishahari Mela 2021" Flimed August 16, 2021 in Abeg Abahon, West-Bengal, 4:14. https://youtu.be/kP7ZWPkHl_8 .

[27] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, চতুর্থ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৫২।

[28] *তদেব*।

[29] *তদেব*, ৮৮।

[30] *তদেব*, ১২৫।

গ্রামের ‘মনসা’ মেলা[31], রাইপুর থানার পেঁচাকলা গ্রামে শ্রাবণ মাসে ‘মনসাতলার’ মেলা[32], প্রভৃতি মেলাগুলি বাঁকুড়ার বিখ্যাত মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ‘ঝাঁপান মেলা’ও[33] বাঁকুড়া জেলায় প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি অনুসারে সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির মল্ল সর্বপ্রথম এই ঝাঁপান মেলার সূত্রপাত করেছিলেন।[34] প্রতিবছর শ্রাবণ মাসে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এমনকি ২০২১ সালেও বিষ্ণুপুরে এই ‘ঝাঁপান মেলা’ আয়োজিত হয়েছে।[35] এছাড়া বিষ্ণুপুর থানার চাকদহ গ্রামেও এই মেলার আয়োজন করা হয়।[36] এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাঁকুড়া জেলার ‘মনসাপূজা’র উপলক্ষে মেলাগুলি প্রধানত শ্রাবণ মাসে আয়োজন করা হয়। বীরভূম জেলার মেলাগুলি আবার সংঘটিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেখানে দুবরাজপুর থানার বিরোরী গ্রামে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।[37] এছাড়া উল্লেখিত জেলার ইলামপুর থানার গঙ্গাপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন ‘মনসাপূজা’ উপলক্ষে একদিনের একটি মেলা বসে।[38]

## চণ্ডী মেলা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চণ্ডীর উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেকক্ষেত্রে ‘দুর্গাপূজা’ বা ‘কালীপূজা’র মেলাগুলিকে ‘চণ্ডীপূজা’র মেলার সমগোত্রীয় হিসেবে অনুমান করা হয়। কিন্তু লোকদেবী হিসেবে চণ্ডীর স্বতন্ত্র পরিচিতি থাকায়, বর্তমান গবেষণায়

---

[31] *তদেব*, ১৩১।

[32] *তদেব*, ১৫৫।

[33] “Snake Goddess MANASA DEVI | The Snake Festival of Bishnupur | Nag Panchami | Rahu Ketu Peyarchi 2017” Flimed July 22, 2017 in Geethanjali-Travel Saga, Bishnupur, West-Bengal, 2:10. https://youtu.be/TdVRdeBPaQQ .

[34] *তদেব*।

[35] “Jhapan Utsav” Flimed June 25, 2021 in The Wanderer, Bishnupur, West-Bengal, 7:34. https://youtu.be/R9hEHHXxP-A .

[36] “Village Snake Fair” Flimed August 15, 2021 in Indian Josh, Chakdaha, Bishnupur, West-Bengal, 3:51. https://youtu.be/NdOSJMWMT5o .

[37] অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, চতুর্থ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ২৬৩।

[38] *তদেব*, ২৭৩।

‘চণ্ডী’র ভিন্ন ভিন্ন রূপের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মেলাগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালদা জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গোহিলা গ্রামে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা ও গোহিল চণ্ডীপূজা উপলক্ষে আয়োজিত বিখ্যাত মেলা ‘ গোহিল চণ্ডীর’ মেলা হিসেবে পরিচিত।[39] আশ্বিন মাসে ‘কমলাচণ্ডী পূজা’র মেলা বসে মালদা জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কমলাবাড়ী নামক গ্রামে।[40] জনশ্রুতি অনুসারে এই মেলাটি প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন।[41] ‘মশান চণ্ডীপূজা’র মেলা উদ্‌যাপিত হয় উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলার আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মশুণ্ডা গ্রামে।[42] উল্লেখিত জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত উত্তর কলসুর গ্রামে আবার প্রতি বছর বৈশাখ মাসে ‘ওলাইচণ্ডী’ পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।[43] ‘ ওলাইচণ্ডী’ বা ‘ ওলেশ্বরী পূজা’র মেলা হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত আলিসাগড়িয়া গ্রামেও সংঘটিত হয়।[44] হুগলীতে এই মেলা বর্তমান সময়েও খুব জনপ্রিয়।[45]

কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী বড়িশায় বার্ষিক ‘বড়িশা চণ্ডী’র মেলা বিখ্যাত।[46] এই মেলায় পুতুল নাচ, যাত্রা, কীর্তন, তর্জা এবং বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[47] ‘ কমলেকামিনীপূজার মেলা’[48] উদ্‌যাপিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত সৌধগঞ্জ নামক গ্রামে। লৌকিক

---

39 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, প্রথম খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৫১।

40 *তদেব*, ১০৫।

41 *তদেব*।

42 *তদেব*, ৬৫।

43 *তদেব*, ৭৬।

44 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৫৬৮।

45 Arup Nandi, “Olaichandi mayer puja o mela”, Flimed March 15, 2020 in Arup Nandi, West-Bengal, 19:51. https://youtu.be/bYhZNFw_6xM.

46 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, তৃতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ১২৪।

47 হীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ‘বড়িশার চণ্ডীর মেলা’, *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প*, (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৪১৪), ১৫৫।

48 অশোক মিত্র (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গঃ ভারতের জনগণনা, ১৯৬১), ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি, ৭২।

দেবী চণ্ডীর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘কমলেকামিনী’ রূপের সাথে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর উভয়েই সিংহল যাত্রাকালে দেবীর এই রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘ কমলেকামিনী’ রূপের বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি এর মাধ্যমে খুব সহজেই অনুমান করা যায়। হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মাকড়দহ গ্রামে ‘ মাকড়চণ্ডী’র পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।[49] এই মেলাটি প্রথম আরম্ভ হয় বাংলা ১২২৯ সালে।[50] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মেলাটি জনপ্রিয়।[51] পুরুলিয়া জেলায় আবার ‘খেলাই চণ্ডী’ পূজার বার্ষিক মেলা বিখ্যাত।[52] প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।[53] এই মেলায় প্রায় বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে একশোরও বেশী দোকান বসে।[54] ‘খেলাই চণ্ডী’ মেলার মতো পুরুলিয়ার ‘বেরো চণ্ডী’র[55] মেলাও জনপ্রিয়। ‘ঢেলাই চণ্ডী’ মেলা বিখ্যাত নদীয়ার কৃষ্ণনগরে।[56] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘চণ্ডী’র এই রূপের মধ্যে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয় রূপেরই বিশেষত্ব বর্তমান।[57] জনশ্রুতি অনুসারে, এখানে ‘মনসা’কে মাটির ঢেলা রূপে এবং ‘চণ্ডী’ ধ্যানে পূজা করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, উপরিউক্ত আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ পূজার মেলার বিবরণীর মাধ্যমে উভয় দেবী ও দুই মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের উপস্থাপনা কিভাবে সম্ভব? মেলা প্রধানত বহুলোকের মিলনক্ষেত্র। মেলার অন্যতম লক্ষ্য আনন্দ প্রদান করা হলেও, এর একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। আনন্দ প্রদান করা যেহেতু এর প্রাথমিক

---

[49] *তদেব,* ৪৩৯-৪৪০।

[50] *তদেব।*

[51] *তদেব।*

[52] “Khelay Chandi Mela”, Flimed January 30, 2014 in Dpmahanti Official, Purulia, West-Bengal, 3:40. https://youtu.be/esbfscb3cXk .

[53] *তদেব।*

[54] *তদেব।*

[55] “Bero Chandi Mela 2021”, Flimed January 20, 2021 in Atma Vlog and Entertainment, Purulia, West-Bengal, 7:40. https://youtu.be/jDCjp0WuwrQ.

[56] “Dhelai Chondir Mela 2019”, Flimed January 3, 2020 in Inspire Of Life, Nadia, West-Bengal, 9:40. https://youtu.be/tX0bXgDveUE.

[57] *তদেব।*

লক্ষ্য, তাই এর মাধ্যমে সামাজিক প্রয়োজনকে অনুভব করা যায়। অপরদিকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এই মেলাগুলি আয়োজিত হওয়ায় এর পিছনের ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে অনুমান করা যায়। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে 'মেলা'গুলিতে জনসাধারনের নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্য সামগ্রীর বিভিন্ন দোকানপাট বসে। অতএব বলা যায়, মেলাগুলির উপর অনেক মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন নির্ভর করে। অন্যদিকে আবার মেলাগুলিতে আমোদ-প্রমোদের জন্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে 'পালা গান', 'ভাসান গান', 'পটচিত্রের গান' এবং 'যাত্রাপালা'র আয়োজন করা হয়ে থাকে। এইসব অনুষ্ঠানে প্রধানত উপাসিত দেবীর উদ্দেশ্যেই শিল্পীরা 'গান'গুলি গেয়ে থাকেন। অতএব বলা যায়, শিল্পীদের গান ও যাত্রাপালার মাধ্যমে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র দেবীমাহাত্ম্য যেমন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনীগুলিও লোকমুখে সঞ্চারিত হতে থাকে। এর মাধ্যমে 'মেলা'কে মিলনক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করে উক্ত দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দোকান ও লোকগানের আয়োজন, অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে।

## লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র অবস্থান

গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় 'মনসা' ও 'চণ্ডী' বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারিণী। লোকশিল্পে মনসা পূজার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা মূর্তি ব্যতিরেকে চালি, ঘট ও শোলার কারুকার্যবিশিষ্ট প্রতীক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে মনসা যেহেতু মাটির মূর্তিতেও পূজিত, মৃৎশিল্পীদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও তাই এর উপর নির্ভরশীল। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যেই সাবেকী মূর্তি গড়ার পদ্ধতিতেই 'মনসা মূর্তি'গুলি নির্মিত হয়।[58] অনুরূপভাবে, 'চণ্ডী'র বিভিন্ন মৃত্তিকামূর্তি, বিশেষতঃ 'দুর্গামূর্তি' মৃৎশিল্পীদের বার্ষিক আয়ের অন্যতম উৎস। লৌকিক দেবী 'চণ্ডী'র সাথে 'দুর্গা'র রূপের পার্থক্য

[58] তারাপদ সাঁতরা, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* (কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০), ২১।

থাকলেও ‘দেবীমাহাত্ম্যে’র অন্তরালে, ‘দুর্গা’ও চণ্ডী জ্ঞানে উপাসিতা। প্রতিমা রূপে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র ধারণার বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি এর মাধ্যমে উত্থাপিত হয়।

মনসা প্রতিমা ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ো ও সোনামুখি অঞ্চলের অপর একটি শিল্পকৃতি হল মনসার চালি বা মনসার মেড়।[59] ‘চালি’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ‘চাল’ বা ‘চালচিত্র’ থেকে।[60] তারাপদ সাঁতরা ‘মনসার চালি’ বলতে সর্পফণাযুক্ত প্রতিমূর্তির সারিবদ্ধ অবস্থানকে উল্লেখ করেছেন।[61] চালিতে একাধিক ফণাযুক্ত সর্পের সহাবস্থান ভয়াল রূপ দর্শিত হলেও, সেটির নান্দনিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। বাঁকুড়া জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশানুক্রমে ‘মনসা’র চালি নির্মাণ তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস।[62] তারাপদ সাঁতরার বক্তব্য অনুযায়ী বাঁকুড়ার এই কুম্ভকার পল্লী থেকে প্রচুর পরিমাণে ‘মনসার চালি’ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় রপ্তানি করা হয়।[63] অতএব, ‘মনসার চালি’কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত একটি অন্যতম বাণিজ্যিক উপকরণ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, চণ্ডীপূজা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শিলাখণ্ড, প্রাচীন প্রস্তর খোদিত মূর্তি, মৃত্তিকা মূর্তি এবং ধাতু মূর্তিতে সম্পন্ন হয়।[64] তাই চণ্ডীর ‘চালি’ বা ‘মেড়’ এর অবস্থান কোথাও লক্ষ্য করা যায়না।

মনসা ও চণ্ডীর ‘মূর্তি’ ও ‘চালির’ পাশাপাশি অপর একটি লোকশিল্প হল ‘ঘট’। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলগুলিতে ‘মনসা’ ঘটে পূজিত।[65] এই ঘটগুলি

---

[59] *তদেব,* ৬৩।

[60] *তদেব।*

[61] *তদেব,* ৬৪।

[62] *তদেব।*

[63] *তদেব।*

[64] মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ‘চণ্ডী’, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* (বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০০), ১৯০-২০৮।

[65] তারাপদ সাঁতরা, ‘চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র’, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* (কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০), ৬৪।

‘মনসাবারি ঘট’ নামে পরিচিত।[66] এছাড়া ‘ চণ্ডী’ পূজাতেও ঘট একটি মুখ্য পূজার সামগ্রী।[67] অনেকক্ষেত্রে প্রতিমা ব্যতিরেকে ‘ঘটে’ও দেবী চণ্ডী উপাসিত হন। অর্থাৎ ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে কেন্দ্র ঘটশিল্পীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের বিষয়ে এর মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে। পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার টুংগইল-বিলপাড়ায় বিষহরির মূর্তি নির্মিত হয় শোলায়, তৈরি করে মালাকাররা।[68] উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ইত্যাদি অঞ্চলে শোলার মনসা বাড়ি ও মনসা পট দেখা যায়।[69] শোলার পাতের উপর এই পট আঁকা হয়। কুচবিহারে শোলার ‘কাপ’ দিয়ে কাগজের ঘর করে মনসা বাড়ি, মনসা পট ইত্যাদি শ্রদ্ধার সাথে রঞ্জিত হয়।[70] শোলার কাগজের মতো সাদা যে পর্দা কাটা হয় ধারালো ছুরি দিয়ে তার নাম ‘ কাপ’; আর ছুড়িটিকে ‘ কাইত’ বলে।[71] এছাড়া উত্তরবঙ্গের শোলার মনসামূর্তি ও মনসা পট নির্মান করা হয়, যাকে ‘করণ্ডিয়া’ বলে।[72]

শোলাশিল্পীরা বিষহরি মনসার ডোলা বা মৌরার উপর ‘মনসা’ ব্যতীত মৎস্য শিকাররত গোদা ও গোদানীর চিত্রও অঙ্কন করে।[73] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র ‘গোদা’। বেহুলার স্বর্গযাত্রার সময়কালে ‘ গোদা’ তাকে নানাভাবে বিব্রত করে। এর কাহিনী ‘ মনসামঙ্গল’ কাব্যের প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই বর্তমান। এইক্ষেত্রে মনসাকে কেন্দ্র করে শোলাশিল্পের মাধ্যমে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের ব্যাখ্যা, অবশ্যই উল্লেখিত কাব্যের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ‘ চণ্ডী’র একটি রূপ ‘ মাশান চণ্ডী’র উদ্দেশ্যে শোলার তৈরী

---

66 *তদেব্।*

67 *তদেব্,* ১২৬।

68 শিবতপন বসু, ‘ লোকশিল্প’, *পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি,* পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রদত্ত, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মার্চ ১৯৮১), ৬৩-৬৭।

69 *তদেব্।*

70 *তদেব্।*

71 *তদেব্।*

72 *তদেব্।*

73 *তদেব্।*

‘মাশান’ নির্মাণ করা হয়।[74] এছাড়া দুর্গা মূর্তিতে শোলা বা ডাকের সাজ এই শিল্পের প্রধান আকর্ষণ। বর্ধমানে কাটোয়া, নদীয়া নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশপুর, কলকাতার দমদম, কুমোরটুলি প্রভৃতি এলাকার মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা শোলা শিল্পের ধারক ও বাহক।[75] কেবলমাত্র প্রতিমার অলংকরণে নয়, পূজার আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্মাণেও শোলা শিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ‘চণ্ডী’ বা ‘দুর্গা’র সাজসজ্জার সাথে এই শিল্প যুক্ত থাকলেও, এর সাথে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে, ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ দেবী যেহেতু প্রধান চরিত্র, তাই ‘চণ্ডী’ বা ‘দুর্গা’কে কেন্দ্র করে তার ডাকের সাঁজ অবশ্যই দেবীর সত্তাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চালিত করে।

এর পরবর্তী লোকশিল্প হিসেবে আমরা ‘মুখোশ শিল্পের’ উল্লেখ করতে পারি। ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র পালাগান ও ছৌনাচের উদ্দেশ্যে প্রধানত মুখোশগুলি তৈরি করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কাঠের তৈরি মুখোশগুলি ‘পরভা’ নামে পরিচিত।[76] পরবর্তীকালে এই মুখোশগুলির মধ্যে কাগজের মণ্ডের তৈরি মুখোশও সংযোজিত হয়। ‘পরভা’র অন্তর্গত হয় প্রধানত হলুদ দেহবর্ণ বিশিষ্ট ‘দশভুজা’, ‘অষ্টভুজা’ এবং ‘চতুর্ভুজা’ মুখোশ।[77] পুরুলিয়াতে আবার দুর্গা পালায় ব্যবহৃত মুখোশগুলি দেবীর সম্পূর্ণ পরিবারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।[78] এখন প্রশ্ন হল, ‘দুর্গা’ পালার উদ্দেশ্যে নির্মিত মুখোশগুলি কিভাবে ‘চণ্ডী’ র ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত? এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেহেতু দেবী চণ্ডী ‘দুর্গা’, ‘মহামায়া’ প্রভৃতি নামেও ভূষিত, লোকশিল্পে ‘চণ্ডী’র পরিপ্রেক্ষিতে তাই ‘দুর্গা’ পালার বিষয়ের সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে দেবী ‘চণ্ডী’ দুর্গা, মহামায়া, কালী প্রভৃতি নামেও পরিচিত। অর্থাৎ লোকশিল্পের জগতে

---

[74] *তদেব।*

[75] তারাপদ সাঁতরা, ‘চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র’, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* (কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০), ১২৬।

[76] দীপঙ্কর ঘোষ, ‘বর্ণময় বিচিত্রতা’, *বাংলার মুখোশ,* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২), ৪৭।

[77] *তদেব,* ৪৮।

[78] *তদেব,* ৫২।

‘চণ্ডী’র বিভিন্ন রূপগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মালদহ জেলার ‘ চণ্ডী’র মুখোশ বৈচিত্র্যময়।[79] এক্ষেত্রে ‘চামুণ্ডা’, ‘মশান চণ্ডী’, ‘বুড়ি চণ্ডী’ প্রভৃতি রং এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বহুবিচিত্র মুখোশ দেখতে পাওয়া যায়।[80] উত্তর দিনাজপুর জেলার শিল্পীরা আবার হলুদ রঙের ‘চণ্ডী’র মুখোশ নির্মাণ করেন।[81] মনসার মুখোশে আবার তিনটি এবং একটি ফণাযুক্ত সাপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[82] মনসার মুখোশ হলুদ এবং নীল রঙের হয়ে থাকে।[83] মঙ্গলকাব্যের পালাগান বা উভয় দেবীর স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এই মুখোশগুলি নির্মিত হয়। তবে, বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে মুখোশের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এর উপর নির্ভরশীল শিল্পীদের জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

লোকশিল্পের মতো লোকচিত্রকলায়ও ‘ মনসা’ ও ‘ চণ্ডী’র প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। লোকচিত্রকলার মধ্যে অন্যতম হল ‘পটচিত্র’। ‘পটচিত্র’ হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর পটুয়াদের আয়ের অন্যতম উৎস। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই প্রধানত এই পটচিত্রগুলি চিত্রিত হয়।[84] বিশেষতঃ ইসলাম আক্রমণের পর যেসব লৌকিক দেবদেবীর হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতে আগমন ঘটে, তাদের উত্থানের কাহিনীই পটচিত্রগুলির অন্যতম উপজীব্য। মনসামঙ্গলের পটের ক্ষেত্রে একজন ‘নারী’কে সর্বপ্রথম দেবীরূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।[85] এরপর তার ভয়ংকর রূপ, চন্দ্রধর বণিকের সাথে তার মর্যাদার লড়াই, লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু, বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা এবং স্বর্গারোহণ করে নিজ স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি বিষয়গুলি জড়ানো পটচিত্রের

---

[79] *তদেব,* ৫৬-৫৮।

[80] *তদেব।*

[81] *তদেব,* ৫৯।

[82] *তদেব।*

[83] *তদেব।*

[84] Ratnabali Chatterjee, “Representation of Gender in Folk Paintings of Bengal”, *Social Scientist* , Mar. - Apr., 2000, Vol. 28, No. 3/4 (Mar. - Apr., 2000): 7.

[85] *তদেব,* ৯।

মাধ্যমে ক্রমশ প্রকাশ হতে থাকে।[86] পটুয়ারা আবৃত্তির মতো একধরণের গান পাঠ করে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের কাহিনীগুলিকে বর্ণনা করেন। এই গান ‘পটচিত্রের গান’ নামেও পরিচিত।

“মনসা হে জগতগৌরী জয় বিষহরী
অষ্টম নাগের মাতা প্রণাম সুন্দরী।”[87]

উল্লেখিত পটচিত্রের গানের মাধ্যমে মনসার দৈবী সত্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। এইভাবে ক্রমশ পটের মাধ্যমে পটুয়ারা সম্পূর্ণ কাহিনীও বর্ণনা করেন। পটচিত্রে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যেরও প্রকাশ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের পটে দেবী ‘ চণ্ডী’ দুর্গা রূপে বিরাজমান। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে মণিমালা চিত্রকর নামে একজন পটশিল্পীর ‘চণ্ডীমঙ্গলের’ পটের বিবরণ পাওয়া যায়।

“দূর্গে দূর্গে তারা মা গো দুষ্ট বিনাশিনী,
দুর্জয় দখিনে নাম লগেন্দ্রনন্দিনী।
দশবাহু চণ্ডী মায়ের দশদিকে সাজে,
ত্রিনয়ন চলেছে মায়ের কপালেরই মাঝে।
লক্ষী বাম সরস্বতী কার্ত্তিক গনেশ,
সিংহ সুর্জয় বিজয়া চলে মায়ের সনে।”[88]

পটচিত্রের গান অনুযায়ী, স্বতন্ত্র সত্তা সম্পন্ন লৌকিক দেবী ‘ চণ্ডী’ এখানে দুর্গা রূপেই বিরাজমান। দুর্গার মতোই সে দশভূজা। গানের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ কাল্টের বর্ণনা পাওয়া যায়। মণিমালা চিত্রকর সর্বপ্রথম চণ্ডীর দৈবীসত্তার প্রচারের মাধ্যমে তার গানের সূচনা করলেও, ক্রমশ সে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘কালকেতু’ পর্বের অবতরণ করেন।

“হয়েছিল দয়া, ডালিমতলাতে রত্ন দিল দেখাইয়া।
ডালিমতলার রত্ন কালকেতু পেল,

---

[86] *তদেব্।*

[87] *তদেব্।*

[88] কলকাতা বইমেলায় ২০১৫ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি ‘মণিমালা’ চিত্রকর নামক একজন পটশিল্পী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের গান পটের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

কাটিয়া গুজরাটের বন নগর বসাল।"[89]

উক্ত গানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কালকেতু'র উপর দেবীর আশীর্বাদের কথা জানা যায়। আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত রত্নের মাধ্যমে তার অরণ্য কেটে নগর উত্থানের বিষয়েও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মণিমালা চিত্রকর প্রধানত ' কালকেতু' পালার বর্ণনা করেছিলেন পটচিত্রের মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে ইউটিবয়ের মাধ্যমে ' মনসা' ও ' চণ্ডী' পটচিত্রের গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরফলে পটচিত্র এবং তার গানের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেলেও, স্যোশাল মিডিয়ার কারণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েনি। এমনকি দুর্গাপূজার মণ্ডপসজ্জায়ও ' মনসা' ও ' চণ্ডী' পট ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মণ্ডপসজ্জার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে (কলকাতা) আদি লেক পল্লীর সার্বজনীন দূর্গোৎসবের প্যাণ্ডেলের কথা বলা যায়, যেখানে থিমে পটচিত্র ও শিল্প সহাবস্থান করেছিল। এখানে অন্যান্য পটের সঙ্গে মণ্ডপসজ্জায় মনসাপটও দেখা যায়। এছাড়া যাদবপুর থানার অন্তর্গত কাটজুনগর সর্বজনীন দূর্গোৎসব ২০১৭ সালে মনসামঙ্গলের ' পটচিত্রের' থিম অনুসরণ করা হয়। এর মাধ্যমে পটচিত্রের মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাণিজ্যিকীকরণের একটি দিক পরিস্ফুট হয়।

পটচিত্রের মতো মালি চিত্রকলাতেও মনসা এবং চণ্ডীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় মনসা পূজার সময় দুই ধরনের মালি চিত্রকলা নির্মাণ করা হয়।[90] প্রথমটি হল চৌডোলা, এবং দ্বিতীয়টি হল 'মঞ্জুস'।[91] চামুণ্ডা বা চণ্ডী'কে কেন্দ্র করেও মালি চিত্র অঙ্কন করা হয়। এছাড়া 'মনসা' ও 'চণ্ডী'কে ঘিরে আরও একধরণের চিত্রকলা রয়েছে, যাকে বলা হয় মেল্লী চিত্রকলা।

---

[89] *তদেব্।*

[90] তারাপদ সাঁতরা, 'চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র', *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* (কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০), ১৬।

[91] *তদেব্।*

এই চিত্রকলাগুলিতে মঙ্গলকাব্যের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও উভয় দেবীসত্তার সাথে যোগসূত্র রয়েছে।

## পালাগান ও যাত্রায় মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিত

‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’র পালা মূলতঃ দেবীপালার অন্তর্গত। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় পালাগানগুলি রচিত হলেও, তার মধ্যে পালাগানের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল- ১) কাহিনী, ২) চরিত্র, ৩) সঙ্গীত, ৪) সংলাপ, ৫) দোহার, ৬) বাদ্য, ৭) মূল গায়কের ব্যাখ্যমূলক বিবৃতি এবং ৮) মূল গায়কের ভূমিকা।[92] মনসার পালাগান বাঙালীর সমাজজীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। পালাগানের মাধ্যমে পালাগায়কগণ হিন্দু সমাজের রীতিনীতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বেশীরভাগ পালাগান গীত হয় ক্ষেমানন্দের ‘মনসার ভাসান’ কাহিনী অবলম্বনে।[93] এক্ষেত্রে পালাগানের মধ্যে মনসার জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সনকার সাধভক্ষণ, বেহুলার স্বর্গারোহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত। মনসার পালাগান মূলত তিনটি প্রচলিত ধারায় পরিবেশিত হয়। প্রথমত, পালাগানের ধারা, দ্বিতীয়ত, রয়ানী ধারা এবং তৃতীয়ত, লোকনাট্যের ধারা।[94] প্রথম দুটি ধারা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত।[95] এছাড়া রয়ানী ধারাটি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত।[96]

চব্বিশ পরগণা জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে এই রীতিতে মনসার গান হয়।[97] মনসার রয়ানী ধারা আবার ‘ পাঁচালপালা’, ‘ একক গান’, ‘ ঘোষাগীতি’, ‘ পাঠপালা’ এবং

---

[92] দেবব্রত নস্কর, ‘দেবীপালা’, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯), ৮২।

[93] *তদেব,* ৮৩।

[94] *তদেব,* ৮৭।

[95] *তদেব।*

[96] *তদেব,* ৮৮।

[97] *তদেব।*

‘লোকনাট্যের ধারা’, এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত।[98] পাঁচালপালার ধারাটি ক্যানিং থানার অন্তর্গত মনসাপুকুর, বারাসাত, বারুইপুর থানার অন্তর্গত কুলবেড়ে প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।[99] দ্বিতীয় ধারাটি উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাঁকুড়িয়া, খলিসাধী প্রভৃতি গ্রামে প্রচলিত।[100] এই অঞ্চলে বনমালী মণ্ডলের ঘোষাগানের জনপ্রিয় একটি দল রয়েছে।[101] এছাড়া বাকী তিনটি রীতিতেও অখণ্ড চব্বিশ পরগণায় মনসার ভাসান গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি হলেও, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লৌকিক নামকে কেন্দ্র করে ‘চণ্ডী’র পালা উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল চব্বিশ পরগণা জেলার ‘হাড়িরঝিচণ্ডী’র উদ্দেশ্যে আয়োজিত পালাগান। এই পালাগানে ‘হলুদবাণ’, ‘ধূলাবাণ’, ‘তেলপড়া’ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারিত হয়।[102] ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মাণিক দত্ত এবং মাধবাচার্যের কাব্যের উপর নির্ভর করেই চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগান গাওয়া হয়।[103] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি ও শ্রীমন্তের মশান গানের উপর এই পালাগানগুলি রচিত হয়। বর্তমানে পালাগানগুলির অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেও, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পালাগানের বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।

## বাংলা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকে মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপনা

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপর নির্মিত বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকগুলি সঞ্চালিত হয় টেলিভিশন এবং প্রেক্ষাগৃহের মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৭৭ সালে অভি ভট্টাচার্য ও চিত্রা সেন কর্তৃক  পরিচালিত ‘বেহুলা লক্ষ্মীন্দর’। প্রধানত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের ভিত্তিতে এই চলচ্চিত্র

---

98 *তদেব্।*

99 *তদেব্।*

100 *তদেব্।*

101 *তদেব্।*

102 *তদেব্*, ১৩৬।

103 *তদেব্*, ১৩৭।

পরিচালিত হয়। সেইসূত্রে এই চলচ্চিত্রে দেবসভায় 'মনসার' দেবীত্বের দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে চন্দ্রধর বণিকের সাথে তার মর্যাদার লড়াই, লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার সতীত্বের বলে নিজ স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা, প্রভৃতি বিষয়গুলি কাব্যের ধারায় অনুসৃত। তবে, এর মধ্যে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অন্য কাহিনীগুলি, যেমনঃ হাসান-হোসেনের সাথে মনসার দ্বন্দ্ব, জালু-মালুর ধনপ্রাপ্তি, প্রভৃতি বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। প্রধানত মনসামঙ্গল কাব্যের ' বণিক খণ্ড' এবং ' বেহুলার পরীক্ষা'কে কেন্দ্র করেই এই চলচ্চিত্র উপস্থাপিত হয়। বিজয় ভাস্করের পরিচালনায় ' মনসা আমার মা' নামক অপর চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে ৪ঠা আগস্ট। চলচ্চিত্রের কাহিনী অনুসারে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামের জনৈক গোমস্তা কন্যা 'ঈশ্বরী'র সাথে, জমিদার পুত্র 'রাজু'র বিবাহ, বিবাহ পরবর্তীকালে শ্বশুড়গৃহে তার নিপীড়ন, স্বামীর অত্যাচার এবং মনসাদেবীর কৃপায় তার সকল সমস্যার সমাধানের উপর ভিত্তি করেই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। ' মনসামঙ্গলের' প্রথাগত কাহিনীর উপর নির্ভর করে চলচ্চিত্রটি নির্মিত না হলেও, এর মাধ্যমে দেবী ' মনসা'র মাহাত্ম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে 'মনসা'র রূপের বাণিজ্যিক দিকটি অনুমান করা যায়। এছাড়া 'মনসা'র নৃতাত্ত্বিক রূপকে কেন্দ্র অনেক তামিল চলচ্চিত্রকেও বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হল যথাক্রমে, ' নাগকন্যা', ' সাপের মহিমা', ' শ্বেতনাগ', 'মনসাকন্যা' প্রভৃতি। উল্লেখিত ভাষান্তরিত চলচ্চিত্রগুলির ' মনসামঙ্গল' কাব্যের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও, কাহিনীগুলির মাধ্যমে 'মনসা'র দেবীমাহাত্ম্য জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

'সর্প' কাল্টের উপর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র হল ' বাবা তারকনাথ'।[104] শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হলেও, প্রধান নারী চরিত্র ' সুধা'র স্বামীর সর্পদংশনে

[104] E. A. Morinis, "Baba Taraknath": A Case of Continuity and Development in the Folk Tradition of West Bengal, India, *Asian Folklore Studies* , 1982, Vol. 41, No. 1 (1982): 67-81.

প্রাণনাশ, এবং স্বামীর জীবন প্রাপ্তির জন্য তার সংগ্রামকেও উল্লেখ করা হয়েছে।[105] এই চলচ্চিত্রও 'মঙ্গলকাব্যে'র আঙ্গিকে নির্মিত নয়। কিন্তু 'সর্প' কাল্ট এখানে স্থান পেয়েছে। 'চণ্ডী'র ধারণার উপর কোনোরকম বাংলা চলচ্চিত্র না হলেও, কিছু তামিল চলচ্চিত্র বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল, 'মা মঙ্গলা কালী'। এছাড়া 'মা মঙ্গলচণ্ডী' নামক একটি চিত্রনাট্য পরিবেশিত হয় ২০১৯ সালে। নাট্যাচার্য মোহন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় ' ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা'কে ভিত্তি করে এই চিত্রনাট্যটি সম্প্রচারিত হয়।

চলচ্চিত্র ও চিত্রনাট্য ব্যতিরেকে ' মনসামঙ্গল' ও ' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকে নির্ভর করে বাংলা ধারাবাহিক টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হয়। টেলিভিশনে কালার্স বাংলা নামক চ্যানেলে ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাসে ' মনসা' নামক ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়। প্রায় চারশো পর্বের এই ধারাবাহিকে মনসার দেবীত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন থেকে শুরু করে, বেহুলার 'সতী' রূপে অবতীর্ণ হওয়ায় বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিষয়গুলিকে অতিরঞ্জিত করা হলেও, মূল কাব্য থেকে ধারাবাহিকটি বিচ্যুত হয়নি। অনুরূপভাবে, ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট দেবী ' চণ্ডী'র মাহাত্ম্য প্রচারে কালার্স বাংলায় 'মঙ্গলচণ্ডী' ধারাবাহিকটি উপস্থাপিত হয়। 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে ধারাবাহিকটি নির্মিত হলেও এর মাধ্যমে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধারা অনুসৃত হয়।

'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য তথা 'মনসা' ও 'চণ্ডী' কাল্টের বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গটি উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুমান করা যায়। প্রথমত, গ্রামবাংলায় উভয় দেবীকে ঘিরে যে মেলাগুলি আয়োজিত হয় তার সাথে ' মঙ্গলকাব্যের' প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে, উল্লেখিত কাব্যগুলির মুখ্য চরিত্র রূপে যেহেতু দুই দেবী বিরাজমান, তাই মেলার মাধ্যমে এই দুই কাল্টের বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব। এছাড়া মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য অনেক সময় 'পালাগান', 'যাত্রাপালা'

[105] *তদেব।*

প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ কাব্যের সাথে মেলার যোগাযোগ না থাকলেও, মেলায় অনুষ্ঠিত পালাগান বা যাত্রাপালার শিল্পীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ মেলাগুলির উপর নির্ভর করে। লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলায় উভয় দেবীর অবস্থানকে উক্ত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। মৃৎশিল্প, মুখোশশিল্প, শোলাশিল্প, পটচিত্র, মালি চিত্রকলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলির অন্যতম প্রেক্ষাপট ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’, বিশেষতঃ ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য। পালাগানগুলি গ্রামগঞ্জে মনোরঞ্জনের জনপ্রিয় মাধ্যম। পালাগানের গায়করা বংশপরম্পরায় ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যকে ভিত্তি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। অপরদিকে ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকগুলি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও, বিবভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া তথা ইউটিউবে মনসা ও চণ্ডী কেন্দ্রিক বিভিন্ন মেলা, পটচিত্রের গান, পালাগান, যাত্রাপালা, চলচ্চিত্র প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন ধারাগুলি বর্তমান সময়ে ম্লান হয়ে গেলেও, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তার জনমানসে সম্প্রসারিত হয়েছে। আর ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ উভয় দেবী এবং মঙ্গলকাব্যের বিষয়গুলি যেহেতু লোকসংস্কৃতির সাথে যুক্ত, তাই পরোক্ষভাবে এর মাধ্যমে উভয় দেবী ও কাব্যের বাণিজ্যিকীকরণও সম্ভব হয়েছে।

# পরিশিষ্টঃ ১

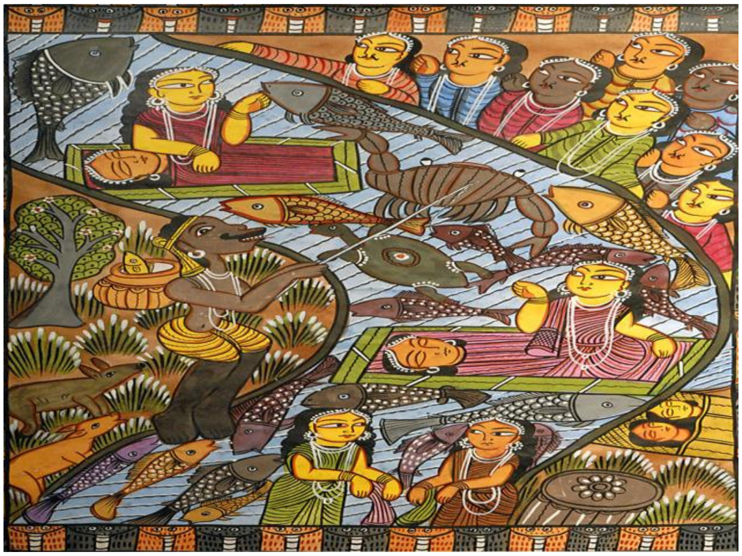

পটচিত্রেমনসামঙ্গলকাব্য

সূত্রঃ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manasa_Mangal.jpg

পটচিত্রে ‘কমলেকামিনী

সূত্রঃ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Extrait_de_Chandi_Mangal_de_Meena_Chitrakar_%28Naya_Bengale%29_%281439706046%29.jpg/1200px-Extrait_de_Chandi_Mangal_de_Meena_Chitrakar_%28Naya_Bengale%29_%281439706046%29.jpg

# পরিশিষ্টঃ ২

মণ্ডপসজ্জায় ‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের চিত্রকলা

সূত্রঃ কাটজুনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব, ২০১৭।

মণ্ডপসজ্জায়‘মনসামঙ্গলকাব্যের চিত্রকলা

সূত্রঃ সোনারপুর, বাঁশতলা, ২০১৯।

# পরিশিষ্টঃ ৩

চলচিত্রে ‘মনসামঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যিকীকরণ

সূত্রঃ https://www.primevideo.com/detail/0GI1OPK1L341JD6G4ACJHGEUCL/ref=atv_dp_share_cu_r

ধারাবাহিকে ‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যিকীকরণ

সূত্রঃ https://cdn.colorsbangla.com/wp-content/uploads/2019/08/17104047/mc-banner-generic-copy-2.jpg

# গ্রন্থপঞ্জি

## আকর পুঁথি


“কবিকঙ্কণের চণ্ডী”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫৩৮৮।

“কবিকঙ্কণ চণ্ডী”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৯৯১।

কবিবল্লভ, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৯৭০।

কবিচন্দ্র, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৯৯৭।

কেতকাদাস, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫০০২।

কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, “মনসামঙ্গল ভাসান”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১৮১।

কালিদাস, “মনসামঙ্গল ভাসান”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৭১৯।

কৃষ্ণদাস, “মনসামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫১।

ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৩৫৩১।

ক্ষেমানন্দ, “মনসামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৭৯৯

ক্ষেমানন্দ, “মনসামঙ্গলের সারিগান”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৯৮৬।

ক্ষেমানন্দ, “মনসার পাতড়া”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১১০৯।

গোস্বামী, রসিক দাস, “মার্কণ্ডেয় পুরাণ”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫৭০৯।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, “চণ্ডীপ্রশংসা”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৬৩০৭।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, “চণ্ডীমঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, “চণ্ডীমঙ্গল পাতড়া”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১০৪০।

দাস, সীতারাম, “মনসামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৬২১৭।

দাস, নরসিংহ, “শিবপুরাণ”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ২৬৩।

দাস, রামেশ্বর, “হাটপত্তন”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১০৬।

দ্বিজ, নারায়ণ, “চণ্ডিকামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৭৬৭।

দ্বিজ, বানেশ্বর, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৫৪০৫।

দ্বিজ, বংশীদাস, “মনসামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৬০৯১।

দ্বিজ, রামেশ্বর, “শিবায়ন”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ২৮৮।

পিপিলাই, বিপ্রদাস, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা,ক্রমিক সংখ্যাঃ ৩৫৩০।

বিষ্ণুপাল, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৯৯৩।

বিষ্ণুপাল, “মনসামঙ্গল”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ২২২২।

বিষ্ণুপাল, “মনসার পাতড়া”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১৭৩৯।

বিপ্রদাস, “মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৩৫২৯।

বিপ্রদাস, “মনসামঙ্গল সঙ্গীত”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ১৯০৭।

বিদ্যা, হরিদাস, “ সমুদ্রমন্থন বা মনসামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৯৭১।

ভট্টাচার্য, মহাদেব বিদ্যাবাগীশ, “ মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি”, বিশ্বভারতী পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৮৮২।

লালা, জয়নারায়ণ, “চণ্ডিকামঙ্গল”, এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা, ক্রমিক সংখ্যাঃ ৪৩৪৮।

## <u>Census Reports</u>

ভারতের জনগণনা. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড), ১৯৬১, অশোক মিত্র (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

ভারতের জনগণনা. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৬১, অশোক মিত্র (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

ভারতের জনগণনা. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (তৃতীয় খণ্ড), ১৯৬১, অশোক মিত্র (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

ভারতের জনগণনা. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৬১, অশোক মিত্র (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

ভারতের জনগণনা. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (পঞ্চম খণ্ড), ১৯৬১, অশোক মিত্র (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি।

## আকর গ্রন্থ

আচার্য, হরেকৃষ্ণ. *পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত 'পদ্মাপুরাণ'*. কলকাতাঃ অক্ষর পাবলিকেশন্, ২০০৮ (প্রথম)।

ওঝা, সুনীল কুমার. *মাণিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল'* .উত্তরবঙ্গঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

কয়াল, অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব (সম্পা.). *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত 'মনসামঙ্গল'* . কলিকাতাঃ লেখাপড়া, ১৩৮৪ (প্রথম)।

গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সং.). *রামানন্দ যতি বিরচিত 'চণ্ডী মঙ্গল কাব্য'*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

চক্রবর্তী, রামনাথ ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.). *দ্বিজ বংশীদাস বিরচিত 'পদ্মাপুরাণ'*. কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, বৈশাখ ১৩১৮।

চক্রবর্তী, নটবর (সম্পা.). *ক্ষেমানন্দ দাস বিরচিত 'মনসামঙ্গল'*. কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন প্রেস, ১৩১৬।

তর্করত্নেন, পঞ্চানন (সম্পা.). *মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস বিরচিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্'*. কলিকাতাঃ কলিকাতারাজধান্যাম্, ১৮২৭ শকাব্দ।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.). *শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্ 'বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্'*. কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-প্রেস, ১৩১৪ সাল (দ্বিতীয়)।

দাশগুপ্ত, তমোনাশ চন্দ্র (সম্পা.). *সুকবি নারায়ণ দেব বিরচিত 'পদ্মাপুরাণ'*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২ (প্রথম)।

দাস, আশুতোষ (সম্পা.). *জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত 'মনসামঙ্গল'*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৬০।

দত্ত, রাজচন্দ্র (সম্পা.). *ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত ‘মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা’*. কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র. *কবিকঙ্কণ চণ্ডী বিরচিত ‘ চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী’ ( প্রথম ভাগ)*. কলিকাতাঃ কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯২৫ সাল।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.). *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘ মনসামঙ্গল’*. কোলকাতাঃ রত্নাবলী, এপ্রিল ২০০২ (প্রথম)।

ভট্টাচার্য্য, বসন্ত কুমার ( সং). *কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত ‘ পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল’*. কলিকাতাঃ সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২।

ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ ( সম্পা.). *দ্বিজ মাধব রচিত ‘ মঙ্গলচণ্ডীর গীত’*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

ভট্টাচার্য্য, দীনেশচন্দ্র ও আশুতোষ ভট্টাচার্য্য. *রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত ‘শিবায়ন’*. কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৬৩ (প্রথম)।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ. *‘বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা’*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯০৪।

রক্ষিত, রাধাচরণ. *‘চণ্ডিকা-মঙ্গল’ (কাব্য)*. চট্টগ্রামঃ সনাতন প্রেস, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

লাহা, জহরলাল (সং). *মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ‘পদ্মপুরাণ’ (ভূমিখণ্ড)*. কলিকাতাঃ বেদান্ত প্রেস, ১২৯১ সাল।

সরকার, শ্রী পঞ্চানন (সম্পা). *দ্বিজ-কমললোচন প্রণীত ‘চণ্ডিকা-বিজয়’*. কলিকাতাঃ বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার ( সম্পা.). *বিপ্রদাস বিরচিত ‘ মনসা-বিজয়’*. ক্যালকাটাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮।

সেন, সুকুমার ( সম্পা.). *বিষ্ণুপাল বিরচিত ‘ মনসা-মঙ্গল’*. কলকাতাঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮ (প্রথম)।

সেন, সুকুমার ( সম্পা.). *কবিকঙ্কণ-বিরচিত ‘ চণ্ডীমঙ্গল’*. নয়া দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম)।

হালদার, যোগিলাল ( সম্পা.). *রামেশ্বরের ' শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন'*. কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

## ইংরেজি আকর গ্রন্থ

Barbosa, Durate. *The book of Durate Barbosa*. Vol. 2, London: The Hakluyt Society, 1921.

Cortesao, Armando (trns.). *The Suma Oriental of Tome Pires 1512-1515* . Vol. I, London: The Hakluyt Society, 1944.

Ganguly, Basanta Kumar. *The Rgveda Samhita*. Vol. 1, Kolkata: The Asiatic Society, August 2004.

Kunst, Arnold and J. L. Sastri. *Ancient Indian Tradition and Mythology: The Siva-Purana* (Vol-I). Delhi: Sundarlal Jain & Motilal Banarsidas, 1969 ($1^{st}$).

Macdonell, A. A. *Vedic Mythology*. Strassburg, 1897.

O'Malley, L. S. S. *Bengal District Gazetteers: 24- Parganas*. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1914.

Pargiter, Eden, F. *Markandeya Purana*. Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1904.

Rannell, James. *A Memoir Upon The Maps Of Bengal: Constructed From 1764 Onwards*. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1914.

## সহায়ক গ্রন্থ

কামিল্যা, মিহির চৌধুরী. *রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা.* কলিকাতাঃ ভোলানাথ প্রকাশনী, ১৯৯১ (প্রথম)।

------------------ আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি. বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২ (প্রথম)।

------------------ *বাংলার নারী সংস্কৃতি লোকায়ত প্রেক্ষাপট.* কলকাতাঃ পুনশ্চ, ২০০৩।

------------------ *রাঢ়ের গ্রামদেবতা.* বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

কোলে, গদাধর. *বাঙ্গলার ইতিহাস.* হুগলীঃ ভগীরথ কুটীর, ১৩৬৬ (প্রথম)।

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ. *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য.* কলকাতাঃ পুঁথি প্রকাশনা, ১৯৯৪।

------------------ *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬।

------------------*মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬।

গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন. *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলঃ জীবনবীক্ষার আলোকে.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০।

গোস্বামী, অমিতাভ. *মঙ্গলকাব্যে লোক জীবন ও লোক ধর্মভাবনা.* কলকাতাঃ সোপান পাবলিশার্স, ২০০০ (প্রথম)।

ঘোষ, বিনয়. *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (প্রথম খণ্ড). কলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

-----------*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (চতুর্থ খণ্ড). কলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৮৬ (প্রথম)।

-----------*বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০).* কলকাতাঃ প্রকাশ ভবন, ২০০৯।

ঘোষ, দীপঙ্কর. *বাংলার মুখোশ.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার. *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ.* কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, জানুয়ারী ১৯৮৪ (প্রথম)।

চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ. *দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণ রায়.* কলিকাতাঃ দে বুক স্টোর, অক্টোবর ২০০৫।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত. *বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি.* কলকাতাঃ সুবর্ণরেখা, ২০০২।

চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা. *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা.* কলকাতাঃ বিদ্যা, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র. *বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ* ( আদিমধ্য যুগ). কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল. *ইতিহাস অনুসন্ধান ৩২.* কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮।

চৌধুরী, ভূদেব. *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (প্রথম পর্যায়). কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৮।

চৌধুরী, সুশীল. *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০.* কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. *বাংলার ব্রত.* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ঃ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫০ (প্রথম)।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ. *বাঙ্গলার ইতিহাস.* কলকাতাঃ চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪।

দাশ, নির্মল. *মধ্যযুগের কাব্যপাঠ.* কলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রা. লি., ২০০৯।

দাস, ক্ষুদিরাম. *কবিকঙ্কনচণ্ডী* (প্রথম খণ্ড). কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

দাস, অপু. *বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগঃ নারীবাদী পাঠ.* কলকাতাঃ বাণীশিল্প, ২০১৬।

দাশগুপ্ত,অজিতকুমার. *ভারত ইতিহাসে বর্ণপ্রথা.* কলকাতাঃ পাণ্ডুলিপি, ২০১০।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা রূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা* (মর্মানুবাদ গোপীমোহন সিংহরায়). কলিকাতাঃ ভারবি, ১৯৯৬।

------------------ *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য.* কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৯।

দে, আশিস্ কুমার ও বিশ্বনাথ রায় (সম্পা.). *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬।

দে, অপূর্ব. *চাঁদ বণিকের পালাঃ আধুনিক উপাখ্যান.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।

নস্কর, দেবব্রত. *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯।

পোদ্দার, অরবিন্দ. *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪।

পাণ্ডা, বিষ্ণুপদ. *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত.* কলিকাতাঃ মঞ্জুষা, ১৯৮৬।

বসু, অশোক কুমার. *গঙ্গাপথের ইতিকথা.* কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি ১৯৮৯ (প্রথম)।

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ. *বাংলার লৌকিক দেবতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৬৬ (প্রথম)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত.* কলিকাতাঃ মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন. *মধ্যযুগে বাঙ্গালা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীপ্রসাদ. *মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য.* কলিকাতাঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৫৮ (প্রথম)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার. *ভারতের নদনদী.* কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা. *মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার. *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারাঃ আদিযুগ ও মধ্যযুগ* ( প্রথম খণ্ড). কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বিশ্বপতি চৌধুরী ও অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( সম্পা.). *কবিকঙ্কণ চণ্ডী* (আখেটিক খণ্ড). কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

বর্মণ, রূপ কুমার ও কৃষ্ণ কুমার সরকার (সম্পা.). *মালো জাতির ইতিহাস ও আকরগ্রন্থ.* কলকাতাঃ কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌, এপ্রিল ২০২০ (প্রথম)।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস.* কলিকাতাঃ এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০ (দ্বাদশ)।

------------------*বাংলার লোকসাহিত্য.* কলিকাতাঃ এন.বি.টি.আই, ১৯৮২।

ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন. *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড). কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩।

ভট্টাচার্য্য, শিবপ্রসাদ. *ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা.* কলিকাতাঃ মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাই. লিম, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ. *বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা.* কলিকাতাঃ হাউস অব বুকস্‌, জানুয়ারী ১৯৫৭ (প্রথম)।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী. *প্রত্নতত্ত্বে বারুইপুর.* বারুইপুরঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, ২০০৩।

মণ্ডল, মোহনলাল. *হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী.* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০1 (প্রথম)।

মণ্ডল, ইন্দুভূষণ. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান.* কলিকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৮৭।

মজুমদার, আশুতোষ. *মেয়েদের ব্রত-কথা.* কলিকাতাঃ দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র ( সম্পা.). *বাংলাদেশের ইতিহাস* ( মধ্যযুগ, দ্বিতীয় খণ্ড). কলিকাতাঃ জেনারেল, ১৯৮৭।

মল্লিক, দীপঙ্কর. *লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য( লোকসংস্কৃতি ও মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক পাঠ)*. কলকাতাঃ দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩।

মান্না, শিবেন্দু. *বাংলার লোকমাতা দেবী চণ্ডী.* নদীয়াঃ নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নভেম্বর ২০০৭ (প্রথম)।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. *বাংলায় ধর্মসাহিত্য (লৌকিক).* কলিকাতাঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৩৮৮।

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার. *ধনপতির সিংহলযাত্রা.* কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বৈশাখ ১৪১৭।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়. *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ).* কলিকাতাঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৮।

----------------- *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম.* কলিকাতাঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৮।

মুহম্মদ, আবদুল খালেজ. *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান.* ঢাকা, ১৯৮৫।

মুহম্মদ, আবদুল জলিল. *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.).* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২।

মিত্র, অমলেন্দু. *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর.* কলকাতাঃ সুবর্ণরেখা, ১৪০৭।

মিত্র, শম্ভু. *চাঁদ বণিকের পালা.* কলকাতাঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৪১৪।

মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ. *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প.* কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পৌষ ১৪১৪।

রক্ষিত, দুর্গাচরণ. *তাম্বুল বণিক.* কলিকাতাঃ প্রবাসী প্রেস, ১৩৩৩।

রায়, কামিনীকুমার. *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার.* কলিকাতাঃ বাসন্তী লাইব্রেরী, প্রকাশকাল অনুপস্থিত।

রায়, পরমেশপ্রসন্ন (সং). *মেয়েলি ব্রত ও কথা.* কলিকাতাঃ বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ.* কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৫২ (প্রথম)।

----------------- *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব.* কলিকাতাঃ বুক এম্‌পোরিয়ম, ১৯৯৯ (প্রথম)।

----------------- *বাংলার নদনদী.* কলিকাতাঃ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫৪।

রায়, অনিরুদ্ধ. *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯ (প্রথম সং)।

রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী (সম্পা.). *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি.* কলকাতাঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯২ (প্রথম)।

রাণা, সুমঙ্গল. *ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য-পুথির তথ্যে আলোচনা.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

লালা, আদিত্যকুমার. *মনসামঙ্গল কাব্য জীবনদৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৯ (প্রথম)।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *প্রাচীন বাংলার গৌরব.* কলিকাতাঃ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আশ্বিন ১৩৫৩ (প্রথম)।

সমাজদার, সুভাষ. *বাণিজ্যে বাঙ্গালী সেকাল ও একাল,* কলিকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, বৈশাখ ১৩৭২ (প্রথম)।

সরকার, প্রণব. *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি.* সোনারপুর, কলকাতাঃ লোক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩ (প্রথম)।

সরকার, জগদীশনারায়ণ. *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ). কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৮ (প্রথম)।

সাত্তার, আবদুস্. *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য.* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৭১ (প্রথম)।

সাঁতরা, তারাপদ. *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ.* কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০০ (প্রথম)।

সেন, ক্ষিতিমোহন. *বাংলার সাধনা.* কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস( আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত).* কলিকাতাঃ মর্ডান বুক এজেন্সী, (সময়কাল অনুপস্থিত)।

----------------- *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী.* কলিকাতাঃ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫২।

----------------- *বিচিত্র দেবতা( প্রাচীন মিথ্ ও ধর্মকথা).* কলিকাতাঃ এ.কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, ১৯০৭।

সেন, দীনেশচন্দ্র. *বৃহৎবঙ্গ(দ্বিতীয় খণ্ড).* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

------------------ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য.* কলকাতাঃ সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ, ২০০৯।

সেন, অঞ্জন ও শেখ মকবুল ইসলাম (সম্পা.). *সর্প-সংস্কৃতি ও মনসা.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২।

সেনগুপ্ত, পল্লব. *লোক পুরাণ ও সংস্কৃতি.* কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

সেনগুপ্তা, জয়া. *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী.* কলকাতাঃ ক্যাম্প, ২০০১ (প্রথম)।

হালদার, গোপাল. *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড).* ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯৫।

## ইংরেজি গ্রন্থ

Bagchi, Prabodh Chandra. *Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period*. Vol. I, Visva Bharati Annals, 1945.

Bhattasali, Nalini Kanta. *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal.* England: W. Heffer & Sons, 1922.

Campos, J.J.A. *History of the Portuguese in Bengal*. Patna: Janaki Prakashan, 1979.

Chakrabarti, Kunal. *Religious Process: The Puranas and the making of a Regional Tradition*. New York: Oxford University Press, 2001.

Chatterjee, Kumkum. *The Cultures of History in Early Modern India: Persianization and Mughal Culture in Bengal*. New Delhi: Oxford University Press, 2009.

Curley, David L. *Poetry and History: Bengali Mangal-kabya and Social Change in Precolonial Bengal*. New Delhi: Chronicle Books, 2008.

Das Gupta, Tamonash Chandra. *Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature*. Calcutta: University of Calcutta, 1935.

Doniger, Wendy. *The Hindus: An Alternative History*. New York: The Penguin Press, 2009.

Eaton, Richard M. *The Rise of Islam and the Bengali Frontier 1204-1760*. New Delhi: Oxford University Press, 1994.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality: An Introduction*. Vol. I, New York: Pantheon Books, 1978.

Law, B. C. *Geographical essays relating to ancient geography of India*. Delhi-Varanasi and Calcutta: Bharatiya Publishing House, 1976.

Maity, Pradyot Kumar. *Historical Studies in the cult of the Goddess Manasa*, Calcutta: Punthi Pustak, 1966 (1st).

Majumdar, R.C. *History of Bengal: Hindu Period*. Vol. I, Dacca: The University of Dacca, 1943.

Majumdar, R.C. *The History and Culture of Indian People*. Vol. IV, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1965.

Marshall, John (ed.), *Mohenjo-Daro and the Indus Civilization*, London: Arthur Probsthain, 1931.

Mukherjee, Rila (Ed.). *Pelagic Passageways: The Northern Bay of Bengal before Colonialism*. Delhi: Primus Books, 2011 (1st).

Mukherjee, Rila. *Strange Riches: Bengal in the Mercantile Map of South Asia*. New Delhi: Foundation Books Pvt. Ltd., 2006 (1st).

Ray, Haraprasad. *Trade and Diplomacy in India-China Relations: A Study of Bengal during the Fifteenth Century*. New Delhi: Radiant Publishers, 1993.

Raychaudhuri, Tapan & Irfan Habib (Ed.). *The Cambridge Economic History of India*. Vol. I, Hyderabad: Orient Longman, 1982.

Sarkar, Jadunath. *The History of Bengal: Muslim Period 1200 A.D.-1757 A.D*. Vol. II, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1943.

Sircar, Jawhar. *The construction of the hindu identity in medieval western Bengal: the role of popular cults*. Kolkata: Calcutta University, July 2005.

Tarafdar, Momtazur Rahman. *Husain Shahi Bengal: 1494-1538 A.D*. Dacca: Asiatic Society of Pakistan, November 1965.

## সহায়ক প্রবন্ধ

Ahmad, Nisar, "Assam-Bengal Trade in the Medieval Period: A Numismatic Perspective", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 33, No. 2 (1990): 169-198.http://www.jstor.org/stable/3632227 . 29-06-2017 19:29 .

Akhtaruzzaman, Md., "Political Relations Between Medieval Bengal And Arakan", *Proceedings of the Indian History Congress* 61, Part Two: Millennium (2000-2001): 1081-1092. http://www.jstor.org/stable/44144423 . 29-06-2017 18:37 .

Anjum, Nazer Aziz, "Horse Trade in Medieval South India", *Proceedings of the Indian History Congress* 73 (2012): 295-303. http://www.jstor.org/stable/44156218. 29-06-2017 18:48 UTC

Bandyopadhyay, Rakhal Das, "Saptagrama or Satganw", *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 5, Part- 1-11, (1909): 245-262.

Bader, Chris and Demaris, Alfred, "A Test of the Stark-Bainbridge Theory of Affiliation with Religious Cults and Sects", *Journal for the Scientific Study of Religion* 35, No. 3 (Sep., 1996): 287-289. https://www.jstor.org/stable/1386560. 29-05-2017 11:40 UTC.

Béteille, André, "Varna and Jati", *Sociological Bulletin* 45, No. 1 (MARCH 1996): 15-27. http://www.jstor.org/stable/23619694 .30-06-2017 05:30 .

Bhattacharyya, Asutosh. “The Serpent as a Folk-Deity in Bengal.” *Asian Folklore Studies* 24, no. 1 (1965): 1–10. https://doi.org/10.2307/1177595 .
Bhattacharji, Sukumari, “Intruders into the Pantheon: Śiva and Dionysos”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 69, No. 1/4 (1988): 93-110. http://www.jstor.org/stable/41693760. 10-03-2016 10:53 UTC
Bhattacharji, Sukumari. “Economic Rights of Ancient Indian Women.” *Economic and Political Weekly* 26, no. 9/10 (1991): 507–12. http://www.jstor.org/stable/4397402 .11-03-2016 09:40 UTC.
Bhattacharya, Tithi, “Tracking the Goddess: Religion, Community, and Identity in the Durga Puja Ceremonies of Nineteenth-Century Calcutta”, *The Journal of Asian Studies* 66, No. 4 (Nov., 2007): 919- 962.https://www.jstor.org/stable/20203237. 29-10-2016 18:50 UTC.
Bhaumik, Sudarshana, “Tribal Identity & Socio-cultural Changes During 17$^{th}$ Century in the Rarh Region of Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 76 (2015): 252-258. https://www.jstor.org/stable/44156590 . 28-07-2021 18:49.
Blochman, H., “Contributing to the Geography and History of Bengal (Mahammadan Period)”, *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 63, Part- 1, (1874): 280-300.
Bainbridge, William Sims, and Rodney Stark. “Cult Formation: Three Compatible Models.” *Sociological Analysis* 40, no. 4 (1979): 283–95.
https://doi.org/10.2307/3709958.
Brown, Arthur, “Folklore Elements in the Medieval Drama”, *Folklore* 63, No. 2 (Jun., 1952): 65-78. http://www.jstor.org/stable/1257716 . 29-06-2017 18:34 .
Brooks, Beatrice A. “Fertility Cult Functionaries in the Old Testament.” *Journal of Biblical Literature* 60, no. 3 (1941): 227–53. https://doi.org/10.2307/3262623 . 28-05-2018 17:30
Buchanan, Briggs, “A Snake Goddess and Her Companions a Problem in the Iconography of the Early Second Millennium B.C”, *Iraq* 33, No. 1 (Spring, 1971): 1-18. http://www.jstor.org/stable/4199906 . 05-09-2016 11:26 .
Chakrabarti, Janardan, “A Study of the Manasa-Cult and Its Literary Expression”, *South Asian Archive*, (May 1933): 173-185.
Chakrabarti, Kunal, “A History of Intolerance: The Representation of Buddhists in the Bengal Purāṇas”, *Social Scientist* 44, No. 5/6 (May–June 2016): 11-27. http://www.jstor.org/stable/24890282 . 16-03-2018 16:52 UTC.
Chakravarti, Ranabir, “Early Medieval Bengal and the Trade in Horses: A Note”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 42, No. 2 (1999): 194-211. https://www.jstor.org/stable/3632335 .
Chakraborti, Phanindra Nath, “Pattern of Bengal’s Overseas Trade Under The Mughals- A Second Look”, *Proceedings of the Indian History Congress* 45 (1984): 375-383. http://www.jstor.org/stable/44140218 . 30-06-2017 08:02 .
Chakraborty, Srabani, “Water Bodies, Riverine Ports and Communications: Making Of the Transmeghne Sub-Regional Personality in Early Medieval Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 76 (2015): 166-173.
https://www.jstor.org/stable/44156579. 31-10-2020 19:28 UTC.

Chakravarty, D. K., “The Antiquity and the Evolution of the SAPTAMĀTRIKĀ Worship in Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 30 (1968): 129-138. http://www.jstor.org/stable/44141463 . 30-06-2017 07:50 .

Chakravarty, D.K., “On the Sculptural Representations Of Ambika-Gauri-Parvati From West-Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 32, Vol. I (1970): 200-210. http://www.jstor.org/stable/44141068 . 18-04-2018 19:44 .

Chatterjee, Kumkum, “Goddess encounters: Mughals, Monsters and the Goddess in Bengal”, *Modern Asian Studies*, (March 2013): 1-53. https://www.jstor.org/stable/24494217

Chatterjee, Kumkum, “The Persianization of "Itihasa": Performance Narratives and Mughal Political Culture in Eighteenth-Century Bengal”, *The Journal of Asian Studies* 67, No. 2 (May, 2008): 513-543. http://www.jstor.org/stable/20203376 . 25/11/2014 05:50 .

Chatterjee, Partha, “INDIAN CINEMA: Then and Now”, *India International Centre Quarterly* 39, No. 2 (Autumn 2012): 45-53.https://www.jstor.org/stable/41804040 .

Chatterjee, Ratnabali, “The Perception of the City in Medieval Bengali Literature”, *Proceedings of the Indian History Congress* 53 (1992): 187-193. http://www.jstor.org/stable/44142783 . 29-06-2017 18:33.

Chatterjee, Ratnabali, “Representation of Gender in Folk Paintings of Bengal”, *Social Scientist* 28, Mar. - Apr., 2000, No. 3/4 (Mar. - Apr., 2000): 7-21. https://www.jstor.org/stable/3518186.

Chatterji, Roma, “Folk Theatre on the Modern Stage: Manasa - Death Dealer/ Life Giver”, *Indian Anthropologist* 44, No. 2 (July-December 2014): 1-18. https://www.jstor.org/stable/43899386 .

Chatterji, Anjali, “Sectional President's Address: Aspects of Medieval Indian Society: Gleanings from Contemporary Literature”, *Proceedings of the Indian History Congress* 61, Part 1: Millennium (2000-2001): 196-241. http://www.jstor.org/stable/44148098 . 14-02-2018 16:37 .

Chattopadhyay, Annapurna, “A brief note on the spread of the Brahmanical language in ancient Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 57 (1996): 148-153. http://www.jstor.org/stable/44133300. 30-06-2017 06:15 .

Chattopadhyay, Annapurna, “A note on the contributions of the “Dravidas” to the ethnicity of the people and culture of Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 61, Part 1: Millennium (2000-2001): 57-64. http://www.jstor.org/stable/44148079. 30-06-2017 05:01 UTC.

Chattopadhyay, Annapurna, “A brief note on the ethno-historical approach to the cities of ancient Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 62 (2001): 64-70. http://www.jstor.org/stable/44155746 . 16-03-2018 17:00 UTC.

Chattopadhyay, R. K. and Rajat Sanyal, “Archaeological Research in West Bengal: A Brief Review”, *Proceedings of the Indian History Congress* 66 (2005-2006): 1377-1391. http://www.jstor.org/stable/44145953 . 29-06-2017 18:56 .

Chaudhuri, B. B., “General President’s Address: an approach to the study of morphology of selected towns and cities of medieval Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 72, Part-I (2011): 1-21. http://www.jstor.org/stable/44146693. 29-06-2017 20:09 .
Choudhary, Anil Kumar. “‘STRIDHANA’ AS DEPICTED IN ‘VIBHAGASARA’ OF VIDYAPATI.” *Proceedings of the Indian History Congress* 58 (1997): 329–33. http://www.jstor.org/stable/44143924 . 26:03:2017 11:30 UTC.
Chowdhury, Indira, “Oral Traditions and Contemporary History: Event, Memory, Experience and Representation”, *Economic and Political Weekly* 49, No. 30 (July 26, 2014): 54-59. https://www.jstor.org/stable/24479740
Clark, Charlotte R., “The Egyptian Mother Goddess”, *The Metropolitan Museum of Art Bulletin* 4, No. 9 (May, 1946): 240-242. http://www.jstor.org/stable/3258098. 26-02-2015 11:26 UTC
Clark, T. W., “Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature: Siva, Candi, Manasa”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 17, No. 3 (1955): 503-518. http://www.jstor.org/stable/609593.10-03-2016 10:41 UTC.
Clark, T. W., “History of Bengali Literature by Sukumar Sen”, *Journal of the American Oriental Society* 81, No. 2 (Apr. - Jun., 1961): 162-163. http://www.jstor.org/stable/595068. 05/11/2014 03:41.
Das, Anil Kumar, “Sir Thomas Roe and The Prospects of English Trade in Bengal”, Source: *Proceedings of the Indian History Congress* 28 (1966): 228-235. http://www.jstor.org/stable/44140433 . 29-06-2017 20:00 .
Das, H. C., “Sapta Matrkas in Orissa”, *Proceedings of the Indian History Congress* 38 (1977): 197-204. http://www.jstor.org/stable/44139070 . 30-06-2017 07:53
Das, Kumud Ranjan, “The Identification of Ibn Battuta’s Sudkawan (Summary)”, *Proceedings of the Indian History Congress* 27 (1965): 268. http://www.jstor.org/stable/44140640 . 30-06-2017 08:01 .
Das, Sneha, “Engraved Histories: A Study of Legend of Naraka and Political Legitimacy in the Kamarupa Region”, *Proceedings of the Indian History Congress* 75, Platinum Jubilee (2014): 153-159. http://www.jstor.org/stable/44158374. 18-04-2018 19:35 UTC
Das, Rahul Peter, “More Remarks on the Bengali Deity Dharma, Its Cult and Study”, *Anthropos* 82, H. 1./3. (1987): 244-251https://www.jstor.org/stable/40462313

Dasgupta, Atis, “Islam in Bengal: Formative Period”, *Social Scientist* 32, No. 3/4 (Mar. - Apr., 2004): 30-41. http://www.jstor.org/stable/3518022 . 29-06-2017 18:34 .
Dasgupta, Biplab, “Trade in Pre-Colonial Bengal”, *Social Scientist* 28, No. 5/6 (May - Jun., 2000): 47-76. http://www.jstor.org/stable/3518180 .29-06-2017 19:11 .
Dasgupta, Nupur, “Environs and Cults: Tracing the Roots of the Social-Psychological Paradigm of Folk Existence in Deltaic Lower Bengal”, *Journal of Anthropology and Archaeology* 2, No. 1 (June 2014): 147-161.
Das Gupta, Tamonash Chandra, “The Calcutta Review: Some Aspects of Medieval Bengali Literature”, *South Asian Archive*, (May 1951): 69-82.

Das Gupta, Kallol, “A note on the Linga with Sakti images in Bengali art”, *Proceedings of the Indian History Congress* 71 (2010-2011): 1095-1100. http://www.jstor.org/stable/44147577 . 29-06-2017 18:42 UTC.

Dickinson, W. B., “TIN-MONEY OF THE TRADING PORTS OF THE BURMAN EMPIRE”, *The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society* 7 (April, 1844–January, 1845): 29-33. http://www.jstor.org/stable/42686102 . 30-06-2017 08:02 .

Diesel, Alleyn, “The Worship and Iconography of the Hindu Folk Goddesses in Natal”, *Journal for the Study of Religion* 5, No. 2 (SEPTEMBER 1992): 3-30. http://www.jstor.org/stable/24763966. 30-06-2017 07:49 .

Digby, Simon, “The Fate of Dāniyāl, Prince of Bengal, in the Light of an Unpublished Inscription”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 36, No. 3 (1973): 588-602. http://www.jstor.org/stable/613583 . 29-06-2017 19:52 UTC.

Dimock, Edward C., Jr., “The Goddess of Snakes in Medieval Bengali Literature”, *History of Religions* 1, No. 2 (Winter, 1962): 307-321. http://www.jstor.org/stable/1062059 . 10-03-2016 10:46 UTC.

Dimock, Edward C., and A. K. Ramanujan. “The Goddess of Snakes in Medieval Bengali Literature. Part II.” *History of Religions* 3, no. 2 (1964): 300–322. http://www.jstor.org/stable/1061995 . 10-03-2016 10:44 UTC

Eaton, Richard M., “The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal. by Asim Roy”, The *Journal of Asian Studies* 44, No. 2 (Feb., 1985): 442-444. http://www.jstor.org/stable/2055984. 29-06-2017 19:32

৫৭) Fane, Hannah. “The Female Element in Indian Culture.” *Asian Folklore Studies* 34, no. 1 (1975): 51–112. https://doi.org/10.2307/1177740 .

Faulkner, R. O., “A Statue of a Serpent-Worshipper”, *The Journal of Egyptian Archaeology* 20, No. 3/4 (Nov., 1934): 154-156. http://www.jstor.org/stable/3854734 . 05-09-2016 10:34 .

Fleming, Andrew. “The Myth of the Mother-Goddess.” *World Archaeology* 1, no. 2 (1969): 247–61. http://www.jstor.org/stable/123965 .

Getty, Alice, “Uga-jin: The Coiled-Serpent God with a Human Head”, *Artibus Asiae* 8, No. 1 (1940): 36-48. http://www.jstor.org/stable/3248281 . 05-09-2016 11:00 .

Ghosh, Pika, “Tales, Tanks, and Temples: The Creation of a Sacred Center in Seventeenth-Century Bengal”, *Asian Folklore Studies* 61, No. 2 (2002): 193-222. http://www.jstor.org/stable/1178971 . 29-06-2017 19:58

Ghosh, Pika, “Unrolling a Narrative Scroll: Artistic Practice and Identity in Late-Nineteenth-Century Bengal”, *The Journal of Asian Studies* 62, No. 3 (Aug., 2003): 835- 871. https://www.jstor.org/stable/3591862 .

Ghosh, Suchandra, “Monetization and Exchange Network in Early Historic Bengal: A Note Defining Certain Problems”, *Proceedings of the Indian History Congress* 66 (2005-2006): 110-119. http://www.jstor.org/stable/44145828 . 29-06-2017 19:13 .

Ghosh, Suchandra, “Locating South Eastern Bengal in the Buddhist Network of Bay of Bengal (C. 7th Century CE- 13th Century CE)”, *Proceedings of the Indian History Congress* 74 (2013): 148-153. https://www.jstor.org/stable/44158810 . 31-10-2020 19:30 UTC.
Gooptu, Sharmistha, “Peculiarities of Soccer in Bengali Cinema”, *Economic and Political Weekly* 40, No. 1 (Jan. 1-7, 2005): 67-71. https://www.jstor.org/stable/4416013
Goldberg, Ellen. “Ardhanārīśvara in Indian Iconography: A New Interpretation.” *East and West* 49, no. 1/4 (1999): 175–87. http://www.jstor.org/stable/29757425 .
Gulyaev, V., S. Ya. Serov and Balaji Mundkur, “On the Cult of the Serpent”, *Current Anthropology* 17, No. 4 (Dec., 1976): 742-744.
http://www.jstor.org/stable/2741278. 05-09-2016 10:13 .
Haider, Najaf, “International Trade in Precious Metals and Monetary Systems of Medieval India: 1200- 1500 A.D.”, *Proceedings of the Indian History Congress* 59 (1998): 237-254. http://www.jstor.org/stable/44146994 . 30-06-2017 05:53 .
Hall, Kenneth R., “Ports-of-Trade, Maritime Diasporas, and Networks of Trade and Cultural Integration inthe Bay of Bengal Region of the Indian Ocean: c. 1300-1500”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 53, No. 1/2 (2010): 109-145. http://www.jstor.org/stable/25651214 . 29-06-2017 20:02 .
Harding, Pitt, “Milton's Serpent and the Birth of Pagan Error”, *Studies in English Literature, 1500-1900* 47, No. 1, The English Renaissance (winter, 2007): 161-177. http://www.jstor.org/stable/4127498 . 05-09-2016 10:53.
Hauser, Beatrix, “From Oral Tradition to "Folk Art": Reevaluating Bengali Scroll Paintings”, *Asian Folklore Studies* 61, No. 1 (2002): 105-122.
https://www.jstor.org/stable/1178679 .

Hewitt, J. F. “The Tribes and Castes of Bengal, by H. H. Risley. Vols. I. and II. Ethnographic Glossary, Vols. I. and II. Anthropometric Data.” *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1893, 237–300. http://www.jstor.org/stable/25197142 .
Hussain, Syed Ejaz, “Silver Flow and Horse Supply to Sultanate Bengal with Special Reference to Trans Himalayan Trade (13th-16th Centuries)”, Journal *of the Economic and Social History of the Orient* 56, No. 2 (2013): 264-308. https://www.jstor.org/stable/43303535 .
Jacobsen, Knut A. “The Child Manifestation of Śiva in Contemporary Hindu Popular Prints.” *Numen* 51, no. 3 (2004): 237–64. http://www.jstor.org/stable/3270583.
Jaiswal, Suvira, “Changes in the status and concept of the Sudra varna in early middle ages”, *Proceedings of the Indian History Congress* 41 (1980): 112-121. http://www.jstor.org/stable/44141832 . 30-06-2017 05:33
Jash, Pranabananda, “ The Cult of Manasa in Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 47, VOLUME I (1986): 169-177. http://www.jstor.org/stable/44141538 . 18-04-2018 19:31 .
Johnson, Patrica E. “The Gendered Politics of the Gaze: Henry James and George Eliot.” *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal* 30, no. 1 (1997): 39–54.
http://www.jstor.org/stable/44029557 . 06-09-2016 10:40

Joines, Karen Randolp, “The Bronze Serpent in the Israelite Cult”, *Journal of Biblical Literature* 87, No. 3 (Sep., 1968): 245-256. http://www.jstor.org/stable/3263536 . 05-09-2016 10:38 .

Jones, Malcolm, “Folklore Motifs in Late Medieval Art III: Erotic Animal Imagery”, *Folklore* 102, No. 2 (1991): 192-219. http://www.jstor.org/stable/1260958 . 29-06-2017 18:38 .

Jones, Betty True. *Dance Research Journal* 17/18 (1985): 90–91. https://doi.org/10.2307/1478090 .

Kanungo, Jauhar and Lima Kanungo, “The Disappearing Mahal and Changing Directions of Worship in the Sunderbans”, *India International Centre Quarterly* 25, No. 1 (SPRING 1998): 47-57. http://www.jstor.org/stable/23005603 . 05/11/2014 03:58 .

Kloetzli, W. Randolph, “Ptolemy and Purāṇa: Gods Born as Men”, *Journal of Indian Philosophy* 38, No. 6 (December 2010): 583-623. http://www.jstor.org/stable/23502240 . 16-03-2018 17:31 .

Korom, Frank J, “Editing Dharmaraj: Academic Genealogies of a Bengali Folk Deity”, *Western Folklore* 56, No. 1 (Winter, 1997): 51-77. http://www.jstor.org/stable/1500386. 29-06-2017 19:46.

Korom, Frank J, “Historical Dictionary of Hinduism by Bruce M. Sullivan”, *The Journal of American Folklore* 112, No. 444 (Spring, 1999): 231-232. http://www.jstor.org/stable/541961 .

Kramrisch, Stella. “Śiva Bholānātha, c. 450-550.” *Philadelphia Museum of Art Bulletin* 80, no. 343/344 (1984): 4–8. https://doi.org/10.2307/3795347.

Law, B. C., “Some Ancient Indian Tribes”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 22, No. 1/2 (1941): 94-96. http://www.jstor.org/stable/41688861 16-03-2018 17:34.

Law, B. C., “Ancient Historic Sites of BENGAL”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 26, No. 3/4 (July-October 1945): 177-191. http://www.jstor.org/stable/41784434 . 18-04-2018 19:34.

Leena, Shahnaj Husne Jahan, “Sailing Across Seven Seas: A Study of Maritime Trade in Bengal (Prior To the Arrival of The Portuguese)”, *Bulletin of the Deccan College Research Institute* 64/65 (2004-2005): 397-401. http://www.jstor.org/stable/42930676 . 29-06-2017 18:51 .

Lyons, Tryna. “TERRA EPHEMERA: THE CASE OF A NEW GODDESS IN BENGAL.” *Artibus Asiae* 69, no. 2 (2009): 259–93.http://www.jstor.org/stable/20801623 . 25-12-2015 10:56 UTC.

McLain, Karline, “Holy Superheroine: A Comic Book Interpretation of the Hindu Devī Māhātmya Scripture”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 71, No. 2, (2008): 297-322. http://www.jstor.org/stable/40378772. 10-03-2016 11:10 UTC

Majumder, R. C., “A Forgotten episode in the medieval history of Bengal”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 48/49, Golden JubileeVolume 1917-1967 (1968): 187-192. http://www.jstor.org/stable/41694238. 29-06-2017 18:38 .

Majumdar, Suchitra, “Agrarian Society in Early Medieval Bengal”, *Social Scientist* 43, No. 5/6 (May–June 2015): 11-27. http://www.jstor.org/stable/24642344 . 29-06-2017 18:24 .

Malik, Zaheeruddin, “Mughal Official Documents Concerning the English Trade in Bengal-1633-1712”, *Proceedings of the Indian History Congress* 31 (1969): 246-254. http://www.jstor.org/stable/44138374. 29-06-2017 20:11 .

Mathew, K.S., “Commodity Composition of the Indo-Portuguese Trade in the Early Sixteenth Century”, *Proceedings of the Indian History Congress* 41 (1980): 297-305. http://www.jstor.org/stable/44141851. 03-07-2017 03:46 .

Melton, J. Gordon. “Perspective: Toward a Definition of ‘New Religion.’” *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions* 8, no. 1 (2004): 73–87. https://doi.org/10.1525/nr.2004.8.1.73 .

Mishra, Patit Paban, “Balasore Port-Town in Seventeenth Century”, *Proceedings of the Indian History Congress* 59 (1998): 301-310. http://www.jstor.org/stable/44147001 . 29-06-2017 19:02.

Mondal, Bijan, “The Early Medieval Archaeological Sites and Assemblages of the District Of Dakshin/South Dinajpur, West Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 73 (2012): 1203-1211. http://www.jstor.org/stable/44156321 . 16-03-2018 17:34 .

Monius, Anne E. “Śiva as Heroic Father: Theology and Hagiography in Medieval South India.” *The Harvard Theological Review* 97, no. 2 (2004): 165–97. http://www.jstor.org/stable/4495081.

Moorehead, W. G. “Universality of Serpent-Worship”, *The Old Testament Student* 4, No. 5 (Jan., 1885): 206. http://www.jstor.org/stable/3156392 . 05-09-2016 10:20 .

Morinis, E. A., “Baba Taraknath": A Case of Continuity and Development in the Folk Tradition of West Bengal, India”, *Asian Folklore Studies* 41, No. 1 (1982): 67-81. https://www.jstor.org/stable/1178309 .

Morrison, Sarah R., “The Accommodating Serpent and God's Grace in "Paradise Lost", *Studies in English Literature* 49, No. 1, The English Renaissance(Winter, 2009): 173-195.http://www.jstor.org/stable/40071390 .05-09-2016 09:48 .

Mukhopadhyay, Mihir Mohan, “Uma in the family: an examination of a sculpture from north Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 61, Part 1: Millennium (2000-2001): 136-139. http://www.jstor.org/stable/44148088 . 16-03-2018 17:33 .

Mukherjee, Tarapada. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 45, no. 2 (1982): 373–74. http://www.jstor.org/stable/615124. 30-12-2016 10:40 UTC.

O’Flaherty, Wendy Doniger. “Asceticism and Sexuality in the Mythology of Śiva. Part I.” *History of Religions* 8, no. 4 (1969): 300–337. http://www.jstor.org/stable/1062019. 20-6-2017 19:40 UTC

O’Flaherty, Wendy Doniger. “Asceticism and Sexuality in the Mythology of Śiva. Part II.” *History of Religions* 9, no. 1 (1969): 1–41. http://www.jstor.org/stable/1062140. 20-6-2017 19:45 UTC.

Piccione, Peter A., “Mehen, Mysteries, and Resurrection from the Coiled Serpent”, *Journal of the American Research Center in Egypt* 27 (1990): 43-52. http://www.jstor.org/stable/40000072 . 05-09-2016 10:25 .

Rahman, Md.Shah Noorur, "Pir Cult as Evidence of Hindu-Muslim Amity in Mughal Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 50, Golden Jubilee Session (1989): 280-283. http://www.jstor.org/stable/44146051 . 29-06-2017 18:32 .

Rahaman, Md. Shah Noorur, "Islam and Its Early Introduction in Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 56 (1995): 425-434. http://www.jstor.org/stable/44158645 . 29-06-2017 18:35 UTC

Raut, L. N., "Jati Formation in Early Medieval Orissa: Reflection on Karana (Kayastha Caste)", *Proceedings of the Indian History Congress* 65 (2004): 304-308. http://www.jstor.org/stable/44144743 . 30-06-2017 04:15 .

Ray, Aniruddha, "Urbanisation and Social Change in Late 16th and Early 17th Century Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 47, Vol. I (1986): 341-350. http://www.jstor.org/stable/44141562 . 29-06-2017 18:58.

Ray, Aniruddha, "Address of the Sectional President: Urbanisation in Medieval Bengal C. AD.1200 to C. AD. 1600", *Proceedings of the Indian History Congress* 53 (1992): 135-180. http://www.jstor.org/stable/44142781 . 29-06-2017 18:18 .

Ray, Aniruddha, "The State Formation in Sultanate of Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 55 (1994): 186-193. http://www.jstor.org/stable/44143355 . 29-06-2017 18:33 .

Ray, Aniruddha, "Mughal-Danish Relations during the 17th and Early 18th Century Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 58 (1997): 285-294. http://www.jstor.org/stable/44143918 . 03-07-2017 03:56 .

Ray, Aniruddha, "General President's Address: An Approach to the Study of Morphology of Selected Towns and Cities of Medieval Bengal, C. 1500 to C. 1727", *Proceedings of the Indian History Congress* 71 (2010-2011): 1-27. http://www.jstor.org/stable/44147470 . 29-06-2017 18:45 UTC.

Ray, Indrani, "India in Asian Trade in the 1730s-An 18th Century French Memoir", *Proceedings of the Indian History Congress* 34, Volume I (1973): 271-290.http://www.jstor.org/stable/44138644. 03-07-2017 03:53.

Ray, Himanshu Prabha, "The Archaeology of Bengal: Trading Networks, Cultural Identities", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 49, No. 1 (2006): 68-95. http://www.jstor.org/stable/25165129. 29-06-2017 19:40 .

Ray, Rita Ghosh, "Measurement Of Land By Nala In Early Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress* 55 (1994): 115-122. http://www.jstor.org/stable/44143338 . 30-06-2017 05:11 .

Ray, Rita Ghosh, "Early Medieval Bengal: Gleanings from Marvazi's Account (1120 A.D)", *Proceedings of the Indian History Congress* 56 (1995): 476. http://www.jstor.org/stable/44158661. 29-06-2017 19:25 UTC.

Richardson, James T. “From Cult to Sect: Creative Eclecticism in New Religious Movements.” *The Pacific Sociological Review* 22, no. 2 (1979): 139–66. https://doi.org/10.2307/1388875 . 26-11-2018 11:40 UTC.
Richardson, James T. “Definitions of Cult: From Sociological-Technical to Popular-Negative.” *Review of Religious Research* 34, no. 4 (1993): 348–56. https://doi.org/10.2307/3511972 . 26-11-2018 11:30 UTC.
Roy, Atulchandra, “Naval Strategy of the Mughals in Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 24 (1961): 170-175. http://www.jstor.org/stable/44140736 . 29-06-2017 19:43
Roy, Tirthankar, “Where is Bengal? Situating an Indian Region in the early modern world economy”, *Past & Present*, No. 213 (November 2011): 115-146. http://www.jstor.org/stable/41416880 . 29-06-2017 19:00 .
Roy, Yogendra P., “Rajmahal Port-Town in Seventeenth Century Bengal”, *Proceedings of the Indian History Congress* 69 (2008): 349-360.
https://www.jstor.org/stable/44147200.
Sarkar, Bihani, “The Rite of Durgā in Medieval Bengal: An Introductory Study of Raghunandana'sDurgāpūjātattva with Text and Translation of the Principal Rites”, *Journal of the Royal Asiatic Society* 22, No. 2 (APRIL 2012): 325-390. http://www.jstor.org/stable/41490102 .18-04-2018 19:32
Sarkar, Tanika. “A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal.” *Feminist Studies* 26, no. 3 (2000): 601–22. https://doi.org/10.2307/3178642 .20-08-2019 10:56 UTC.
Satprakashananda, Swami, “Folk Festivals in India”, *Midwest Folklore* 6, No. 4 (Winter, 1956): 221-227. http://www.jstor.org/stable/4317600 . 24-04-2018 14:56 .
Siddiq, Mohammad Yusuf, “Calligraphy and Islamic Culture: Reflections on Some New Epigraphical Discoveries in Gaurand Pandua, Two Early Capitals of Muslim Bengal”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 68, No. 1 (2005): 21-58.
http://www.jstor.org/stable/20181855 . 22-10-2017 18:58
Sen, Sukumar (ed.), “Vipradasa’s Manasa-Vijaya”, a review by T. W. Clark, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 17, No. 3 (1955): 606-607. http://www.jstor.org/stable/609603 . 10-03-2016 10:58 UTC.
Shahed, Syed Mohammad., “Bengali Folk Rhymes: An Introduction”, *Asian Folklore Studies* 52, No. 1 (1993): 143-160. http://www.jstor.org/stable/1178454 . 29-06-2017 19:10 .
Shendge, Malati J., “The Primordiality of ŚIVA: Some New Liguistic Evidence”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 76, No. 1/4 (1995): 119-128. http://www.jstor.org/stable/41694374 . 05-09-2016 10:45.
Siddiqui, Ashraf and A. S. M. Zahurul Haque, “Folklore Research in East Pakistan”, Asian *Folklore Studies* 23, No. 2 (1964): 1-14.
http://www.jstor.org/stable/1177746. 29-06-2017 18:39 .

Skomp, Elizabeth. "Misogyny, the Male Gaze, and Fantasies of Female Death: 'Eto Ia, Edichka and Russkaia Krasavitsa.'" *New Zealand Slavonic Journal*, 2003, 137–42. http://www.jstor.org/stable/40922148. 30-06-2016 18:56 .

Smith, William L., "The Pati-Ninda in Medieval Bengali Literature", *Journal of the American Oriental Society* 99, No. 1 (Jan. – Mar., 1979): 105-109. http://www.jstor.org/stable/598958 . 05/11/2014 03:56.

Snow, Edward. "Theorizing the Male Gaze: Some Problems." *Representations*, no. 25 (1989): 30–41. https://doi.org/10.2307/2928465 .

Spivak, Gayatri Chakravorty, "Moving Devi", *Cultural Critique*, No. 47 (Winter, 2001): 120-163.http://www.jstor.org/stable/1354583. 25/11/2014 05:55.

Srinivasan, Doris. "Unhinging Śiva from the Indus Civilization." *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, no. 1 (1984): 77–89. http://www.jstor.org/stable/25211627 . 06-12-2015 04:56 .

Srinivasan, Doris. "The So-Called Proto-Śiva Seal from Mohenjo-Daro: An Iconological Assessment." *Archives of Asian Art* 29 (1975): 47–58. http://www.jstor.org/stable/20062578 .20-10-2018 11:40 UTC.

Swatos, William H. "Weber or Troeltsch?: Methodology, Syndrome, and the Development of Church-Sect Theory." *Journal for the Scientific Study of Religion* 15, no. 2 (1976): 129–44. https://doi.org/10.2307/1385357 . 30-08-2016 18:40 UTC.

Thakur, Vijay Kumar, "Towns in Early Medieval Bengal: An Archaeological Survey", *Proceedings of the Indian History Congress* 44 (1983): 120-132. http://www.jstor.org/stable/44139828. 29-06-2017 18:29 .

Thakur, Vijay Kumar, "Trade and Currency System in Early Medieval Bengal (C.A.D. 600-1200)", *Proceedings of the Indian History Congress* 46 (1985): 170-179. http://www.jstor.org/stable/44141347 . 29-06-2017 18:31 .

Thakur, Vijay Kumar, "Trade and Towns in Early Medieval Bengal (c. A.D. 600-1200)", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 30, No. 2 (1987): 196-220. https://www.jstor.org/stable/3632091.

Togawa, Masahiko, "Syncretism Revisited: Hindus and Muslims over a Saintly Cult in Bengal", *Numen* 55, No. 1 (2008): 27-43. http://www.jstor.org/stable/27643292. 26-02-2015 11:56 UTC.

Upadhyaya, Hari S., "Folk-Culture of Assam (In Assamese) by Birinchi K. Barua", *Asian Folklore Studies* 23, No. 2 (1964): 215-218. http://www.jstor.org/stable/1177754. 05/11/2014 04:15 .

Upadhyaya, K. D., "On the Position of Women in Indian Folk Cultuture", *Asian Folklore Studies 27,* No. 1 (1968): 81-100. http://www.jstor.org/stable/1177801 . 03-07-2017 03:29 .

Vansittart, G., Stephenson, Law and M. E. Monckton Jones, "Free and Open Trade in Bengal", *The English Historical Review* 30, No. 117 (Jan., 1915): 28-41. http://www.jstor.org/stable/550780 . 03-07-2017 03:47 UTC

Varma, Vishwanath Prasad, “Ethics and sociology of politics in some of the Puranas”, *The Indian Journal of Political Science* 39, No. 2 (April-June 1978): 270-298. http://www.jstor.org/stable/41854846 . 10-03-2016 11:23 UTC

Vedantasastri, H., “Maharaja Man Singh—From Bengal's Point Of View”, *Proceedings of the Indian History Congress* 18 (1955): 183-186. http://www.jstor.org/stable/44137382 . 29-06-2017 20:01.

Vetschera, Traude., “The Potaraja and Their Goddess”, *Asian Folklore Studies* 37, No. 2 (1978): 105-153. http://www.jstor.org/stable/1177634 . 18-04-2018 19:45 .

Wake, C. Staniland “The Origin of Serpent-Worship”, *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 2, (1873): 375. http://www.jstor.org/stable/2841458 . 05-09-2016 09:56 .

Wojtilla, Gyula, “Essays on Middle Bengali Literature by Rahul Peter Das”, *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 53, No. 3/4 (2000): 280-281. http://www.jstor.com/stable/43391656

## গবেষণা পত্র

চক্রবর্তী, অরূপা. “ বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার বিবর্তন ও প্রচারের ক্ষেত্রে রাঢ়ী, পূর্ববঙ্গীয় ও কামরূপীয় মনসামঙ্গলের কাব্যরূপগত, পরিবেশনগত, সমাজ-সংস্কৃতিগত, ভাষাগত তুলনার উপাদান সংকলন ও বিশ্লেষণ”. পি-এইচ. ডি উপাধির জন্য নিবেদিত, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু. “নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল ও সুকনান্নী”. পি-এইচ. ডি উপাধির জন্য নিবেদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ১৯৯৫।

দাশগুপ্ত, সাগ্নিক. “নির্বাচিত মনসামঙ্গল কাব্যসূত্রে মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানঃ একটি পর্যালোচনা”. পি-এইচ. ডি উপাধির জন্য নিবেদিত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১৬।

মুখার্জী, নবনীতা. “ কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পুথি সম্পাদনা ও কাব্য বিশ্লেষণ”. পি-এইচ. ডি উপাধির জন্য নিবেদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

শর্মা, বুবুল. “মনসা মঙ্গল কাব্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব”. পি-এইচ. ডি উপাধির জন্য নিবেদিত, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

## Web Links:

https://youtu.be/dlEZ1FoVdGE.
https://youtu.be/J1kfRoY-VQ8
https://youtu.be/N38BZ_HjYGo .
https://youtu.be/kP7ZWPkHl_8 .
https://youtu.be/TdVRdeBPaQQ .
https://youtu.be/R9hEHHXxP-A .

https://youtu.be/NdOSJMWMT5o .
https://youtu.be/bYhZNFw_6xM .
https://youtu.be/esbfscb3cXk .
https://youtu.be/jDCjp0WuwrQ .
https://youtu.be/tX0bXgDveUE .
https://youtu.be/U-tim91Va5M.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manasa_Mangal.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Extrait_de_Chandi_Mangal_de_Meena_Chitrakar_%28Naya_Bengale%29_%281439706046%29.jpg/1200px-Extrait_de_Chandi_Mangal_de_Meena_Chitrakar_%28Naya_Bengale%29_%281439706046%29.jpg
https://www.primevideo.com/detail/0GI1OPK1L341JD6G4ACJHGEUCL/ref=atv_dp_share_cu_r
https://cdn.colorsbangla.com/wp-content/uploads/2019/08/17104047/mc-banner-generic-copy-2.jpg

শিল্পা মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২।